ভালোবাসা কারে কয়

ভালোবাসা কারে কয়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭০

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন্ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৩৭-বি বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীপ্রমোদকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

স্বপন, নমিতা, মিলিন্দ-কে

সূচি

হাওয়া-ই-হিন্দ

"বার বার অত যাওয়াই বা কেন, বারবার বাক্সপ্যাঁটরাগুলো খোওয়ানোই বা কেন? একেবারে কলকাতা থেকে না বেরুলেই তো সবদিক রক্ষে হয়।"

এতবড়ো দুঃসংবাদটা শুনে স্বয়ং মামণি যখন এহেন অকরুণ মন্তব্য করলেন তখন চোখের জল বাঁধ মানতে চাইল না। এতদিন ধরে বিদেশ-বিভুঁয়ে তো গুচ্ছের হেলাচ্ছেদ্দা সহ্য করতেই হয়েছে, স্বদেশে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেও কিনা এই সমবেদনার নমুনা? নিম্নগামী চিরস্রোতা স্নেহেরই যদি এই চেহারা হয়, তবে অল্পস্বল্প রিপু/টিপু ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্যের কারবার যেখানে আছে, যা নাকি লক্‌লক্‌ ধক্‌ধক্‌ করে ঊর্ধ্বগামী, বা সর্বত্রগামী, সেই সব সম্পর্কগুলোর তবে কেমনধারা চেহারা হবে? কে জানে!

একটা ব্যাপার একদম্‌ নিশ্চিত, যে আবার আমার সুটকেস হারিয়ে গেছে শুনলে এবারে কারুর কোনো দুঃখ হবে না, মুখে হয়তো কেউ কেউ বলবে—"ওমা, সত্যি? ঈশ্‌, কি কাণ্ড! চুক্‌ চুক্‌-চুক্‌—এয়ারলাইন্সগুলো আজকাল যা তা হয়েছে—" কিন্তু মনে মনে সকলেই ঐক্যতানে গাইবে—"বেশ হয়েছে। খুব হয়েছে! যেমন যাওয়া! গেছলে কেন? যাওনা, আরও যাও?"—থাক্‌, কাউকে বলে কাজ নেই। খুঁজে এনে তো দিতে পারবে না কেউই। বেশ, আমার ক্ষতি হয়েছে জানিয়ে তোএাদের ওটুকু উপকার করবো না আমি। কেনই বা মনের আহ্লাদ বাড়াবো আমি তোমাদের? তার চেয়ে, থাকো তোমরা মন-গড়া ভাবনা নিয়ে বসে।—"না জানি কত কি ফরেন ইম্পোর্টেড মালপত্তর নিয়ে এসেছে নবনীতা। ঈশ্‌শ্‌···গুচ্ছ গুচ্ছ নাইলন শাড়ি, ডজন ডজন টেরিলেন শার্ট,···তাড়া তাড়া ব্লু জীন্‌স্‌···থলে থলে লিপস্টিক আর কার্টন ভরতি পারফিউম।" ভাবোই না তোমরা। দ্যাখোই না তোমরা মনশ্চক্ষে—আমার কাঁধের হাতব্যাগের থেকে বেরুচ্ছে গণ্ডা গণ্ডা ক্যামেরা, ক্যালকুলেটর, রেডিও, ক্যাসেট, টেপরেকর্ডার। ইলেকট্রিক হাতঘড়ি, বোতল বোতল ব্রান্ডি-হুইস্কি-শ্যামপেন। বেশ! তাই হোক। যা ইচ্ছে করে তাই ভেবে নিয়ে কষ্ট পাও তোমরা, যারা হিংসুটে, যারা আমাকে ভালোবাসো না। আমার যে এদিকে পরণের শাড়িটি ছাড়া সর্বস্ব চলে গেছে মহারাজা এয়ারওয়েজের খপ্পরে, সেটি ফাঁস করে আমি তোমাদের প্রাণের আরাম আর আত্মার শান্তি বাড়তে দেব না, যাও।

এইরকম নীচস্যনীচ কথাবার্তা ভেবে, মনস্থির করে ফেললুম, শীতল শয়তানের মতো এবার নিস্পৃহ থাকবো। যে যা বলবে, শুধু তারই জবাব দেব। সেধে কাউকেই আমার সুটকেস হারানোর দুঃখটা জানাবো না। যে স্নেহময়ী মামণি আমাকে এত ভালোবাসেন, আমার জন্যে আলাদা কত কাণ্ড করে বড়ি, আচার তৈরি করে দেন, তাঁরই যখন এরকম অনীহা! মনস্থির করবার খানিকক্ষণ পরেই রুনুদি এলেন।—

"কি রে? কবে ফিরলি? সাতদিন আগেই ফেরবার কথা ছিল না? একবার বিদেশ গেলে আর বাড়ি টাড়ি ফিরতে ইচ্ছেই করে না বুঝি?"

শুনলাম উত্তরে আমি বলছি—কাতর এবং উত্তেজিত গলায়, "দেরি হবে না? দেরি কি আর ইচ্ছে করে? ওদিকে আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে যে!"

"কী সর্বনাশ হলো আবার? সুটকেস হারায়নি তো? অ্যাঁ?" হাসতে হাসতে বলেন রুনুদি।

"হ্যাঁ। ঠিক তাই। দুটোই, রুনুদি।"

"দুটো মানে?"

"দুটো মানে দুটো সুটকেসই।"

"হারিয়ে গেছে?" মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে তাঁর।

"লণ্ডন টু নিউইয়র্কের মধ্যে।" আমি আরও গম্ভীর।

"প্লেনের ভেতর? দূরদূর। তুমি এসব নিশ্চয়ই বানাও। একই লোকের বারবার এরকম হতে পারে কখনও? নাও বের করো দিকিনি কী কী এনেছো আমাদের জন্যে।"

"তোমাদের জন্যে কী আর আনবো ভাই, নিজের পরণের শাড়িটা ছাড়া কিছুই তো সঙ্গে ছিল না—"

"সে তো প্রত্যেকবারেই শুনি। যত বাজে কথা। তা, কী করে পাওয়া গেল এ-যাত্রায়? পুজো সংখ্যার জন্য নতুন কোন্ গল্পটা বানিয়ে আনলে বল শুনি?"

"যায়নি পাওয়া।"

"যায়নি? অ্যাঁ? সে কি কথা?" মুহূর্তেই রুনুদির মুখ সমব্যথায় ঝুলে পড়লো। নাঃ, সবাই মোটেই হিংসুটে হয় না। এই তো সমব্যথী পাওয়া গেছে। —"মানে অফিসিয়ালি যায়নি।"

"কী কী ছিল ভিতরে? কাগজপত্তর ছিল কিছু? গয়না গাঁটি?"

"নাঃ— সে সব ঠিক আছে। ব্রীফকেসটা তো হারায়নি? কাগজপত্তর আমি সর্বদা ব্রীফকেসে রাখি। আর গয়নাগাঁটি তো তেমন পরিই না।"

"তবু ভালো। তা কী কী গেল? কাপড়চোপড়?"

"কাপড়চোপড়, আর ইংলণ্ডে যা যা কিনেছিলুম, সব!"

"কী কী কিনেছিলি ?"

"অনেক ঘুরে অনেক খুঁজে কেনা একগাদা ভালো ভালো বই গেল। দালির রেট্রসপেকটিভ্ এগজিবিশন থেকে কেনা স্টেট গ্যালারীর স্যভ্নির বইটাও গেল। রেয়ার জিনিস। কয়েকটা অফ্প্রিন্টও গেল অন্যদের দেওয়া। যাবার সময় প্লেনে কেনা পারফিউমটাও।

"বই যায় যাক্‌গে। বইপত্তর ঢের পাবি। ভালো কাপড় কী কী খোওয়া গেল ? পারফিউমটার জন্য কষ্ট হচ্ছে। আহা রে!"

"সেই ব্রাউন টেম্পল শাড়িটা—"

"ঈ—শ্। সেই টেম্পল—" দুঃখে রুনুদির বাক্‌রোধ হয়।

"এর চেয়ে যদি আমাকেও ওটা দিয়ে দিতিস। আর ? আর কী গেল ?"

"তিনটে কাঞ্চিপুরম্, একটা বাটিক (ফুলশয্যার সেই হলুদ রঙের, সুমনের সইকরা শাড়িটা)—একটা বেনারসী, দুখানা কাশ্মীরী শাল—"

"ঈশ্—এ-ত! তি-ন তিনটে কাঞ্চিপুরম্ ? কত টাকা লোকসান হলো ? বেশ ভালোরকম ?"

ও কি ? একটু একটু করে রুনুদির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেন ? হ্যাঁ, ঠিকই। মুখে স্পষ্টই আহ্লাদ।—

"আর বেনারসী ? বেনারসী কোনটা গেল ? ব্লু-টা নয়তো ? অ্যাঁ ? সত্যি ? ব্লু-টাই ?"—আনন্দে রুনুদির মুখে এখন আলো ঝল্‌মল্ করছে। দেখে বুকে যেন ছোরা বসে গেল। ঈশ্—রুনুদিও এরকম ?

"আর ভেবে কী হবে রুনুদি, চলো ওপরে চলো—মামণি চমৎকার পাটিসাপ্টা করেছেন—"

"প্রসূনকে একবার বল্"—রুনুদি পাটিসাপ্টা দিয়ে চা খেতে খেতে বলেন—"প্রসূন ঠিক পারবে হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে তোর বাক্সো উদ্ধার করে দিতে।"

"প্রসূনকে কি বলিনি নাকি ? ওই তো চেষ্টা-চরিত্র চালাচ্ছে যেটুকু সম্ভব! কিন্তু ব্যাপারটা খুব গোলমেলে।"

"তবে কি জগদীশকাকুকে একবার লিখবি ? উনি তো ওখানেই রয়েছেন।"

"কত হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল ? এর ভেতর জগদীশকাকু কী করবেন শুনি ? ওখানে থাকলেই বুঝি হলো ? শুনবে তুমি ব্যাপারটা কদ্দুর গড়িয়েছিল ? শুনলে তো আবার বিশ্বাস করতে পারবে না। আবার বলবে—'এই খালি খালি যতো সব গপ্পো বানাস।' কী না করেছি আমি সুটকেস উদ্ধারের জন্যে ? গোড়া থেকে বলি তবে শোনো।"

[কিন্তু আসল ক্ষতিটার কথা তো কাউকে বলতেই পারছি না। মুশকিল সেইখানে। বাক্স-বাক্স করে প্রাণটা বের করে ফেলছি কেন যে, আসলে তো কাঞ্চিপুরম্‌ও নয়, বেনারসীও নয়। এ ছটফটানি কিসের জন্যে, তা তো কেউ

জানেই না। কোনো তালিকায় উল্লেখ নেই সেই হারানো বস্তুটার। উল্লেখ করা যাবেও না। এ হলো চোরের মায়ের কান্না।]

২

গণ্ডগোলটা হয়ে গেছে আসলে আগেই। নিউইয়র্কে প্লেন বদল করে লস এঞ্জেলেসে যাব। হাতে ঘণ্টদুই সময়। লাগেজ কালেক্ট করে কাস্টম্‌স চেকিং করে, অন্য বিলডিঙে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে। এদিকে লাগেজ আর বেরোয় না! প্লেনে এক দাড়িওয়ালা বেহালাবাদকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, সে স্ট্যাটেন আইল্যানডে থাকে, বলেছিল আমাকে লস এঞ্জেলেসের প্লেনে মালপত্তর সুদ্ধু তুলে দেবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কখন যেন সে কেটে পড়ল। আরেক বৃদ্ধ দক্ষিণী, যাবেন মিনেসোটা, তাঁকে ধরলুম। অতবড়ো দুটো বাক্স নিয়ে অন্য এয়ার টার্মিনালে গিয়ে প্লেন ধরা মুখের কথা নয়। বহুক্ষণ সঙ্গ দিয়ে তিনিও শেষটা মার্জনা চেয়ে চলে গেলেন, নইলে তাঁর প্লেন ধরতে পারতেন না। এখনও আমাদের ফ্লাইটের বেশ কয়েকজনের মাল চাতালে আসেনি। এ কী রে বাবা? এমন তো হয় না? একটি শিখ ছেলে দেখছি ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের সহায়তা করছে, হাওয়াই-ই-হিন্দ-এর পোষাকপরা। তাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—"ব্যাপার কী? আমার প্লেন যে চলে যাবে? মাল কখন বেরুবে?"—শান্ত হয়ে যুবকটি বললো—"কটায় প্লেন?" টাইমটা শুনে সবিনয়ে জানালো—"ওটা আপনি মিস্‌ করেই ফেলেছেন। এখন ধরবার সময় নেই। তাছাড়া এখানে এখন আপনার কিছু করণীয় কাজকর্মও আছে। আপনি কি ভিক্টোরিয়া বাসটার্মিনাসে মাল জমা দিয়েছিলেন?"

ছেলেটি কি হাত গুণতে পারে? জানলো কেমন করে? "আজ্ঞে ঠিক তাই। কি করে বুঝলেন?"

"তাহলে আপনার মালপত্র আসেনি। ওইখানে কমপ্লেন্ট কাউন্টার খোলা হয়েছে। যান, ফর্ম ফিল আপ করুন আগে। তারপরেই নতুন ফ্লাইট বুক করতে ছুটবেন, মনে করে।"

আমাদের এই ফ্লাইটের মালের গোলমালের জন্যে বিশেষ কাউন্টারে ফর্ম দিচ্ছেন শাড়ি ব্লাউজ পরা একটি প্লাস্টিকের তৈরি ভারতীয় নারী। খুব গম্ভীর। একটু রুক্ষ। অথচ কী রংচং কী সাজসজ্জা। ক্ষণে ক্ষণে বেঁটে চুল ঝামরে তুলছেন কপাল থেকে ওপরে। যারাই বাসে করে হীথরো এসেছিলেন, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে মাল চেক্‌ ইন করে, তাদের কারুরই মাল আসেনি। কিন্তু থেকে-যাওয়া মালগুলির তালিকা ও রসিদ নম্বর এসে গেছে টেলেক্সে। ছাপানো ফর্মে

হারানো মালের জন্যে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে। যাতে মাল লোকেট করা সহজ হয়। আমি একা নই। একসারি যাত্রী কিউ দিয়ে ফর্ম ভর্তি করছেন। এক ফরাসী দম্পতিও তাঁদের শিকাগো ফ্লাইট মিশ করে ছটফট করছেন। ছুটে ছুটে যাচ্ছেন অন্য লোকদের মালপত্রের দিকে। আর ফিরে আসছেন কাঁদো কাঁদো মুখে। আমার দুটি মালের একটি টেলেক্স তালিকায় আছে। অন্যটির নো-পাত্তা। এটা কোনটা অবশ্য জানি না। কালো ছোটোটা না বড়ো বাদামীটা। কালোটা পার্থর। [বাদামীটাই আমার] মাত্র একটা বাক্স এনেছি অথচ দুটি নিয়ে যাওয়া যায়। ফ্রম দি ইউ. এস. এ. এবং টু দি ইউ. এস এ মাল আজকাল ওজন হয় না কেবল গুণতি হয়। টু প্লাস ওয়ান। পীস কনসেন্ট। না ভিয়েৎ-নামের পীস নয়, মালপত্রের মাথাগুণতি অন্যের বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে যেতে অসুবিধা নেই। এভাবেই গতবারে অঞ্জলিদির বাক্সটা নিয়ে গিয়েছিলাম। এবারে পার্থরটা নিয়ে যাচ্ছি ইংলন্ড থেকে, ভায়া আমেরিকা, কলকাতায় কিন্তু টেলেক্সে যেটার নম্বর নেই, সেটার জন্যে আমাকে আলাদা করে কমপ্লেন্ট ফর্ম ভরতে হলো—ও কমপ্লেন করা যে সে লোকের সাধ্য নয়। ওই ফর্ম দেখেই লোকে বলবে, "থাক আমার বাক্সে দরকার নেই।" এমনিই জটিল। গোলমেলে। তার জন্য আলাদা এলেম থাকা চাই। প্রথমে ৫/৬ রকমের সুটকেসের নকশা দেখানো হলো। ১০/১২ রকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপগুণ চরিত্র চিত্রণের বর্ণনা পড়ানো হলো। এবার বল কোনটি তোমার? রূপগত বৈশিষ্ট্য, গুণগত পার্থক্য? বিশেষ চিহ্ন? তিল-জড়ুল? আমার যা বে-মালুম স্বভাব। প্রত্যেকটা বর্ণনাই মনে হয়। "ঠিক এই রকম আমারটাও।" কে আর কবে মাল-বিশারদ হবার জন্যে সুটকেসের রূপগুণ মুখস্থ করে রাখে? নিজেরটা যদিও বা জানি, পার্থরটা তো ভালো করে দেখিওনি। তার গুণাগুণ কিছুই মনে নেই, কালো, জিকাওলা, এবং আমারটার চেয়ে ছোটো, এটুকু ছাড়া। তার পাশের স্ট্র্যাপ আছে, কি নেই? থাকলে এদিকে, না ওদিকে? হাতলটা চ্যাপ্টা? না গোলালো? প্লেন? না কিরকিরে? সাইডপকেট আছে কি? কটা? তাতে জিপ? না বোতাম? চাকা লাগানো? চাকা একজোড়া, না দু জোড়া? "এ কি আমার পাত্রী পছন্দ করছি নাকি? এত খবর কে রাখে?" অমনি প্লাস্টিকের মহিলা এক ধমক লাগান—"নিজের বাক্স নিজেই জানেন না কেমন দেখতে, তো আমরাই বা জানব কী করে কোনটি আপনার?"

"আমার একটা বাক্সের রসিদ নম্বর তালিকায় নেই কেন?"

"আমি জানব কেমন করে? আমিই কি টেলেক্সটা পাঠাচ্ছিলাম লন্ডন থেকে?"

"বাক্সটার কী হবে এখন?"

"সেটাই বা আমি জানব কোত্থেকে? আমার তো কাজ কেবল ফর্ম জমা

নেওয়া। আচ্ছা জ্বালাতন করলে তো এরা? যত বাজে কথা!"

"কিন্তু, আমার বাক্স—"

"হায়ার অফিসারদের বল্ গে যা। এই দ্যাখ নাম ছাপানো আছে। এই ফোননম্বর। এখন যা, ভাগ্। নে, সইটা কর্। সই করে যা।"

কে বলেছে ইংরিজিতে "তুই" সম্বোধন নেই? ইনি যে ইংরিজিতে 'তুই' বলছিলেন, তা যে-কোনো ভারতীয়ই অনায়াসে বুঝতে পারত। ভয়ে ভয়ে দুটো ছবিতে "যা থাকে কপালে" বলে টিক্ মার্ক দিয়ে ফর্ম সই করে দিলুম। ছোট্ট ছোট্ট চৌকো চৌকো অনেক খুপরি। ঠিক গ্রাফ পেপারের মতন। ঢ্যাড়া আর টিক্ দিয়ে খস্‌খস করে আধ মিনিটে ভর্তি করে দিচ্ছে মেয়েটাই। আমি তো ভালো করে পড়তেই পারছি না। চশমাটা ফিরে গিয়েই বদলাতে হবে। বড্ড খুদে হরফে লেখা। ফর্ম ভরাতি করতেই ঘণ্টা উৎরে গেল।

৩

ফর্ম ভর্তি শেষ হতেই আমি কাঁদুনি শুরু করি। "অ মা-জননী, আমার লস এঞ্জেলেস যাবার কী হবে? বাক্সপ্যাঁটরা সব তো গেল, কানেকটিং ফ্লাইটও মিস্ হয়ে গেছে—নেক্সট ফ্লাইটটা আমাকে ধরিয়ে দাও?"

মা জননী খিঁচিয়ে ওঠেন—"আমাকে এসব বলে কী হবে? এটা কি ফ্লাইট বুকিংয়ের কাউন্টার, মাথায় কিছুই ঢোকে না দেখছি।"

"কোথায় যেতে হয় তাহলে?"

"কেন, ঐ তো সামনেই আর একটা কাউন্টার রয়েছে।"

"অ মশাই"—নতুন কাউন্টারে গিয়ে সুরু করতেই তিনি বলেন—"এ কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরের কাউন্টারে গিয়ে বলুন যা বলার।" এবার বেরিয়ে যাচ্ছি—অমনি কাস্টমসের লোকটি আটকায়—"বাক্স কই? ক্লিয়ারেন্স হয়েছে?"

"বাক্স? অল ক্লিয়ার ভাই। বাক্সই আসেনি। আমি এখন ট্র্যাভ্‌লিং লাইট।"

"অঃ। যান। আর কিন্তু ঢুকতে পাবেন না।"

"ঢুকবার দরকারও নেই।"

স্মার্টলি চলে যাই। কাস্টমসের এত সহজ ক্লিয়ারেন্স জীবনে হয়নি। বেরুচ্ছি, পেছন থেকে হঠাৎ কে বলল "বুকিং হয়ে গেছে তো?" সেই শিখ ছেলেটা।

"না, এই যাচ্ছি।"

"যান, যান, শিগগির—ওকি বাইরে কেন, এখানেই হলো না ?'

"বন্ধ হয়ে গেছে।"

বাইরের কাউন্টারে কিউ। আমার টার্ন আর আসে না।

"অ মশাই, শুনছেন ? আমি অমুক ফ্লাইটে লন্ডন থেকে এসেছি. আমার অমুক ফ্লাইটে লস এঞ্জেলেস যাবার কথা, আমার লাগেজ আসেনি বলে ওয়েট করতে করতে ফ্লাইট মিস করে গেছি,—দয়া করে একটু—"

"ভেতরের কাউন্টার। ভেতরের কাউন্টার।"

"ওটা বন্ধ।"

"বন্ধ নয়। বন্ধ নয়। খোলা।"

"ওরাই পাঠিয়ে দিলে এখানে।"

"হতে পারে না। আবার যান। এখানে হবে না। নেক্সট প্লীজ ?"

যেদিক দিয়ে বেরিয়েছিলুম সে দরজা দিয়ে ঢোকা যাবে না। যেদিক দিয়ে ঢুকতে হবে, তাতে প্রচুর ঘুরতে হয়। ঘুরে ঘুরে যখন ঢুকলুম, ভেতরের কাউন্টারটাতে যেতে হলে আবার সেই কাস্টমসের দরওয়ানটিকে পেরুতে হবে। সে আটকে দিল।

"আবার কোথায় যাচ্ছেন ?"

"টিকিট বুকিং করতে"—

"এই যে গেছলেন বুকিং করতে"—

"ওখানে হলো না"—

"এখন ঢোকা অসম্ভব—একবার বেরুলে"—

"তাহলে কী করব ? ওরা বলছে ভেতরে যাও, আপনারা বলছেন বাইরে যেতে, আমি কী করি মশাই, পাগলা হয়ে যাব যে—কেন যে মরতে"—

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, যান তবে পাসপোর্টটা রেখে যান।"

পাসপোর্ট রেখে ফের "বন্ধ" কাউন্টারে দৌড়োই। কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ ভেতরে দাঁড়িয়ে অবসর বিনোদন করছেন। গল্পসল্পের আমেজ, তাকালেই বোঝা যাচ্ছে।

"এক্সকিউজ মি, আমার লস এঞ্জেলেসের"—একসঙ্গে তিনজন হাওয়া-ই-হিন্দের উর্দিপরা স্ত্রী-পুরুষ আমাকে মারতে উঠলেন।—"ইংরিজি বোঝেন না নাকি ? তখন থেকে এক কথা বলে বিরক্ত করছেন। বলছি না এ কাউন্টার বন্ধ ? বাইরের কাউন্টারে যান ?"

"ওরা বলল করবে না। ভেতরে পাঠিয়ে দিল। কেউ একজন প্লীজ করে দিন ?"

"দেখেছ, দেখেছ, কী বদ্ ? ইচ্ছে করেই ভেতরে ফেরৎ পাঠিয়েছে। দেখি কেমন করে ওরা কাজটা না করে ? হবে না। যান। বাইরে যান। এটা

বন্ধ। আচ্ছা, এটাকে ঢুকতেই বা দিল কী করে? আশ্চর্য তো? ইনএফিশিয়েন্সির চূড়ান্ত হয়েছে! শুনুন! উই আর ক্লোজড। প্লীজ গো এলস্‌হোয়্যার। আন্ডারস্টুড?"

"হোয়্যার এল্‌স?"

"টু দি আউটসাইড কাউন্টার। অ্যাজ উই হ্যাভ অলরেডি টোলড ইউ সেভারেল টাইমস।"—এবারে একটি স্বাস্থ্যবান লোক দাঁতে-দাঁত দিয়ে এমনভাবে শান্ত সুরে কেটে কেটে কথা বললো, যে রীতিমতো মর্মে মর্মে ভয় করলো। হিন্দি ছবির ভিলেনরা এভাবে শান্ত হয়ে কথা বলবার পরেই ঘুষি মারে।

পাসপোর্ট ফেরৎ দিয়ে সাহেব পুলিশটা হাসলো।

"ডান? নট ইয়েট? গুড লাক নেক্সট টাইম।"

৪

আবার সেই কিউ।

এবার কিউ ভেঙে গোড়ায় গিয়ে রেগেমেগে বলি: "ওরা বন্ধ। মিছিমিছি আমাকে দৌড় করালেন। লস্‌ এঞ্জেলেসের নেক্সট ফ্লাইটটা—"

"ট্র্যাভলার্স লজ। ট্র্যাভলার্স লজে চলে যান, আপনাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিন। কাছেই। কাল সকাল ৮টায় আসবেন। প্রচুর ফ্লাইট আছে।"

"কী? কোথায় যাব?"

"ট্র্যাভলার্স লজ মোটেল। খুব কাছেই।"

"ইয়ার্কি পেয়েছেন? আপনাদের দোষে একটা মালপত্র নেই, কনেকটিং ফ্লাইট নেই, লস্‌ এঞ্জেলেসে আমার বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস্‌ করে গেলাম—এখন থাকব গিয়ে হোটেলে?"

"খরচা আপনার নয়। চলে যান। একটু রেস্ট করুন। কাল সকালে—"

"খরচা যারই হোক। আমি কি সিধে মোটরে চেপে লন্ডন থেকে এলুম? হাওয়া-ই-হিন্দ কি মোটরগাড়ির টিকিট বেচেছিল? কিসের জন্যে মোটেলে যাব? ভদ্র এয়ারলাইনস এরকম অবস্থায় পড়লে ফাইভস্টার হোটেলে তোলে শেরাটন-হিলটনে তোলে"—

"যান না আপনি শেরাটন হিলটনে। নিজের পয়সায়। কে বারণ করছে—"

"কেন যাব? নিজের পয়সাতে তো সোজা লস এঞ্জেলেস যাচ্ছি—দয়া করে এক্ষুনি কনেকশনটা বুক করে দিন—এটা আপনার আবশ্যিক দায়িত্ব।"

"বুকিং দিন বললেই বুকিং দেওয়া যায় না। এখন ইউনাইটেডে কোনো

ফ্লাইট নেই।"

"না থাক। আমেরিকানে দেখুন। টি. ডবলু. এ দেখুন—হাজারটা এয়ার লাইনস আছে"—

"হাজারটা আর দু-হাজারটা যাই থাক, তাতে বুকিং নেই আপনার।"

"দোষটা আপনাদের। বুকিং চেঞ্জ করে দিন অন্য এয়ারলাইনসে।"

"যা হয় না—আ"—

"একশবার হয়।"

"জায়গা নেই।"

"কে বলল? জায়গা করে দিতে হবে।"

"জায়গা হবে না।"

"দেখুন, বাজে কথা বলছেন কেন? আমি তো দেখতেই পাচ্ছি আপনি খোঁজই নিচ্ছেন না। কনেকশন দেবার দায়িত্ব আপনার। আজ আপনাদের দোষেই আমি এখানে স্ট্র্যানডেড হয়ে গেছি।"

"দোষের ব্যাপার নয়। স্ট্র্যানডেড হবার দায়িত্ব আপনারও যতটা, আমাদেরও ততটা। কাউকে ব্লেম করা বৃথা।"

"আমার দায়িত্বটা কি রকম? হ্যাঁ, একটা অবশ্য দায়িত্ব আছে, ভুল করে হাওয়া-ই-হিন্দে এসেছি। মোটেলে আমি যাব না। একটা ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে নিয়ে চলুন, এবং ওভারনাইট থাকার ক্ষতিপূরণটা দিয়ে দিন।"

"কিসের ক্ষতিপূরণ?"

"আমি নিয়ম জানি না ভেবেছেন? রাত্রিবাস, বাথরুমের স্লিপার, মাজন-সাবান বুরুশ ইত্যাদি, তোয়ালে, সোয়েটার, একপ্রস্থ বিজনেস স্যুট—সব কিছুই আপনাদের দেবার কথা। এক্ষুনি। কই, দিন?"

"[এরা যে লং ট্র্যাভলে সত্যি বেরোয় কী করে? হাতে একটা ওভারনাইট কেসও রাখেনি?] কি? এখন চাইছেনটা কী? 'সাম ডো?' মালকড়ি? জেনে রাখুন এখন ওসব হবে না। কাল সকালে অ্যাকাউন্টস ওপন করলে আসবেন। অন্য লোকে ওসব ব্যাপার দ্যাখে। আমি না। কিন্তু কাল আপনাকে স্যুটকেসই দিয়ে দিচ্ছি আমরা।"

"ওসব লম্বা বাক্য ছাড়ুন। আমি সব নিয়ম জানি। ক্ষতিপূরণ হাতে হাতে দেবার কথা। আগেও আমার বাক্স কি হারায়নি নাকি? সাত বছর আগে আমেরিকান এয়ারলাইনস ইন্টারনাল ট্র্যাভলেই পঁচিশ দিয়েছিল, রাত বারোটার সময়ে। এখন, ইন্টারন্যাশনালে রাত নটায় কেন দেবেন না শুনি? অন্তত পঞ্চাশ তো নিশ্চয়ই হয়েছে—ক্ষতিপূরণের নতুন অঙ্কটা সাত বছরে বেড়েছে নিশ্চয়?"

"ডলার কি গাছে ফলে ম্যাডাম? আর হাসাবেন না। যান, ট্র্যাভেলার্স

লজে চলে যান—”

“একটা সস্তা স্লিপিং স্যুট, বারো. সস্তা হাউসকোট আঠারো, চটি—পাঁচ ছয়, সস্তা মাজন সাবান ব্রুশ চিরুনী—চার, আন্ডার গারমেন্টসের চেঞ্জ এক সেট, আঠারো, তোয়ালে প্রভৃতি, দশ, বিজনেসস্যুট বাদই দিচ্ছি—কত হলো ? ষাট-সত্তর ? তাও তো অন দ্য স্পট মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টসের তালিকা এতেই শেষ হয়নি—আরো আছে—”

“কেন বাজে বকছেন ? অ্যাকাউন্টস বন্ধ হয়ে গেছে। শুনলেন না ?”

“এটা অন্য অ্যাকাউন্ট। এত লোকের এত ব্যাগেজ আসেনি, একটা নতুন কাউন্টারই খুললেন, অ্যাকাউন্টেরও নিশ্চয় নতুন কাউন্টার খোলা হয়েছে। টাকা আমি চাই না, জিনিসপত্তরগুলো কিনে দিন। আর এগুলো রাখবার জন্যে একটা ওভার নাইট কেস ! তিরিশ। এই ধরুন একশো মতন লাগবে।” ভদ্রলোক প্যান্টের দুই পকেটে দুই হাত ভরে, পাইপটা কামড়ে দাঁতের ফাঁকে হেসে বললেন, “ম্যাডাম. ইউ আর ওয়েস্টিং মাই টাইম। নট আ সেন্ট। নট আ ফার্দিং। আই ক্যান গিভ ইউ নাথিং। চাপ দিয়ে লাভ নেই। হাওয়া-ই-হিন্দ আপনাকে কিছুই কিনে দিতে বাধ্য নয়।” তারপর পাইপ সরিয়ে বলেন, “চলে যান মোটেলেই তোয়ালে সাবান দেবে। বাকীগুলো ছাড়া এক রাত্রি দিব্যি চলে যায়। অ্যাটাচড শাওয়ার। হাউসকোট দিয়ে কী হবে ? আর আমার তো শার্ট প্যান্ট পরেই দিব্যি ঘুম হয়। শাড়ি তো আরো কমফরটেবল গারমেনট।”

“আপনিই বরং এবার থেকে শাড়ি পরে কমফর্টেবলি ঘুমোবেন। —আমি এক্ষুনি লস এঞ্জেলেস চলে যেতে চাই, কনেকশনটা করে দিন। দেখি, বরং সেখানে গিয়ে যোগাড় করব ক্ষতিপূরণ।”

“কনেকশন নেই। আর দেরি করলে ট্রাভেলার্স লজেও বুকিং পাবেন না।”

“ঐ এ-বি-সি গাইডটা একটু দেখি তো ?”

“নট ফর দ্য প্যাসেনজারস। স্যরি।”

“নিজেও কনেকশন করে দেবেন না ? আমাকেও খুঁজতে দেবেন না ? যত দেরি করছেন—তত ওদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে না ?”

“না। ওটা পশ্চিম। ওখানে দেরিতে রাত হয়।”

ভদ্রলোক অন্য কাজে মন দেন।

নাঃ, আর ‘আয়রণ উওম্যান’ ইমেজ থাকছে না। এবার আমি কাতর হয়ে পড়েছি মনে মনে।

“কেন মিছিমিছি এত ঝামেলা করছেন ভাই, বলুন তো ? লং জার্নি করে এসেছি, বাক্সটাক্স সব হারিয়ে গেছে, সামনে আরেকটা লং জার্নি, কেন বাজে ঝুট্-ঝামেলা করছেন ? দিন মশাই, কনেকশনটা করে দিন—” ঠিক তক্ষুনি,

"একি! আপনি এখনও এইখানে?" একটি বিস্ময়বিদীর্ণ ধ্বনি কানের কাছে বাজলো।

৫

সেই শিখ্ ছেলেটি।

কেনেডি এয়ারপোর্টের এই ট্র্যাজিডিতে যে বারবার ভগবদ্-প্রেরিত দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে।

"এখানে কী করছেন? লস এঞ্জেলেসের প্লেন যে সব বেরিয়ে গেল—আরো দেরি করলে আজ যেতেই পারবেন না—ইশ্! চলুন চলুন, দেখি সাড়ে ন'টা নাগাদ একটা ফ্লাইট আছে বোধহয়—কিন্তু আমেরিকানের না ইউনাইটেডের ঠিক মনে পড়ছে না—" কথা বলতে বলতেই, সামনের টেলিফোনের সুরেলা বোতাম-গুলো টিপতে থাকে ছেলেটা—"হ্যালো, ইউনাইটেড?" দু-চারটে কথা হয়, তারপরেই প্রচণ্ড একটা তাড়া পড়ে যায় আমাকে ঘিরে—হঠাৎ হাত থেকে ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়েই ছেলেটা দৌড়ুতে থাকে। আমাকেও প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে—"ছুট্ ছুট্ ছুট্—সময় নেই একটুও—আমাদের অন্য টার্মিনালে যেতে হবে—পথে ট্যাক্সি ধরতে হবে—" বলতে বলতে সে আগে আগে ছোটে, পেছন পেছন কোঁচা ধরে হাইহিল খটখটিয়ে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে আমিও ছুটি, চেঁচাতে চেঁচাতে।

"কিন্তু আমার কাছে যে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই—আগে ব্যাংকে, আগে ব্যাংকে—।"

"ব্যাংক পরে হবে—আগে প্লেন—।"

কেনেডি এয়ারপোর্টের সব চোখ মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় এই অপরূপ শোভাময় যাত্রার দিকে। ছুটে বাইরে বেরিয়েই যে-কোনো একখানা লিমুজিন থামিয়ে চট্ করে ছেলেটা দোর খুলে আমাকে ঠেলে ভেতরে পুরে দেয়, নিজেও ঢুকে প্রায় আমার কোলের ওপর বসে পড়ে সোফারকে বলে—"ইউনাইটেড, জল্দি"—লিমুজিনটায় অন্য কোন্ একটা এয়ার-লাইনের নাম ছিল। সোফার হাসতে থাকে। পিছনের সীটে বসা তার যাত্রীরাও। ছেলেটার কানে হাসি-টাসি ঢুকছে না। উদগ্রীব হয়ে বসে আছে আমার ব্রীফকেসটা বগলে চেপে। "টিকিট বের করুন, টিকিট"—বলতে বলতে ইউনাইটেডের বাড়ি এসে যায়। নেমে, একগাল দেঁতো হেসে লিমুজিনওলাকে ধন্যবাদ দিয়েই সে আমাকে নিয়ে দৌড়ে ভেতরে ঢোকে—"সোজা এই পথে দৌড়ে যান, অমুক নম্বর গেটে গিয়ে টিকিটটা দেখান, আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে আসছি—এই নিন ব্রীফকেসটা—।"

আমার মুখের অবস্থা দেখে তার কী মনে হয়, পিঠে হাতটা রেখে, মিষ্টি হেসে বলে—"সব ঠিক হো জায়গা। ডর্‌নেকা কুছ নহী হ্যায়—আইল্‌ বি ব্যাক ইন আ মিনিট—।"

কান্নার স্বভাব কুকুর জাতীয়।

প্রশ্রয় পেলেই কান্না চোখের মাথায় চড়ে বসে।

ছুটলুম অমুক নম্বর গেটের দিকে।

বাপ্‌ রে বাপ্‌। এয়ারপোর্ট বটে একটা! এক একটি টার্মিনালই এক একটা নেতাজী স্টেডিয়াম। একগেট থেকে আরেক গেটে যাওয়া মানে নেতাজী স্টেডিয়ামের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি দৌড়ে পার হওয়া। বুড়োমানুষ হলে কী করতুম কে জানে?

হাঁপাতে হাঁপাতে যাকে টিকিট দেখালুম, সে হেসে বললে—"রিল্যাক্স। সীট খালি নেই। ওয়েটিংয়ে রাখছি তোমাকে। কেউ যদি নো শো হয় তখন যেতে পারবে।"

বসে আছি তো বসেই আছি।

এত তাড়াহুড়ো করে এসে কী লাভ হলো? প্লেনও বসে আছে। একে একে অন্য অ্য জায়গার প্লেনগুলো ছেড়ে দিল। ঘর এখন প্রায় খালি। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করি—কিছু হলো?

সে হাসিমুখে বলে—এখনো না।

পাগড়ীর চিহ্ন নেই।

বুঝতেই পারি, পালিয়েছে। আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যখন দেখেছে হলো না, তখন লজ্জায় পালিয়েছে। এসে করবেই বা কী সে? জায়গা তো হলো না। এখন আমি কোথায় যাবো? ব্যাংকে। টাকা ভাঙাবো। ব্যাংক কি খোলা? তারপর ট্যাভলার্স লজে? নাকি বন্ধুবান্ধবদের ফোন করে দেখবো, কে কে আছে। এইটে সামারের মুশকিল, কেউই থাকে না শহরে।

এবার এঞ্জেলেসের ফ্লাইট ঘোষিত হলো। ডাক শুরু।

হলো না। আমার যাওয়া হলো না আজ। এটাই নিউ ইয়র্ক থেকে শেষ প্লেন। শিখ ছেলেটাও কেটে পড়ল? 'ম্যানেজারের ঘরে যাচ্ছি' বলে চলে গেল। এটাতেই বড়ো বেশি মর্মাহত লাগছে। কেননা মুহূর্তের জন্যে ওকে মনে হয়েছিল, আমার স্বজন। মানুষ সত্যি আজকাল বড্ড সামান্য হয়ে গেছে, বড়ো তুচ্ছ।

এসে বলে তো যেতে পারতো, 'স্যরি, পারলুম না?' আসলে কেউ কারুর জন্যে কেয়ার করে না। জগৎটাই এইরকম হয়ে গেছে। সবাই এক। ক্যালস। স্বার্থ না থাকলে, কিছু করে না। হেনকালে এ কী হেরি?

ছুটন্ত একটি পাগড়ি। হাসিমুখে হাত নাড়ছে। সোজা কাউন্টারে গিয়ে

কিছু বলল, তারপর আমার কাছে এসে আবার বলা নেই, কওয়া নেই, ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "—ভেরি স্যরি। কিছুতেই ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। ফুলাি বুকড—অবশেষে পেরেছি। যাক্ বাবা, লাস্ট ফ্লাইট ফ্রম নিউ ইয়র্ক আজ এটাই—।" ততক্ষণে আহ্লাদে ছেলেটাকে জাপ্টে ধরেছি আমি।

"আরে আরে, করেন কি! করেন কি।"

তুমি কী করেছো, তা মুখে তো বলতে পারলুম না। আরেকটু হলেই ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল আমার। লাস্ট ফ্লাইট ফ্রম নিউ ইয়র্ক'ই তো কেবল নয়, আরেকটাও খুব জরুরি ফ্লাইট ধরিয়ে দিয়েছো যে ভাই! যার গন্তব্য সুদূরে, বিস্তার অনেক গভীরে, অন্তর্লীন ভবিষ্যতের মধ্যে সেই যাত্রা। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

"আপনাকে কেউ নিতে আসবে তো?"

"এসেছিল নিশ্চয়। আমার তিন বোন। ফিরেও গেছে নিশ্চয়।"

"তবে? এখন কী করা? পয়সা ভাঙানোরও তো আর সময় নেই। এটা তো আবার পৌঁছুবে গিয়ে ইন্টারনাল টার্মিনালে, সেখানে ব্যাংক খোলা না থাকতেও পারে।" সত্যি সত্যি চিন্তিত দেখায় তার তরুণ মুখ।

"এঞ্জেলেসে নেমে বাড়িতে ফোন করতে হলেও তো পয়সা চাই," পকেট থেকে একমুঠো খুচরো বের করে সে আমার হাতের মুঠোতে গুঁজে দিতে যায়—"এগুলো রেখে দিন—"

"কি মুশকিল, আমার দরকার নেই—।"

"যদি নেমে ফরেন কারেন্সি ভাঙাতে না পারেন? যাচ্ছেন মাঝরাতে। ব্যাংক বন্ধই হয়ে যাবে ততক্ষণে। এটা তো ইন্টারন্যাশনালে যাচ্ছে না—অত রাত্রে ট্যাক্সি করে একা মেয়েদের যাওয়াটাও লস এঞ্জেলসে খুব নিরাপদ নয়। কেউ যদি নিতে আসতো—।"

"তুমিই একটা ফোন করে দাও না ভাই আমার বোনকে?"

"গ্রেট! সেই-ই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। তিনঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয় খবরটা দিয়ে দিতে পারবো। দেখি নম্বরটা।" ফোন নম্বরটা হাতের পাতায় লিখে নিতে নিতে চোখ তুলে ছেলেটি বলে—"ডোন্ট ওয়ারি, যদি ফোনে আপনার বোনেদের নাও পাই, তবুও সামবডি উইল বি দেয়ার। আপনার নম্বরটা না পেলে আমার কাকাকেই বলে দেবো—কাকা-কাকীও লস এঞ্জেলেসে থাকে—নামটা ডাক্তর দেও সেন তো? সামবডি উইল টেক চার্জ অফ ইউ দেয়ার অ্যাট দি এয়ারপোর্ট!" ধবধবে হাসে ছেলেটা—সিকিউরিটির দরজায় ঢুকতে ঢুকতে ওর হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিই—শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি—"তোমার নাম কী ভাইয়া?"

"বেদী। বেদী ইন দি এয়ার ট্রাফিক্…"

৬

নেমে দেখি ভগ্নীদ্বয় খেপে লাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে আবার খুদে ভগ্নীটি. রিনিও হাজির। নামবামাত্র প্রথম বাক্য—

"প্রত্যেকবার? প্রত্যেকবার সুটকেস হারিয়ে আসবে? ফ্যান্টাস্টিক!"

"ইচ্ছে করে হারিয়েছি নাকি? কিন্তু তোরা জানলি কী করে?"

"একমাত্র তোমারই অনবরত এমন হয়। এত লোক তো আসে. কারুর তো হারাচ্ছে না?"

"কেন? প্রসূনেরও তো হারিয়েছিল?"

"সেও তোমার মহারানী এয়ারওয়েজেরই দৌলতে!"

"পেয়ে তো গেছল শেষপর্যন্ত। অনেক ঝঞ্ঝাট করে।"

"তুমিও তো পাও শেষ অবধি। আমসত্ত্ব-টত্ত্ব সবসুদ্ধুই। কিন্তু বেড়ানোর মেজাজটা মাটি!"

"দুটোই গেছে রে এবার। দুটো বাক্স ছিল।"

"আমাদের আমসত্ত্ব ছিল?"

"ছিল।"

"বেদী বলে একটা লোক ফোন করেছিল নিউ ইয়র্ক এয়ারপোর্ট থেকে—বলল, তোমার বাক্স আসেনি বলে পর পর প্লেন মিস্ করেছ। জার্নি ডিলেইড—এই ফ্লাইটে আসছো. সঙ্গে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই—লোকটাকে বেশ ভালোমানুষ বলে মনে হলো—অতি অবিশ্যি এয়ারপোর্টে থাকতে বলল কাউকে।"

"এত কথা বলেছে ছেলেটা?"

"আরও বলে দিল তোমার কাছে কমপ্লেন্ট-ফর্মে নাম-ঠিকানা-ফোন-নম্বর-সব দেওয়া আছে, নিউ ইয়র্কের হাওয়া-ই-হিন্দের অফিসে টেলিফোন করতে হবে—কলেক্ট কল করলে পয়সা লাগবে না, ফোনে খোঁজ নিতে হবে বাক্সোর কী হলো। এল কিনা।"

"আশ্চর্য তো! ছেলেটা কটা মিনিটই বা দেখেছে আমাকে?"

"তারই ভেতর বুঝে নিয়েছে তুমি কী অপরূপা বস্তু। বয়স কত?"

"কার?"

"তোমারটা জানি। সেই বেদী ব্যক্তিটির?"

"কত আর? তোদের থেকেও ছোটো, খুবই ছেলেমানুষ—"

"তাই এখনও এতটা ওয়ার্ম আছে আর কি।"

"কিন্তু আরেকটাও লোক ছিল, বুঝলি? অতি পাজী, সে না—?"

"বয়েস কত?"

"এই পঁয়তাল্লিশ?"

"ওটা পেজোমিরই বয়েস, দিদি!"

সকালে উঠেই খুকু বললো, "দাও কমপ্লেন্ট ফর্মটা আর টিকিটটা। আগে কয়েকটা জেরক্স কপি করেনি। এক্ষুনি তো দু একটা হারিয়ে ফেলবে। তাহলেই সব গেল। মালের রসিদ দুটো আছে? তারও জেরক্স কপি করানো দরকার।"

রুঙকু বললো, "দুখানা বাক্সই হারিয়ে এলে? নাঃ, তোমার সত্যি এলেম আছে। চলো, কিছু দরকারী জিনিসপত্তর কিনে দি তোমাকে যা যা লাগে। এবারে আর অক্সফ্যামে বা স্যালভেশন আর্মিতে নয়, ভালো দোকানে চলো।"

জমানা বদল গয়া। গতবারে যখন বাক্স হারালো, তখন ওরা ছোটো। ছাত্র। কিছু পয়সাকড়ি নেই। আর এখন? মান্যগণ্য ভদ্রলোক। চাকরি বাকরি করছে, রোজগারপাতিও মন্দ নয়—সারি সারি ফুলন্ত ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরার বীথিতে ছবির মতন লাল টুকটুকে বাংলো বাড়িটি নিজেদের পয়সায় কেনা। তাতে সিল্কের রুমালের মতন সবুজ একটুকরো ঘাসজমি পাতা, শ্যাওলামাখা পাথরের ফোয়ারা আঁটা। গ্যারাজে আবার দু দুখানা গাড়ি। অবশ্য মনীষার কাকুর মতন এখনও নয়। মনীষার কাকুর একটা গাড়ি বাইরে পড়ে থাকে। মনীষা বললো, "কাকু, সাদা গাড়িটা বাইরে কেন?"

"গ্যারাজে যে জায়গা নেই রে।"

"কেন? কী ভরেছো গ্যারাজে?"

"আবার কী? দামী গাড়িগুলো।"

"চেহারা দেখে ওটাও তো বেশ দামী গাড়ি বলেই মনে হচ্ছে। অমন লম্বা ফিনফিনে দেহ, আবার কন্‌ভার্টিবল্ ছাদ—কী গাড়ি ওটা?"

"ওটা? ক্যাডি।"

"অ্যাঁ? ক্যাডিলাক হচ্ছে গিয়ে তোমার শস্তা গাড়ি? অন্যগুলো তবে কী কী?"

"একটা মার্সিডিস, অন্যটা," একটু লজ্জা পেয়ে কাকু বলেন, "রোল্‌স্।" এখন, তাঁদের হলো গিয়ে 'ভ্যানডারবিলট' জীনসের কোম্পানীতে হংকং থেকে মাল সাপ্লাই-এর ব্যবসা। লন্ডন-নিউ ইয়র্ক-প্যারিস।

আমার বোনেরা এখনও অতটা এগোয়নি। একজন মাস্টারী, আরেকজন এঞ্জিনিয়ারী করে। ছোটটার পড়াশুনো শেষ হয়নি। এখন, ওরা তো বললো দোকানে চল। কিন্তু আমি বললুম, "এক্ষুনি কী হবে কিনে? আজকাল তো সবাই সব সাইজ পরে। তোদের জামাকাপড়েই কদিন চালিয়ে দিই। ততদিনে

পেয়ে যাবো বাক্সোটাক্সো।"

"তবু হাতে পেয়েছো যখন কিছু, কিনে নাও।"

"কত দিলে?"

"কী দেবে?"

"কমপেনসেশন?"

"কিছু দেয়নি রে হাওয়া-ই-হিন্দ।"

"সে কী গো?"

"যাঃ! হতেই পারে না।"

"হয়েছে। কিছু দেয়নি।"

"হাওয়া-ই-হিন্দ কি খেপেছে?"

"না তুমিই খেপেছো?"

"ওরা খেপবে কেন? যদি না দিলেও চলে, তবে দেবে কেন? টাকাটা হয়তো নিজেরাই নিয়ে নেবে, প্রত্যেক প্যাসেনজারের নামে অ্যাকাউন্ট দেখাবে। প্যাসেনজারেরা কে আর লেগে থাকবে ওই টাকার জন্যে? লোকের টাইম কই?"

"দোষটা দিদিরই। তেমন করে চায়নি আর-কি।"

"তুমি ছেড়ে দিলে কেন? আদায় করে নেওয়া উচিত ছিল।"

"তোমার মতন গা-ছাড়া প্যাসেনজারদের প্রশ্রয় পেয়েই ওদের চোরামি চালাতে পারছে—"

"ওরে! দিল না রে, দিল না। সে বড় কঠিন ঠাঁই। চাইনি কি আর? অনেক করে চেয়েছিলুম। কিছুতেই দিল না। উলটে ট্র্যাভলার্স লজে পাঠিয়ে দিচ্ছিল আরেকটু হলেই—"

"কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছিল?"

"ট্র্যাভলার্স লজে—"

"সেটা কী জিনিস?" রুঙকুর ভুরু কুঁচকে ওঠে।

"মোটেল—"

"মোটেলে কেন?" খুকুর মুখ হাঁ হয়ে যায়।

"হাওয়া-ই-হিন্দের প্যাসেনজারদের ঐখানে সস্তায় বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টে পাঠিয়ে দেয়।"

রিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসে। "যাঃ। মোটেলে? এয়ারলাইনস? দিদিটা যে কী বলে!"

"হ্যাঁ মোটেলে। আমাকেও দিচ্ছিল, কিন্তু আমি যাইনি।" খুকু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—"রুঙকু, বুঝেছিস ব্যাপারটা? আজকাল যে গাদা গাদা অশিক্ষিত গ্রাম্য ভারতীয় ইমিগ্র্যান্টস আসছে, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা।"

"ভাগ্যিস যাওনি! বোকা পেয়ে দিদিকেও ঠেসে দিয়েছে তাদের মধ্যে।

সবাইকে নিশ্চয়ই ওখানে পাঠায় না। কেবল বোকাদের। ঐভাবে পয়সা বাঁচায়।"

"তাই তো বলছি।"

"কিন্তু এ তো খুবই অন্যায়। একই ভাড়া সবাই দেবে, অথচ দু রকম সার্ভিস পাবে? এ তো চিটিংবাজী—"

"এই প্লেনটা যদি না ধরতে পারতুম, এতক্ষণে ট্র্যাভলার্স লজে! তার ওপর ট্যাক্সিভাড়া যেত, এবং খাবার খরচ।"

"ভাগ্যিস প্লেনটা ধরতে পেরেছো—! টাকার জন্য ওয়েট করনি?"

"কিসের পরওয়া কর তুমি? ফুঃ—"

"ঠিক! কে চায় ও-ব্যাটাদের টাকা? চল, চল, কী কী চাই, সব কিনে দিচ্ছি।"

"কিছু চাইনা রে বলছি তো, তোদের পোশাকপত্তরেই আমার চলে যাবে কটা দিন—"

"দেখি তো দিদি হাওয়া-ই-হিন্দের নিউ ইয়র্কের ফোন নম্বরটা—এক্ষুনি কমপ্লেন কর—"

"দিদিকে ফোন করতে দিস না খুকু, সব গুবলেট করে দেবে। তুই নিজে কথা বল—"

"সে আর বলতে? আমিই কথা বলছি, দাঁড়া—এই তো নম্বর, কলিং কলেক্ট—টু ওয়ান টু—"

৭

"হ্যালো, টু ওয়ান টু—ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স—লস্ এঞ্জেলেস থেকে বলছি, হারানো লাগেজ বিষয়ে—মিস্টার গিজদার আছেন? ও, গিজদারই বলছেন? এটা আপনার নিজস্ব নম্বর? ও। সুপ্রভাত। আমি ডক্টর সেন বলছি," অম্লান বদনে খুকু বললো, "অমুক ফ্লাইটে আমার দুটি কেস গতকাল—কমপ্লেইন্ট নম্বরটা চাই?"

"এই যে—"

"এক মিনিট? হ্যাঁ, ধরে আছি। কী বলছেন? আপনারা বাক্সটা পেয়ে গেছেন? বাঃ। পালোস ভের্দেসের ঠিকানায় পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে? ইউনাইটেড এয়ারলাইনসে খোঁজ নেবো? বাঃ, থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ—শুনুন··· হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো?···উফ্—দিলে কেটে, কথা শেষই হলো না। আচ্ছা লোক তো? অন্য সুটকেসটার কথা মোটে বলাই হলো না!"

"আগে একটাই তো আসুক ?" রঞ্জুকে সান্ত্বনা দেয়।

"দেখি ইউনাইটেডে একবার ফোন করে।"

"হ্যালো ? ইউনাইটেড ? গুড মর্নিং। আপনাদের কার্গো ডিভিশনকে একটু —হ্যালো, গুড মর্নিং। আজ সকালে হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে কি একটি বাক্স ডক্টর সেনের জন্যে পালোস ভেরদেসের ঠিকানায়—কী বলছেন ? হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে কোনো বাক্সই আসেনি ? কোনো জরুরি মেসেজ ? তাও না ? ডক্টর সেনের জন্য— ? কী বললেন ? ডাক্তার-পেশেন্ট কারুর জন্যই কিছু নেই ? ধন্যবাদ।"

"হলো তো ? নো নিউজ। কি আশ্চর্য। সত্যি। সায়েবগুলো একদম পালটে গেছে, দেশটাই আর হেলপ্‌ফুল নয়। চেনা যায় না আমেরিকান বলে। —হ্যালো মিঃ গিজদার ? ইউনাইটেড বললো ওরা কোনো মেসেজ পায়নি হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে। ভুল বলেছে ? লস এঞ্জেলেসে বাক্স পৌঁছে গেছে ? বেলা দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে বাড়িতে থাকবো ? এখানেই পৌঁছে দিয়ে যাবে ? বেশ বেশ। ওঃ, থ্যাংকিউ। থ্যাংকিউ। কিন্তু অন্যটার কী হবে ? মানে আমার আরেকটা বাক্সও তো বাকী আছে ? নেই ? সে কি কথা ! [দিদি, নেই বলছে যে ?] আরে আছে আছে। আমার কাছে রসিদ রয়েছে তো। নম্বর ? এই যে, রসিদ নম্বর—দশ মিনিট পরে ? আচ্ছা আচ্ছা, নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার নম্বর ? থ্রি ওয়ান টু জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ···হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়িতেই আছি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।"

"দিদি, দুটো থেকে পাঁচটার মধ্যে তোমার লাগেজ পৌঁছে দিতে আসবে। ওই গিজদার খুব হেল্পফুল মনে হচ্ছে···ও নিজেই ফোন করে অন্য সুটকেসটার কথা জানাবে বলেছে। একটু খবর নিয়ে নিচ্ছে।"

দশ মিনিট কেন সারাদিনেই কোনো ফোন এল না। বাক্সোও না। তিন-দিনের মধ্যে না। খুকুর সঙ্গে রোজই ফোন হচ্ছে।

"কী ? বললেই হলো ? দেব না মানে ? ট্রেস নেই ? নো ট্রেস ? তবে সেটার দায়িত্ব কার ? আমার ? বাঃ, আপনারও না ? কী চমৎকার ! তবে কি সুটকেসের নিজের ?" খুকুর গলা উত্তপ্ত হতে থাকে—

"আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি এখানে। সব নষ্ট হয়ে গেল আপনাদের জন্য। দেখুন মশাই ওরকম রেলা দেখিয়ে কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি···তিনদিন সারা দুপুর ২-৫ বাড়িতে বন্দী হয়ে আছি। ইউনাইটেড আবার জানিয়েছে, ওদের কোনো ফ্লাইটেই আপনারা কোনো মালই পাঠাননি। দে হ্যাড রিসিভড্ নো মেসেজ ফ্রম ইয়ু। নো লাগেজ আইদার। হোয়াট ? হুজ লাইং ? আই অ্যাম মেকিং ইট অল আপ ? আই অ্যাম বিইং প্যানিকি ? আ নুইসেন্স ? ফর নো রিজন ?

"ওয়েল, মাই ডিয়ার মিস্টার গিজদাঘিচাং, লিসিন কেয়ারফুলি, আয়াম গোয়িং টু স্ন্যা ইওর প্যান্টস অফ্ফ্ ইউ। ইউ হিয়ার মি? ইউ ডোন্ট? আই সী।"

"ও কে, ইউ শ্যাল হিয়ার ফ্রম মাই ল্যাইয়ার দেন। রাইট? [খটাস।] অতি পাজী লোক এই গিজদার।"

"ও কি! ও কি! খুকু! ওতে কি জীবনে আর বাক্সো ফেরত পাব ভেবেছিস? হয়ে গেল! যাঃ—জন্মের শোধ—" প্রায় কেঁদেই ফেলি।

"থামো তো দিদি। বাক্সো-বাক্সো করে লাইফ হেল করে দিচ্ছো। জীবনে বাক্সোটাই সব নয়। আত্মসম্মান সবচেয়ে আগে। ব্যাটা আমাকে অপমান করেছে, ব্যাটা অতি দুঃসাহসী। বলে কিনা—"

"যাক্ গে, পাঁচটা তো এখনও বাজেনি"—রুঙ্কু সান্ত্বনা দেয়, "এসে যেতেও তো পারে আজকে?"

"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"—বলেই আমি এক ধমক খাই—

"এখনও ইয়ারকি?"—সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস কথা বলি ঃ

"আর কোনোদিন হাওয়া-ই-হিন্দে চড়বো না।"

"হ্যাঁ, সেটা যেন মনে থাকে।"

"আসলে বাক্সোটায় আমার কিছু জরুরী জিনিস—"

"জরুরি জিনিস ব্রীফকেসে রাখোনি কেন?"

এর উত্তর নেই। সত্যিই ব্রীফকেসে রাখা উচিত ছিল।

৮

সেদিনও এল না। ছ'টা বেজে গেল।

রিনি ঠাণ্ডা মানুষ। চট্ করে মাথা গরম করে না রুঙ্কুও। তারা দুজনে কনফারেন্সে বসল পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

"অত ধমকাধমকি করলে হবে না, স্বার্থটা আমাদেরই।"

"মিষ্টি করে বলতে হবে। তাতে যদি উদ্ধার হয়।"

খুকু ধমক দেয়—"তুই নিজেই বল্ গে যা মধুর স্বরে। আমি আর পারব না। গিজতাঘিচাং ব্যাটা আমাকে বলে কিনা মিথ্যেবাদী! নিজে মাইল মাইল লম্বা মিথ্যে কথা বলছে—ব্যাটা চোর—"

আমি বলি, "বেশ তো রুঙ্কুই কথা বল্ না একটু এবারে—"

"আমি বাবা অঙ্ক কষিয়ে মানুষ, কথাবার্তা বলতেই পারি না! বরং রিনি বলুক—"

"বেশ তো, তোমরা যদি বল, আমিই না হয় একটু দেখি চেষ্টা করে—"

"হাতী ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল।"

এটাই লিমিট। রিনিটা একদম গুড়গুড়ে। খুকু রুংকুর চেয়েও অনেক বছরের ছোটো। সেও কিনা আমার চেয়ে নিজেকে বেশি এফিশিয়েন্ট বলে বিশ্বাস করে!

রিনিই ফোন করল এবারে, তার কচি গলায় "হ্যালো—ও? ইজ দ্যাট মিস্টার গিজদার? গুড মর্নিং মিস্টার গিজদার! হাও আর ইয়ু দিস মরনিং? স্যরি অ্যাবাউট ইয়েস্টারডে। মী? ওঃ, চিনতে পারছেন না? আশ্চর্য- ডক্টর সেন! ফ্রম লস এঞ্জেলেস। রিমেমবার? মাই ভয়েস? ও, ইয়েস। হাউ রাইট ইউ আর। হ্যাঁ গলাটা বড্ড ভেঙে গিয়েছিল ক'দিন, ইন দ্য স্ট্রেস অ্যানড স্ট্রেইন অফ লিভিং উইদাউট মাই বিলংগিংস আই সাপোজ। তা, বাক্সোদুটোর কী হবে? একটা ব্যবস্থা করুন? ইউনাইটেড থেকে তো কালও দেয়নি। আজও বলছে কোনো বাক্সো বা মেসেজ আপনারা ওদের দেননি। অন্য বাক্সোটার খবর পেলেন? পাচ্ছেন না? ওটার জন্য তবে কমপেনসেশনটা দিয়ে দিন। কত? চল্লিশ ডলার? মাত্র? সেকি কথা। প্রতি কেজিতে বিশ ডলার?

কি বললেন? দু' কেজি? অন্য সুটকেসের ওজন ছিল দু কেজি। এটা আপনি কী বলছেন? বত্রিশ ইঞ্চির সুটকেস, খালি অবস্থাতেই ওজন অন্তত ছ' কেজি তো হবেই। এটা মালপত্রে ভর্তি ছিল।

—কী? মোট মালের ওজন লেখা আছে বিশ কেজি? একটাই আঠারো? যেটা পাঠিয়েছেন? অতএব অন্যটা দুই হতে বাধ্য?

পাগল হয়েছেন নাকি? বললেই হলো যা খুশি। এটা কি মগের মুলুক' আপনার উপরওলাকে ডেকে দিন। হবে না? ব্যস্ত? নামটা বলুন। এবার ফোন নম্বারটা দিন। ঠিক আছে। গুডবাই।

"উঃ, কী অ্যাবসার্ডলি বজ্জাত এই লোকটা দিদিভাই।"

"কী? হলো? মিষ্টমধুর সম্ভাষণে কাজ কিছু এগুলো?"

"একবার লোকটাকে আই শ্যাল স্যু ইওর প্যান্টস অফ্ফ্ বললে কি আর তাকে দিয়ে কাজ এগোয়?"

"বেশ তো আই শ্যাল কিস ইওর ফেস ক্রিমসন, বলেই দ্যাখ না।"

"আসলে লোকটা ভালো নয়। নইলে এত শত্রুতা করবে কেন? ওর লাভ কী হচ্ছে এতে? জাস্ট ম্যালিশাস ডিলাইট? আশ্চর্য সত্যি।"

এদিকে আমার যে ক্ষতিটা হলো, সে লোকসান তো চল্লিশ ডলারে অথবা চারশো ডলারেও মাপা যাবে না! কিন্তু একথাটা বলাও যাচ্ছে না কাউকেই— খালি বুক ভেঙে চোখে জল এসে যাচ্ছে, আর ওরা ভাবছে শাড়ির জন্যে দিদি কেঁদে ভাসাচ্ছে—

১

"হ্যালো, ইউনাইটেড ? সুপ্রভাত। ডক্টর সেন বলছি। আই বিলীভ দেয়ার ইজ আ সুটকেস ফর মি. হাওয়া-ই-হিন্দ—"

"প্লিজ ডু নট বিলীভ ইন সাচ রিউমারস। আমাদের কাছে কারুর কোনো সুটকেস নেই—"

"কিন্তু আমি যে শুনেছি ৮ই এসেছে ? পাঁচ নম্বর ফ্লাইটে, নিউ ইয়র্ক থেকে— ? প্লিজ একটু খুঁজে দেখুন না ?"

"অনেক কিছুই শুনতে পাওয়া যায় জগতে ডক্টর সেন। গুজবে কান দিতে নেই। আর এই নিয়ে একশো তিরাশীবার আপনি আমাদের ফোন করলেন।"

"দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। কিন্তু একটু যদি খুঁজে দেখতেন ?"

"যথেষ্ট খোঁজা হয়েছে। আপনি কি ভেবেছেন খুঁজে না দেখেই আমরা উত্তর দিচ্ছি ? এতই দায়িত্বহীন আমরা ?"

"না-না, তা-কেন, তা-কেন, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। নেই তাহলে : কিছুই আসেনি বলছেন ? আমি দুঃখিত। বা-ই।"

"আচ্ছা।"

"আচ্ছা দিদি এটা কী ? সত্যি দিদি, এসে অবধি কেবল সুটকেসের ধ্যান-ধারণায় রইলে ? কিছু দেখলে না, বেরুলে না, রোজ সকালে উঠে নিউ ইয়র্কে নিয়ম করে কালেক্ট কল করা, আর সারা দুপুর—'এই বুঝি বাক্সো আসে—' বলে ঘর আগলে বসে থাকা। রবার্ট ব্রুসের বড় বোন তুমি ভাই, তোমায় নমস্কার করি।'

"এই করে হপ্তা ঘুরে গেল, না পেলে একপয়সা কমপেনসেশন না একটাও বাক্সো। এর মানে কী ?"

"এ-যাত্রা তোমার নিশ্চয় ত্রহস্পর্শে যাত্রা ছিল। অযাত্রা।"

"সঙ্গে আচার, ডিম কি কলা এনেছিলে কি ?"

"বেস্পতিবারের বারবেলায় লন্ডন ছেড়েছিলে কি ?"

"ইয়ারকি মারিসনি বলছি। প্রত্যেকের তো এলেম দেখলুম। কেউ কিছু পারলি ? আমি ইচ্ছে করে ঘরে বসে আছি ? আমার বাক্সো—"

"কে কী পারবে ? হাওয়া-ই-হিন্দ তোমাকে যে-মোগলাই ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে, সেখানে আমরা তো কচুকাটা হয়ে যাচ্ছি—"

"বাপু-বাছা করেও হচ্ছে না। শালা-শুয়োরের বাচ্চা বলেও হচ্ছে না। ওরা একেবারে চোখের চামড়াকাটা দিদি। তুমি বরং নিউ ইয়র্কে চলে যাও—"

"গিজদার নিশ্চয় সেই লোকটা, যাকে আমি এয়ারপোর্টে দেখেছিলুম। যে আমাকে প্লেনের কনেকশন পর্যন্ত দিচ্ছিল না, কেবল ট্রাভেলার্স লজে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। সেই অতি পাজীটাই—"

"ওর বসের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে হবে। সত্যি সত্যিই পাওয়ারফুল পোস্টে যারা থাকে, তারা ছোট ব্যাপারে এমন হাতের সুখ করে নেয় না।"

"ফোন করেই দ্যাখো না। তুমি নিজেই কর এবার।"

"হ্যালো, গুড মরনিং। মিস্টার আইখমান? আমি আপনাদের এক প্যাসেঞ্জার, ডক্টর সেন, গত অমুক তারিখে···ফ্লাইটে হীথরো থেকে আসার সময়—"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সুটকেস আসেনি? আপনি এই নম্বরে—"

"মিস্টার গিজদারকে তো? তিনি খবর পর্যন্ত দিতে পারেননি আমার বাক্সোগুলো কোথায়।"

"তিনিই পারবেন। তিনি না পারলে আমিও পারব না, এটা তাঁরই ডিপার্টমেন্ট। দেখুন মালপত্র বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, আমি বরং বলে দিচ্ছি মিস্টার গিজদারকে—"

"উনি একটাকে মোটে ট্রেসই করতে পারেননি, অন্যটা বলছেন পাঠিয়েছেন ইউনাইটেড মারফৎ লস এঞ্জেলেসে, কিন্তু ইউনাইটেড বলছে কিছু আসেনি। আমি কিছুই পাইনি। ওভার নাইট কমপেনসেশনটুকু পর্যন্ত নয়--আপনারা যে এতটা ইন-এফিশিয়েন্ট এবং আনহেল্পফুল—"

"সেকি কথা? আপনি পঞ্চাশ ডলার নেননি?"

"দিলে তো নেব?"

"এক কাজ করুন। যা যা কিনেছেন তার রসিদগুলো সমেত লস এঞ্জেলেসের অফিসে চলে যান। সাতদিনের মতো হতে চলল এখনও নেননি? কী আশ্চর্য! তবে দেড়শর বেশি খরচা করবেন না। অবশ্য একটা সুটকেস তো পেয়েই গেছেন?"

তাহলে আর বলছি কী? পাইনি, পাইনি। একটাও পাইনি। দুটোই আপনারা হারিয়ে দিয়েছেন।"

"সেকি কথা? দাঁড়ান একমিনিট। একটু অপেক্ষা করুন।"

"এই যে, ডক্টর সেন, এখানে কথা বলুন।"

"হ্যালো।"

"দেখুন ডক্টর সেন এই নিয়ে আপনি আম্পটিন্‌থ টাইম আমাকে একই কথা বলতে ফোন করছেন। অকারণে মিস্টার আইখমানকে বিরক্ত করছেন। একটা, অর্থাৎ কালো সুটকেসটা আপনি পেয়ে গিয়েছেন, আমরা জানি।"

"কে বলল পেয়ে গিয়েছি? ইউনাইটেড বলেছে? আমাকে রসিদটা

দেখাবেন! আম তো পরশ্ব নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি. বলে আসবো আপনাদের অফিসে।—"

"আপনিই ডক্টর সেন কথা বলছেন?"

"অফ কোর্স। হু এল্‌স?"

"হাউ মেনি পার্সন্‌স আর মাস্কারেডিং অ্যাজ দিস্‌ ডক্টর সেন, আই ওয়ানডার? আপনাকে নিয়ে তিনরকম গলা হলো। একজন তো আমাকে মামলা করে সর্বস্বান্ত করে দেবে বলেছিল। আপনিই বোধহয়। নাকি আর কেউ? মোস্ট মিস্টেরিয়াস।"

"কী যে বলেন! অমন কথা কখনো আমি বলতেই পারি না। কিন্তু নো-ট্রেস বাক্সোটারই বা কী হবে?"

"ঐ বাক্সোটারই খোঁজে আমরা দু'বার লণ্ডনে ফোন করেছি—সতেরোটা টেলেক্স পাঠিয়েছি। নো-ট্রেস। নো-ট্রেসের জন্যে চল্লিশ ডলার কমপেনসেশন। আর কালোটাতো অলরেডি ডেলিভারড অ্যাট ইওর রেসিডেন্স। ও কে? অল সেট্‌ল্‌ড?"

"আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয় মিস্টার গিজদার। ইউ মাস্ট বি ক্রেজি।"

"আয়াম্‌ নট? ইউ আর। ডক্টর সেন। অর ডক্টর জেকিল। হু-এভার উড মাইট বি। অ্যান্ড ইউ আর ড্রাইভিং আস ক্রেজি।" ঠং করে রিসিভার নামিয়ে রাখল নিউইয়র্ক।

১০

"আমাকে ডক্টর জেকিল বলল, খুকু! শুনছিস?"

"তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? আইখমানকে অমন গিজদার গিজদার বলছিলে কেন? তাই বলেছে।"

"গিজদারই তো কথা বলল।"

"সে কি? প্রথমে তো মনে হলো আইখমানই ধরেছিল।"

"ধরেছিল, তারপর গিজদারকে ধরিয়ে দিল তো।"

"ধাচ্চলে।"

"তুমি নিজে নিউইয়র্কে না গেলে কিছু হবে না দিদি। ব্যাটারা যা তা করছে।"

"কিন্তু আমাকে যে ডক্টর জেকিল বলল।"

"ও কিছু না। কত কথাই বলে লোকে, সবকিছুতে মন দিতে নেই দিদি-

ভাই। খুকুদি. আমি, তুমি—তিনজন মিলে কথা বলেছি কিনা, তাই ঘাবড়ে গেছে।"

"কিন্তু কালো বাক্সো যে 'ডেলিভারড অ্যাট ইওর রেসিডেন্স', বলল? কিছুতেই শুনল না আমার কথাটা।"

"বললেই তো হলো না? তুমি দুটো সুটকেসের জন্য কমপেনসেশন চেয়ে অ্যাপ্লিকেশন করে দাও। রাজা-কুমকুমদেরও বাক্সো হারিয়ে গিয়েছিল। ওরা সাত হাজার টাকা মোট ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলো।"

"সা-ত হাজা-র? বলিস্ কি?"

"তা আর এমন কী? দুটো সুটকেস. আটশো ডলার তো পেতেই পারে। শুনতেই অত।"

"আমিও পাবো?"

"নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু টাকা কে চায়? আমি চাই বাক্সোটা।"

"ফের যতো।"

"বোকা কথা? দিদি?"

"ঐ টাকা দিয়ে তুমি অনেক বেশি শাড়ি কিনতে পারবে।"

"কিন্তু ওই শাড়িগুলো তো পাবো না? আমার ফুলশয্যার তত্ত্বের কাঞ্চিপুরম তিনখানা, সাধের বেনারসী শাড়িটা. একুশ বছরের জন্মদিনে পার্সেল করে বিলেতে পাঠানো মায়ের উপহার. আরেকটা শাড়ি শাশুড়িমায়ের. (হায়রে—আসল শোকের কথাটা তো বলতেই পারছি না. যে জন্য এত অস্থির হাহাকার! যে জিনিসটা ঐ বাক্সের সঙ্গে হারিয়ে গেল সেটা শাড়ি নয়—কিন্তু তোদের বলা তো যাবে না।—তোরা ভাবছিস দিদির কী বিশ্রী শাড়ি-শাড়ি স্বভাব হয়েছে।)"

"এনেছিলে কেন গুচ্ছের দামী কাপড়-চোপড়?"

"তুমি কি ইন্দিরা গান্ধী?"

"খবর্দার, এই ভুলটি আর করবে না।"

"কেবল নাইলন. আর জীন্স্। বুঝলে?"

"বাইরে কক্ষণো দামী কাপড় নিয়ে আসবে না।"

"দেশেও তো পরা যায় না কিছু, ট্রেনেও ডাকাতি, ট্যাক্সিতেও ছিনতাই। সত্যি আর পারি না। ভালো ভালো জিনিসপত্তর কখন পরবে লোকে?"

"পরবে না। ইন্দিরা গান্ধী হও, তখন পরবে। ততদিন নাইলন। চল, বাজারে।"

"চল—। যথা লাভ। রসিদগুলো তো জমা দিতে হবে।"

"তাছাড়া নিউ ইয়র্কে যাবার আগে পরনের জিনিসপত্তর কিছু কিনতেই হবে। ওখানে তো তোরা নেই? পরবো কী?"

"তাও তো বটে। কদিন থাকা তোমার নিউ ইয়র্কে?"

"তা পাঁচ-ছ দিন তো বটেই।"

"তাহলে তো শ-দুই ডলারের জিনিসপত্র এমনিতেই লেগে যাবে। ওরা কত দেবে বললি? দেড়শো, না?"

"হাওয়া-ই-হিন্দ লেজ ডাউন দ্য রেড কার্পেট ফর ইউ।"

লস এঞ্জেলেসে অফিসে ঢুকতেই রংবেরঙের চমৎকার বিজ্ঞাপন। ঘামতে ঘামতে রসিদ-টসিদ নিয়ে জমা দিতে গেলুম যে ভদ্রলোকের কাছে, সেই সাহেবি ছদ্মবেশে পার্শি ছেলেটি সত্যি খুব ভদ্র। যথাসাধ্য সহানুভূতি প্রদর্শন এবং দুঃখ প্রকাশ করে বলল: "রেখে যান, যথাসাধ্য শীঘ্র বিল তৈরি করে চেক পাঠিয়ে দেব।" কিন্তু কোথায়? এখানে? না ইন্ডিয়াতে? বোনেদের ঠিকানাই দিয়ে দিই।

"এদের কাছে ধার করেছি। টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেবেন এদেরকেই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। একজনকে অথরাইজ করে যান। তবে, কত টাকা যে দেবে, তা বলতে পারছি না। নিউ ইয়র্কের ওপর সবটা নির্ভর করে তো?"

"সে কি?"

"হ্যাঁ হাওয়া-ই-হিন্দ-এর মেন অফিস ওইটেই। আমি তো নগণ্য শাখামাত্র।"

"কি সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কী হয়েছে?"

"নাঃ। ইউনাইটেডের কাছে বাক্সের খবরটা পেলেন কিছু?"

"কিসের ইউনাইটেড?"

"ইউনাইটেড এয়ারলাইনস। আপনারা ওদের কন্ট্যাক্ট করেননি আমার সুটকেসের জন্য?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছেন না? শুনুন তবে। হাওয়া-ই-হিন্দ—আমার একটা সুটকেস নাকি ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মাধ্যমে গত ৮ই লস এঞ্জেলেসে পাঠিয়েছে এবং বলছে যে আপনারা সেটা আমাকে ডোর-টু-ডোর ডেলিভারি দিয়েছেন। এসব খবর আপনারাই কি দেননি মিস্টার গিজদারকে?"

"কেন দেব? এসবের অর্থ কী?"

"ইউনাইটেডে আপনাদের কোনো মালপত্তর আসেনি সম্প্রতি? নিউইয়র্ক থেকে?"

"না তো। আমার অজ্ঞাতসারে আসাটা হাইলি আনলাইকলি। আমিই তো এখানে ইনচার্জ। দাঁড়ান তবুও একটু জেনে নিচ্ছি। মেরিলিন ডিয়ার, ইউনাইটেডে একবার খোঁজ নাও তো প্লীজ— ডক্টর সেনের"—

"কী হলো মেরিলিন? খোঁজ পেলে?"

"স্যরি, জামশেদ, ওরা কিছুই জানে না। কোনো বাক্সোটাক্সো আসেনি ওদের ওখানে—আমাদের এয়ারওয়েজ থেকে।"

"দেখলেন তো?" ছেলেটি কাঁধ ঝাঁকায়।

"আপনিই দেখুন। আপনি আজই জানান এটা মিঃ গিজদারকে। তিনি তো বলছেন বাক্সো পাঠিয়েছেন। সেটা নাকি বাড়িতে পৌঁছেও দেওয়া হয়ে গেছে। তাই তার জন্য আর কমপেন্সেশন দেওয়া হবে না আমাকে। আর তার ওজন আঠারো বলে হারানো বাক্সোটার ওজন মাত্র দুই। কিছু বুঝলেন?" পার্শি ছেলেটির মুখে এবার নীরক্ত ভদ্রতার কঠিন মুখোশ। হাসিমুখেই সে বলল, "দেখুন, এটা আমার বোঝবার ব্যাপার নয়। ওটা মিস্টার গিজদারেরই বোঝার কথা।"

"যে আসে লংকায়, সে হয় রাজা।"

"এক্সকিউজ মি?"

"কিছু না। তুমিও ব্রুটাস।"

"ব্রুটাস? ব্রুটাস একেরমান? ইউনাইটেডের? ওকে চেনেন নাকি?"

"নাঃ। অন্য লোকের কথা বলছি। ঠিক আছে। চলি। থ্যাংকিউ।"

১১

শূন্যহাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে। নিউইয়র্ক যাচ্ছি। বিষণ্নবদনে তিন-বোনই এসেছে আমাকে প্লেনে তুলতে। এসেও বকুনি দিচ্ছে।—

"দিদিভাই, তোমার এবারের আসাটা ঠিক আসাই হলো না কিন্তু।"

"কেবল সুটকেস-সুটকেস করেই কাটালে। একটা কিন্তু অস্বাভাবিক চেঞ্জ হয়েছে তোমার। এতটা জিনিসপত্র-সর্বস্ব মন যে তোমার কবে থেকে হলো? এমন তো একটুও ছিলে না আগে? মোস্ট মেটিরিয়ালিস্টিক অ্যান্ড বোরিং কম্প্যানি।"

"যাক না তোমাদেরও দু বাক্সো 'সর্বস্ব' খোয়া! বিদেশ-বিভূঁইয়ে ব্রীফকেস বগলে ঘুরে বেড়াও না! দেখবো কেমন মোস্ট স্পিরিচুয়ালিস্টিক অ্যান্ড ইন্‌স্পায়রিং পার্সোনালিটি হয়ে থাকো!"

একটা সুটকেস যা হোক কিনতে হয়েছে, কাপড়চোপড় সাবান-গামছাও কিছু তাতে ভরতে হয়েছে, নিউ ইয়র্কের সাতদিন যাতে কেটে যায়। কিন্তু মনে শান্তি নেই। গেল। সেগুলো সব গেল। কেন যে সঙ্গে ব্রীফকেসে রাখলুম না? ওদিকে প্রকৃতপক্ষে নো-ট্রেসই হয়ে গেল পার্থর বাক্সোও। ওদেরই বা কী

কলব।

সময়ের অনেক আগে পৌঁছেছি। আমেরিকান এয়ারওয়েজের টার্মিনালে অলস চোখে বসে আছি। চারদিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ চোখে পড়লো ওদের অফিসঘরের বাইরে সারিবাঁধা ৭/৮টা সুটকেস।—ওগুলো কাদের রে? কেন আছে ওখানে? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কেউই জানে না ওগুলো কাদের। কেনই বা আছে। আনক্লেমড ব্যাগেজ পড়েই থাকে ওরকম। তারপর লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড অফিসে জমা চলে যাবে।

"যদি আমারগুলোও ওরকম পড়ে থাকে কোথাও?"

"হতেই পারে। তবে হীথরোতেও নেই। জে. এফ. কে. তেও নেই। ওগুলো তো খোঁজা হয়েছে তন্নতন্ন করে।"

"যদি এখানেই পড়ে থাকে? এই এয়ারপোর্টেই? আর জীবনে পাওয়া যাবে না।"

"ওরা বারবার জোর দিয়ে বলছে একটা লস এঞ্জেলেসে পাঠিয়েছে—"

"দিদি, তুমি সত্যি গল্প লিখতে লিখতে বড্ড ইম্প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেছো। ওসব গল্পেই হয়। লাইফে হয় না। ওরা বলুকগে।"

"তবু, ঘুরেই আসবি নাকি ইউনাইটেডের টার্মিনালটায় একবার? যদি ঐরকম আনক্লেমড পড়ে থাকে? ধর্ গিয়ে দেখলুম আমার বাক্সোও একধারে পড়ে আছে ঐ রকম?" ভয়ে ভয়ে যেই বললুম, অমনি খুকু-রুঙকু এই মারে তো এই মারে। "কী যে পাগলামি শুরু করেছো দিদিভাই। পড়ে থাকলে কি ওরা পাঠিয়ে দিত না? অতবার করে তুমি তাগাদা দিলে, আমরা অত অনুনয় বিনয় করলুম? থাকলে ওরা নিশ্চয় এতদিনে পাঠিয়ে দিত। পড়ে থাকতে পারে না। এরা আমাদের মতন অত ক্যালাস নয়, এখনও কিছু সিভিক সেন্স, কিছু সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির ট্রেস আছে ওদের চরিত্রে। নইলে এতদূর এগোতে পারত না।" —ভাগ্যিস রিনিটা ছোটো আছে। এখনও চাকরি-বাকরিতে ঢোকেনি। ওকে একটু সাধ্যসাধনা করতেই রাজী হলো ইউনাইটেডে নিয়ে যেতে। চিনিও না তো কোথায় কী। এয়ারলাইনের বাড়িগুলো সব দূরে দূরে আলাদা আলাদা। বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। খুকু-রুঙকু এখানে গার্জেনের রোলে। ওরা বলল, "আমরা তোমার পাগলামিকে বৃথা প্রশ্রয় দেব না। তুমি নিজেই ঘুরে এস। হাতে সময় আছে। যাও, মনের শান্তি করে এস।"

গিয়ে দেখি ইউনাইটেডেরও একটি ক্ষুদ্র কিউ রয়েছে আনক্লেমড ব্যাগেজের। ঠিক ওদের অফিসঘরের কাচের দরজা, কাচের দেয়ালের গায়েই ঠেশ দেওয়া আছে গোটা চার-পাঁচ সুটকেস। নানান সাইজের, নানা রঙের। একটা কালো। সাইজে পার্থর সুটকেসেরই মতন। অবিশ্বাসী চোখে এগিয়ে যাই। পায়ে

পায়ে। অবশ্যই হতে পারে না, নিশ্চয়ই নয়, তবুও, দেখতে ক্ষতি কী? বাক্সোটার গায়ে দুটো লেবেল সাঁটা। একটা হাওয়া-ই-হিন্দ-এর। আরেকটা গ্রেট ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের। আরও একটা ট্যাগ হাতলে বাঁধা। ইউনাইটেডের। তাতে লালকালিতে লেখা—immediate % RUSH—এবং আমার নাম, তথা লস এঞ্জেলেসের ঠিকানা। সঙ্গে তারিখ—৮ইয়ের। ৬ দিন হয়ে গেছে। রিনি এবং আমি চোখাচোখি করলুম, দুজনের চোখেরই ভাষা এক। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে স্বপ্নচালিত ব্যক্তির মতন এগিয়ে গিয়ে আমরা দুজনে সুটকেসটি হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে এলুম। কেউই আমাদের কিছু বললে না। দুটি মহিলা চেকার ব্যাজার মুখে তাকিয়ে রইলেন দরজার দুই পাশে। কিছু প্রশ্নও করলেন না। ব্যাগেজের রসিদও দেখতে চাইলেন না। রিনি খুশি খুশি গলায় বলল, "দিদিভাই, চলো যাই আমরা আরও গোটাকতক বাক্সো-প্যাঁটরা তুলে আনিগে। সবগুলো তুলে নিলেও তো ওরা কিছুই বলবে না দেখছি।" "কী কাণ্ড বলতো; আমাদের যথাসর্বস্ব এতটা আনসেফ ভাবে পড়ে থাকে? যে কেউ তো যখন খুশি তুলে নিয়ে যেতে পারে! আর কখনো ইনশিওর না করে ট্রাভেল করছি না।"

উদ্ধৃত সুটকেস হাতে যখন খুকু আর রুঙ্কুর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো হলো, তখন তাদের মুখের জ্যামিতিক সারল্য দেখবার মতন। এমনও যে হয়, হতে পারে, এই বেগবান, সর্বশক্তিমান, এফিসিয়েন্ট ইউ. এস. এ-তে, এটা ওদের পক্ষে অভাবনীয়। RUSH লেখা, নাম ঠিকানা সমেত বাক্সো বসে রইল হপ্তাখানেক। কেউ জানলও না? বারবার নানাভাবে খোঁজ নিলুম, তারা প্রত্যেকবারই না দেখে মিছে কথা বলল। অম্লানবদনে ভুলভাল জবাব দিল। এমনকি একটা এয়ারওয়েজকে পর্যন্ত বাজে খবর দিল? সত্য সেলুকাস!

এবার বোনেরা পই পই করে শিখিয়ে দিল। নেকস্ট স্টেপে কী কী করণীয়।

"খবরদার তুমি গিয়েই যেন ব্যাটা গিজতাঘিচাংকে জানাবে না যে কালো বাক্সোটা পাওয়া গেছে। তোমার পাগলামির জন্যেই ওটি কুড়িয়ে পেয়েছ। নেহাৎ বদ্ধ পাগল বলেই। আমাদের মতো নর্মাল লোকজন হলে ওভাবে লাস্ট মোমেন্টে ইল্লজিকাল অ্যাকশন একেবারেই নিত না—খুঁজতেও যেত না। পেতও না। তুমি সোজা নিউ ইয়র্কে চলে গেলে ওটা কি আর জীবনে পাওয়া যেতো? ওদের হাতে কোনো রসিদ নেই, কোনো প্রমাণ নেই, কে বাক্সোটা নিয়ে গেছে। ওদের অকারণ হ্যারাসমেন্টের দাম এবারে তুমি তুলে নাও।

এবার ওদের তুমি খানিকটা হ্যারাস কর। সমানে দুটো সুটকেসই ক্লেম করে যাও। ওদের প্রমাণ করবার কোনোই উপায় নেই যে এটা কদাচ রিকভার করা হয়েছে। বুঝলে? খবরদার ওদের বলে দিও না যেন যে এটা কুড়িয়ে

পেয়েছ। ওরা বড়টাকে মাত্র দু' কেজি বলছে অন্যায় করে। অন্তত পক্ষে তো ওটা বিশ কেজি ছিল? অতএব এটার কথা আর বলো না। তাহলে বিশ কেজিই পাবে। নাকের বদলে নরুণ তা হোক।''

"কিন্তু দিদি তো পোঁছেই আগে ঐ কথাটা বলে দেবে।'' রিনি হতাশস্বরে বলল।

"পেটে কোনো কথা থাকে না ওর?"

১২

"এতবড় আস্পর্ধা? এমন কথা বলেছে? 'ডক্টর জেকিল' বলেছে? উপরন্তু বাক্সো না দিয়ে-টিয়েও বলে কিনা 'দরজায় পোঁছে দেয়া হয়েছে'? নাঃ! সত্যি হাওয়া-ই-হিন্দ বড্ড পেয়ে বসেছে দেখছি।"

ইলুদি তো খেপেই গেলেন। বললেন, "দাঁড়াও! আমি কাপাদিয়াকে বলছি। ওরা দস্তুরী-মিস্তিরি থেকে গাদা গাদা টিকিট করে। হিন্দকে কাঁদিয়ে ছাড়বে।"

নিউ ইয়র্কে ইলুদি-সুহাসদাদের চেনে না এমন ভারতীয় প্রায় নেই। ইলুদির বাবা ছিলেন বিখ্যাত গান্ধীবাদী—স্বাধীনতা সংগ্রামী। গুজরাটের সকল মানুষের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে গেছেন। আর সুহাসদার চাকরি ইউনাইটেড নেশনসে বহু বছর হলো।

"তোমার বোনেরা অ্যাবসলুটলি করেক্ট," বললেন সুহাসদা। "ঐ সুটকেস ফেরৎ পাওয়া সম্পূর্ণ ভাগ্যচক্র। তার ক্রেডিট হিন্দ-এর নয়। তাছাড়া হিন্দ তো তোমাকে মস্তবড় প্রতারণা করছে, বত্রিশ ইঞ্চি সুটকেসের ওজন দু কেজি ধরে নিচ্ছে! তুমি কেন ওদের 'নিজেদেরই রসে নিজেরা সিদ্ধ' হতে দেবে না? টিট্ ফর ট্যাট্।"

"হ্যালো! মিস্টার গিজদার?"

"ডক্টর সেন, আই প্রিজিউম।"

"ঠিক ধরেছেন।"

"একটা আপনার বাড়িতে পোঁছে দেওয়া হয়েছে। অন্যটা নো-ট্রেস। চল্লিশ ডলার। ব্যাস। হয়ে গেল?"

"শুনুন মিস্টার গিজদার, আমি এখন নিউ ইয়র্কে।"

"কনগ্রাচুলেশনস। তাতে আমার কী?"

"আপনার কাছে আসব শিগগিরই!"

"তাতে এক্সট্রা কোনো লাভ হবে না আপনার, তবে হ্যাঁ ঐ চল্লিশ ডলার

হাতে করে ক্যাশ নিয়ে যেতে পারবেন।"

"ঐ চল্লিশ ডলার আপনাকেই দিলুম মিঃ গিজদার, কীপ ইট ইওরসেলফ। ইট্‌স্ আ প্রেজেন্ট।"

"কী ভেবেছেন আপনি নিজেকে? প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া?"

"কী ভেবেছেন আপনিই বা নিজেকে? প্রেসিডেন্ট অব দি ইউনাইটেড স্টেটস?"

"উই ও ইউ ওনলি ফোর্টি ডলারস। নাথিং মোর।"

"আচ্ছা জেদী জানোয়ার তো! জন্মে দেখিনি বাপু।"

"যার সঙ্গে যেমন।"

"ঠিক আছে।"

"ঠিক আছে।"

"আপনাদের মতো অপরূপ পাবলিক রিলেশনস কিন্তু আর কোনো এয়ার লাইনসের নেই।"

"নেই তো নেই। আমরা কিছু লোকসানে চলছি না তার জন্যে। আপনার মতো যাত্রী না পেলে আমাদের কোম্পানি লাটে উঠবে না।"

"সত্যি? উঠবে না তো?"

"সত্যি! বিশ্বাস করুন ডক্টর সেন, আপনি একটি মাথা ব্যথা ভিন্ন কিছু নন।"

১৩

সন্ধেবেলায় আমার সব জেরক্স-করা ডকুমেন্ট সমেত ইলুদি আমাকে দস্তুরী অ্যান্ড মিস্তিরির বড়কত্তার বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা ডিনার চলছিল। সকলেই প্রায় দস্তুরী অ্যান্ড মিস্তিরির লোক। দুজন বঙ্গসন্তান ইনক্লুডেড। ছোটখাটো একটি প্রবাসী ভারতবর্ষ। উঁচুতলার। মুহূর্তের মধ্যে ইলুদির কল্যাণে (নাকি রাই-হুইস্কি বার্বনের গুণে?) উপস্থিত নিমন্ত্রিতরা প্রত্যেকেই হাওয়া-ই-হিন্দ এর অবর্ণনীয় আচরণে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

"মোটেই ছেড়ে দেয়া হবে না। যা খুশি তাই করবে?"

"আপনাকে একা স্ত্রীলোক পেয়ে ওরকম শুরু করেছে—"

"দেখি, অমন করা বের করছি। মাসে প্রায় তিরিশটা ইন্টারন্যাশনাল টিকিট কাটি একমাত্র এই অফিস থেকেই আমরা? নো-ট্রেসকে কী উপায়ে ট্রেস করা যাবে, দেখছি, দাঁড়ান না—"

নানারকম সান্ত্বনা পাচ্ছি। যত্ন করে গৃহকর্তা কাগজপত্তরগুলো নিলেন। কালই বাঁশ দেয়া হবে।

"হ্যাঁ, একটু বেগ দেওয়া হোক ওদের—সত্যি বড্ড বাড় বেড়েছে। সেবার আমারও ভেনেজুয়েলা থেকে জাপান যাবার পথে, বাক্সোটা দিলে হারিয়ে—"

"আর আমার? রোম টু কোপেনহাগেন ঐটুকু ছোট্ট ট্রিপ, তার মধ্যেই বাক্সোটি আমার চলে গেল অস্ট্রেলিয়া। দু'হপ্তা পরে দেশে ফিরে পেলাম। ওঃ বাইরে কী কষ্টেই না দিন কেটেছে। ঐ শীতের দেশে!—তবে খুবই ওদের ব্যবহার ভালো. ডাচ এয়ারলাইনস তো হাওয়া-ই-হিন্দ নয়..."

মুহূর্তেই বাক্সো হারানোর সরস কাহিনীতে জমে উঠলো ঘর। সরস কাহিনীই—কেননা সব বাক্সোই শেষটায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। ট্রাজিক কেস ছিল না একটাও।

কাপাদিয়া পরদিন টেলিফোন করে বললেন, "আপনাকে ঐ বাক্সোটার জন্য ৪০ ডলারের বেশি কিছুতেই দেবে না। অন্য বাক্সোটার কথা বলব? ওটার জন্যই চেপে ধরা যাক। ওরা আপনাকে নির্লজ্জভাবে ঠকাচ্ছে।"

তা ঠকাচ্ছে। তাই বলে—ভাবতেই আমার ভেতো বাঙালী পেটের মধ্যে হিহি করে ঠাণ্ডা বাতাস বইল। বাক্সোটা হাতে পেয়েও আবার তারই জন্যে টাকা চাইব?

না বাবা।

ও পারব না।

কাউকে শাস্তি-টাস্তি দিয়ে আমার কাজ নেই।

"নাঃ, থাকগে। ওটা তো পেয়েই গেছি।"

"কিন্তু ওরা তো দেয়নি? ওটার জন্য আপনি সহজেই কমপেনসেশন পাবেন কিন্তু। আমি বলছি।"

"নাঃ. থাক।"

১৪

ইলুদি চটে লাল।

" 'নাঃ? থাকগে'? ওরা জোচ্চুরি করে জোর গলায় বিশ কেজিরটাকে দু' কেজি বলবে, চারশোর জায়গায় চল্লিশ ডলার দেবে. আর তুমি বলবে 'নাঃ থাকগে'? এ হতেই পারে না। এ তোমার অন্যায়টাকে সাপোর্ট করা। 'অন্যায় যে সহে' সেও দোষী। না, এবারে আমি নিশানকে বলছি, দাঁড়াও। দস্তুরী অ্যান্ড মিস্তিরি যদি না পারে, কোকাকোলা কোম্পানী তো পারবে?"

গড়গড় করে ছোট্ট সাদা টেলিফোনে কয়েকটা নম্বর ঘোরালেন ইলুদি।

"হ্যালো? নিশান?" তারপরেই শুরু হয় বিশুদ্ধ গুজরাতিতে আমার দুরাবস্থা বর্ণনা। "ভাই নিশান, ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, ওর

স্বামী আমার ছোটো বোনের ক্লাসমেট ছিল, ও নিজেও আমার ছোটো বোনের মতন, খুব ভালো মেয়ে, গল্প-কবিতা লেখে—ওর এমন হেনস্থা তুমি সহ্য করবে ?"

নিশান পটেল বিখ্যাত ভি. আই. পি. লোক। দেশেও যেমন শক্তিমান ছিলেন, এখানেও তেমনি। আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে কোকাকোলা কোম্পানীর অধিনায়কত্ব তাঁরই। দেশে থাকতে পুরো কোকাকোলা কোম্পানীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। বড় সোজা কথা নয়! স্ত্রীটি শান্তিনিকেতনের মেয়ে। সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্না, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন ভালো। নিশান নিজেও সাহিত্যে-শিল্পে উৎসাহী। ইলুদির তিনি ক্লাসমেট।

"নিশ্চয় করে দেবে তো? এই নাও, সব রেফারেন্স নম্বর-টম্বরগুলো। ফোনেই দিয়ে দিচ্ছি। রসিদ নম্বর এই···, কমপ্লেন্ট নম্বর এই···, আমার বন্ধুটির নাম এই···। দ্যাখো ভাই উদ্ধার করে দাও। বাক্সোটার জন্যে অত না, যতটা জরুরি ওদের শিক্ষা দেওয়া। অকারণে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে মেয়েটাকে। শুধু শুধু ওকে অপমান করছে, গিজদার বলে একদম বাজে লোক। বত্রিশ ইঞ্চি মালভর্তি বাক্সোর ওজন জবরদস্তি করে বলছে, দু' কেজি। বুঝতেই পারছো, কী পাজি!"

ঠিক এমন সময় একটা টেলিফোন এল। ইলুদি বললেন—"তোমার ফোন।"

"কি, ডক্টর সেন কী ভেবেছেন? ভেবেছেন দস্তুরী অ্যান্ড মিস্ত্রিরিকে দিয়ে বলালেই চল্লিশটা চারশো-তে তুলতে পারবেন? ও-গুড়ে বালি। চল্লিশের এক সেন্ট বেশি নয়। আমিও গিজদার। হুঁ। আপনার ফর্মে লেখা আছে ওজন মোট বিশ কেজি। আপনার যতই কানেকশন্স্ থাকুক, আমার পক্ষে আছে আইন। বুঝলেন?" ঠাক্ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল গিজদার! গুডবাইও বলল না। আমি তো 'হ্যালো' আর 'ইয়েস' ছাড়া কিছুই বলিনি।

ইলুদি বলল, "কে ফোন করল? সেই পাজি লোক? বেশ করেছো, কথা বলনি।"

"আমি বলিনি তো নয়, বলার চান্স দেয়নি।"

"সে যাই হোক। ওর সঙ্গে আর একটাও কথা নয়।"

আবার একটা ফোন এল।

"নিশান, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।" ইলুদি বললেন।

"নমস্কার। নবনীতা বলছি। হ্যাঁ, বলুন? বলুন? অ্যাঁ? বয়েস? হঠাৎ? পাসপোর্টেই তো আছে। ওরা? আমাকে কখনো দেখেনি। কেন বলুন তো?"

"পার্সোনাল কারণে? আমার বয়েসটা আপনিই জানতে চাইছেন, আপনারই

পার্সোনাল কারণে? অ। কী? আমি ইলুদির ছোটো বোনের চেয়ে বয়েসে ঠিক ক'বছরের ছোটো? আমি আপনার কথা ঠিক শুনছি তো? ঠিক? —মাত্র পাঁচ বছরের। কেন বলুনতো? কী বলছেন? —বেঁচে গেলেন? মানে? কী ব্যাপার বলুন তো? কিছুই বুঝতে পারছি না। এর সঙ্গে হাওয়া-ই-হিন্দের যোগ আছে কি? আছে? কী বলুন তো?"

"ওঃ। হাঃ হাঃ হাঃ। সত্যি? না না না ঠিক আছে, ঠিক আছে। থ্যাংকিউ, থ্যাংকিউ। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। কিছু মনে করবেন না মিস্টার পটেল।"

"হ্যা নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। দেব ইলুদিকে? আচ্ছা রাখছি। থ্যাংকিউ।"

ইলুদির মুখের চেহারা অস্থির।

"কী বলছিল নিশান?"

"কিছু না। উনি বলছিলেন, আমার বয়েস কত।"

"কেন? কী দরকার? হঠাৎ? মেয়েদের বয়েস দিয়ে নিশানের কী দরকার?"

"আমিও তো তাই ভাবছি। তা···উনি বললেন···"

"অত হেসো না। আগে বলো কী ব্যাপার।"

"উনি প্রথমেই বললেন, 'আপনাকে মহারাজা এয়ারওয়েজে কেউ দেখেনি তো? আমি বললুম—'না, কিন্তু কেন?' তখন উনি জানতে চাইলেন, অপুর চেয়ে আমি ঠিক কত বছরের ছোটো। মাত্র পাঁচ শুনে খুব নিশ্চিন্ত হলেন।"

"কেন? কেন? কেন?"

"উনি বললেন, আমি এক্ষুনি ওদের জেনারেল ম্যানেজারকে বলেছি, যে আপনি আমার পঁচিশ বছরের পুরনো বন্ধু। তারপরেই দুর্ভাবনা হলো—কে জানে আপনার বয়েস কত? অ্যাট অল পঁচিশ হয়েছে কিনা? অপুর থেকেও ছোটো যখন। তাই জানতে চাইছিলাম!"

"এ—ই, হাঃ হাঃ হাঃ—"

"এই!!"

"নিশানটা যা ছেলেমানুষ রয়ে গেছে না, সত্যি? কে বলবে অত বড় চাকরি করছে।"

"উনিই ঠিক পারবেন, মনে হয়।"

"তা পারবে না? কোকাকোলা কোম্পানী যদি তেমন চাপ আনে, হাওয়া-ই-হিন্দ হাওয়া হয়ে যাবে। হুঃ···"

"দেশে তো উল্টোটাই হলো। কোকাকোলাই তো—"

আধঘণ্টা বাদে আবার ফোন। আমিই ধরি।

"এই যে ডক্টর সেন। নেক্সট স্টেপটা কি পেন্টাগন?"

"তার মানে ?"

"দপ্তরীকে দিয়ে হলো না, এবার দেখছি কোকাকোলাকে দিয়ে চাপ আনা হচ্ছে। ওসব ওপরওলাদের দিয়ে কিছুই হবে না। সাকুল্যে চল্লিশ ডলার আপনার কপালে নাচছে। যে যাই বলুক না কেন, আমি তাদের ঠিক বুঝিয়ে দেব। আইন আমার দিকে। যতই যার দাঁড়ি-খিঁচবার শক্তি থাক না কেন। লাভ হবে না।"

"কোনো আইনেই মালভর্তি বত্রিশ ইঞ্চি চামড়ার সুটকেসের ওজন দু' কেজি হয় না, গিজতাঘিচাং। আমিও দেখে নেব।"

"সে তো বুঝতেই পারছি। আমার বস্‌কে ধরা হয়েছে। এত বড় আস্পর্ধা।"

"এর পরে যে কী করব, তা তো জানেন না।"

"এর পরে আপনি যাই করুন, পেন্টাগনকে দিয়ে বলান, আর হোয়াইট হাউসকে দিয়েই বলান ইউ গেট ওনলি ফর্টি ডলারস। নট এ সেন্ট মোর, সী ?"

১৫

"এত বড়ো কথা ?"

এবার সুহাসদাও আর সইতে পারলেন না।

দাঁড়াও মজা বের করে দিচ্ছি। তুমি কবে যাচ্ছ ? পরশু ? তার দরকার নেই। যাওয়া ক্যানসেল কর ! পরশুদিনই আমাদের বিদেশমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে আসছেন। ইউ এন-য়ে তাঁর রিসেপশন আছে। তোমাকে আমি সেখানে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি নিজেই তাঁকে প্রবলেমটা বলবে। —দয়া করে উনি যদি ওঁদের একটা ফোন করে দেন, দেখি কোন শালা হাওয়া-ই-হিন্দ তোমাকে চল্লিশটি ডলার ঠেকায়, দু-দুখানা মালভর্তি বাক্সো হারিয়ে দিয়ে।"

"একটাকে তো--"

"ওটা পাওয়া নয়। ওটা অ্যাক্সিডেন্ট।"

"তবু—"

"ফরগেট ইট।" কিন্তু সুহাসদা প্রকৃতপক্ষে বড়ই এভার-সৎ ভালোমানুষ বঙ্গসন্তান। শেষ পর্যন্ত "অধর্ম", করতে সাহস নেই। অতএব পাঁচ মিনিট পরেই —"ঠিক আছে। তোমার কথাই থাক। উই শ্যাল ওভারলুক দেয়ার শ্যাবি ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ব্ল্যাক কেস, কিন্তু ব্রাউনটার জন্য বলতেই হবে বিদেশমন্ত্রী মশাইকে। হুঃ হুঃ, দেখি কেমন করে না দেয় বেটারা !"

সুহাসদার কথায় বাধা দেন ইলুদি : "কিন্তু নিশান তো বলেছে, ফলো আপ চালিয়ে যাবে। ল'-এর সাহায্য নিতে হলে তাও নেবে। ও বলছে, ঐ বাক্সোটাকে মাত্র দু' কেজি বলবার মধ্যেই ওদের মরণবাণ লুকিয়ে আছে। ওটা

ইম্‌প্রবেব্‌ল একটা সিলি থিওরি। কেননা, নিশান সব দেখে বলল, ওদের কম্‌প্লেন্ট-ফর্মটাতেই বাক্সোটার বর্ণনায় আছে, ওটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কত। তাতেই ৬/৭ কেজি ওজন অন্তত হয়। ভেতরে কী কী আছে, তারও তালিকা দেওয়া আছে। তারও ওজন ঠিক করে দেওয়া যাবে খুব সহজেই। নিশান বলেছে, হিন্দ-ব্যাটাদের আর কিছুতেই এস্‌কেপ নেই। মিনিমাম চারশ ডলার ফর ঈচ কেস। তার ওপর পেনাল্‌টি ফর দা বদারেশন। মন্ত্রীকে এসবের মধ্যে জড়িয়ে কী হবে? মশা মারতে কামান?"

"সে নিশান যেটা করে করুক না? এখানে যা চলছে তা চলুক না? তা বলে নবীনতা এতবড় সুযোগটা ছাড়বে কেন, ওদের কড়কে দেবার? উনি তো ওর ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্টই পরিচিত—সেই যে লিখেছিল না ওর কুম্ভমেলার গল্পে? ও একবার মিনতি করে মন্ত্রীমশাইকে বললেই, উনি ভড়কে দেবেন নিশ্চয়—"

"যখন ওঁকে চিনতুম, তখন তো মন্ত্রী ছিলেন না। এখন কি চিনবেন? কে জানে!"

"খুব চিনবেন। দাও বুকিং ক্যানসেল করে।"

"গোল বাধালো হাওয়া-ই-হিন্দ। বুকিং ক্যানসেল করা গেল না। তাহলে আরও একহপ্তা বসে থাকতে হবে নেক্সট বেস্পতিবারের ফ্লাইটের জন্যে। রাও আমায় এককালে স্নেহ করতেন বলে 'বকে দাও' বললেই যে আজ তিনি কাউকে বকে দেবেন তার কোনোই ঠিক নেই— তার জন্যে এত কাণ্ড করে থেকে যাব?"

"দেবে, দেবে। কেন দেবে না? শুধু-শুধুই গোলমাল করছো তুমি। অকারণ বজ্জাতি করছে হাওয়া-ই-হিন্দ।"

"অথচ ওরাই আগে কত হেল্‌পফুল ছিল।"

"দোষটা কোম্পানীর তো নয়। দোষটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়াল-এর। বাক্সো তো হারাতেই পারে। তা বলে এই দুর্ব্যবহারটা করবে কেন?"

"চিটিংবাজীই বা চালাবে কেন?"

"না দিয়েছে অ্যাপলজি চেয়ে চিঠি, না দিয়েছে ক্ষতিপূরণ, প্রথম থেকেই ব্যবহারটা যা করছে—সেই মোটেলে পাঠানোর কথাটাও যেন রাওকে বলতে ভুলো না—"

"দেশের নাম ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে—"

"সেটা দিচ্ছে বলে মনে হয় না। এই আচরণটা নিশ্চয় রিজার্ভড ফর দেশওয়ালী ভাইয়োঁ ঔর বেহেনোঁ। ফরেনরদের সঙ্গে ওদের রেড কার্পেটের সম্পর্ক। তখন আলাদা মূর্তি দেখবে ঐ গিজ্জদারেরই।"

"যত ডাব্‌ল স্ট্যান্‌ডার্ড—এ শুধু ইনডিয়ার বৈশিষ্ট্য।"

"এবার মন্ত্রীমশাই এসে বাঁশটি দেবেন, তখন উচিত-শিক্ষা হবে গিজদার বাছাধনের।"

১৬

কিন্তু আমার লজ্জা করল।

ফ্লাইট ক্যানসেল করে একহপ্তা চাকরি কামাই করে, পরের বাড়িতে বসে থেকে কী করছি? নালিশ করে বালিশ পাচ্ছি! দূর! পাগল নাকি! ওই নিশানই যা করেন করুন। কাগজপত্র থাক। আমি চলে যাই। এতক্ষণে ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। ওই জিনিসগুলো যদি কোনোদিনই না থাকত?— মা'র ফিলসফিটা মনে করবার চেষ্টা করি। যাবার আগে গিজদারকে ফোন করে বলে যাব বরং কালো বাক্সোর গল্পটা। ওটা ভেতরে খোঁচাচ্ছে। —ওদেরও জানা দরকার ইউনাইটেড কত দায়িত্বহীন।

"হ্যালো। মিঃ গিজদার?"

"এখনও যাননি? এখনও এখানে? পেন্টাগন কী বলল?"

"আপনি কি জানেন, আমার কালো বাক্সোটা এখন কোথায়?"

"আপনারই কাছে।" —গলায় অসীম ধৈর্য গিজদারের।

"কী উপায়ে এলো, ওটা আমার কাছে? সেটা জানেন কি?"

"আমরাই ডেলিভার করেছি আপনার দরজায়। মনে পড়েছে?"

"কে বলল আপনাকে এই খবরটা. গিজতাঘিচাং?"

"আমার কাছে সমস্ত কাগজপত্র মজুত আছে। বাজে বকবক করবেন না ম্যাডাম। আমরা ব্যস্ত।" খটাং করে রিসিভার নামানোর শব্দ হয়।

সত্যি কথায় কারুর প্রয়োজন নেই। একে বলার আর দরকার নেই, বাক্সোটা কী করে পেয়েছি। সত্য সেলুকাস! কী দায়িত্ববান এই কোম্পানি! দুটো বাক্সোর জন্যেই পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ চাওয়াই এদের যোগ্য উত্তর হবে। বেশ তাই করবো। দেখাক গিজ্‌দার কী তার কাগজপত্র।

ইলুদি, সুহাসদা, কাপাদিয়া, নিশান পটেল, টুনুদা, এককালে তিনি আবার হাওয়া-ই-হিন্দেরই একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন—এখন অবসরপ্রাপ্ত, সবাই বললেন, থেকে যাও। বিদেশমন্ত্রী একবারটি বললে ওরা ঝেড়ে কাশতে বাধ্য হবে। হয় বাক্সো, নয়তো ভালোরকমের উচিত খেসারত অবশ্যই পাবে। কিন্তু আরও থাকতে আমি কিছুতেই রাজী নই। বাক্সো যাকগে চুলোয়। জীবনের যেটুকু অমূল্য সৌরভের জন্যে এই আয়াস, আয়াসেই তার সুরভি সব ধ্বংস করে দিচ্ছে।

কিন্তু এখন আমি আর বাক্সো চুলোয় যাক বললেই বা কী হবে? এটা

রীতিমতো একটা জনগণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ লড়াই মানেই লড়াই। এ এখন চলছে—চলবে, স্টেজে চলে গেছে। অতএব, উঁহু, ছাড়া চলবে না। টুনুদা স্বয়ং ফিলডে নামলেন. "দিল্লীতে তো তুমি নামছই। সোওজা চলে যাও—ট্যুরিজমের মন্ত্রীকে ধরগে। ও'র একটা টেলেক্স তাগাদা এলে বিদেশমন্ত্রীর চেয়েও ভালো ফল হবে। উনিই ওদের খাস মনিব কিনা? আবার ভুলে যেও না যেন, কোন্ মন্ত্রী, তুমি যা ভুলো, খেয়াল রেখো—দিল্লিতে, ট্যুরিজমের মন্ত্রী। এ-ঠ্যালা সামলানো গিজদারের এলেমে কুলোবে না।"

এবার সবাই বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে সোজা হবে। সেটাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।" অমনি কনফারেন্স বসল। সবাই মিলে আমার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বর্গের সিঁড়িও তৈরি করে দিলেন। কোথায় গিয়ে কাকে ধরলে কার কাছে যাওয়া যাবে। কোন্ ধাপে পা রেখে কোন্ বারান্দায় উঠলে শেষ অবধি ট্যুরিজম মন্ত্রীর মস্নদের সামনে পৌঁছুব। খাতা খুলিয়ে ফোন নম্বর ঠিকানার পর ঠিকানা লিখিয়ে দিলেন বন্ধুরা মিলে। এই ব্যাপারে সমবেত টিউশন এতটা নিখুঁত হলো যাতে ডিস্টিংশনে পাশ করা বিষয়ে সন্দেহ রইল না। দিল্লীতে মাত্র একদিনের মধ্যে কাজটি উদ্ধার হয়ে যাবেই। এবং তারপর, হিন্দ সামলাক ঠ্যালা!

১৭

প্লেনে বসে বসে মনে হতে লাগল: "নিয়ে নিলেই হতো চল্লিশ ডলার! শেষ পর্যন্ত তো কিছুই পাব না। আমার যা অলস স্বভাব, একদিন কেন গোটা একমাস দিল্লিতে থাকলেও ঐ সব মহান্ ব্যক্তি, যাঁদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বরে আমার ডায়েরি ও'রা ভরে দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে না। মন্ত্রী-পাকড়ানো আমার কম্মো নয়! ও বাক্সোটা জলেই গেল! দেখি, কলকাতা গিয়ে প্রসূন, কিংবা চাওলাকে ধরব।"

এসব ভাবতে ভাবতে, আর বীভৎস একটা নির্বাক সিনেমা দেখতে দেখতে (পয়সা দিয়ে হেডফোন নিইনি, তাই শুনতে হচ্ছে না) আর অল্প অল্প ঘুমোতে ঘুমোতে হীথ্রো এসে গেল। এখানে চার ঘণ্টা বিশ্রাম।

নেমেই ট্রানজিট লাউনজে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের টেলিফোন করতে লাগলুম। হাওয়া-ই-হিন্দ-এও ফোন করে বাক্সো-হারানোর ডিটেলস্ দিলুম। ওরা বলল হ্যাঁ, নিউইয়র্ক থেকে কয়েকটা টেলেক্স এসেছিল বটে কিন্তু বাক্সোটার নো-ট্রেস।

এবার মন খারাপ করে লাউনজেই ঘুরছি। নানান এয়ারলাইনসের ছোটো ছোটো কাউন্টার আছে এই ট্রানজিট লাউনজে। —হঠাৎ দেখি, হাওয়া-ই-হিন্দয়ের

কাউন্টারে একটি স্বদেশী তরুণ ঠ্যাং টেবিলে তুলে নিজের মনে হ্যাডলি চেজ পড়ছে।

অমনি মনে হলো, যাই, ওকেই বলে দেখি। ওই ইউনাইটেডের মতন এখানেও যদি কোনো আনক্লেমড ব্যাগেজের গুচ্ছ পড়ে থাকে, আর আমার বাদামী ফেদার-ওয়েটটি যদি সেখানেই জমা পড়ে থাকেন? কপাল বলে কথা। কিছুই তো বলা যায় না? ছেলেটি ব্যস্ত নেই যখন, তখন ওকে ধরতে দোষ কী?

সত্যি সত্যি, একটা কাজ পেয়ে সে ছেলেটা দেখি মহা খুশি। সিন্ধি ছেলে। এয়ার ট্রাফিকে কাজ করে। ঠিক যেমন নিউ ইয়র্কে বেদী। এখানে তেমনি এই নিজহানী। কী চমৎকার ছেলে! আমার কমপ্লেন্ট ফরম আর টিকিট, দুটোই ভালো করে নেড়েচেড়ে, ঘেঁটে দেখে, বলল—"ওরা ওই 'বিশ কেজি' ওজনটা পাচ্ছে কোথায়? হীথরো-টু-নিউইয়র্ক তো মাল ওজন করা হয়নি?"

"তবে কেন বলছে, যে—"

"ওটা তো মাত্র একটা সুটকেসের ওজন। কলকাতা থেকে তো একটাই এসেছিল হীথরো অবধি। সেটা বিশ কেজি ছিল। ও হিসেবে দমদম-হীথরো সেকটরের। ওটা ক্যানসেলড। এখান থেকে গেছে দুটো। ওজন না-করা বাক্সো। চল্লিশ কেজি তো ধরাই যায়। একটা যদি আঠারো হয়, অন্যটা তবে বাইশ? তারও দরকার নেই। পীস-কনসেন্টে একটা বাক্সো ত্রিশ কেজি পর্যন্ত ধরে নেওয়া যেতে পারে। ওজন যেহেতু করা হয়নি, আপনি ক্লেম হাজির করবেন ত্রিশ কেজির জন্য। পেয়ে যাবেন। কালো অবশ্য,—যখন লাকিলি পেয়েই গেছেন—আর না-ঘাঁটাই উচিত। তবে যেভাবে পেয়েছেন সেটা মিরাক্ল ছাড়া কিছুই না।"

"ভাই নিজহানী, যদি কালোটার মতো বাদামীটাও পেয়ে যাই? মিরাক্ল তো বারবার ঘটে? আমি ছ'শো ডলার চাই না—বাক্সোটা চাই। ওই বাক্সে আমার খুব জরুরি একটা জিনিস আছে ভাই। একটু খুঁজে দেখবেন? এদিকে ওদিকে? যদি কোথাও পড়ে থাকে, ওই কালোটার মতন? দি গ্রেট ব্রিটিশ এয়ারলাইনসের বাসে চড়ে এয়ারপোর্টে এসেছি, তাদেরই কাউনটারে বাক্সো জমা দিয়েছি। হয়তো তাদেরই কোনো প্লেনে উঠে অন্যত্র চলে গেছে? কিংবা পড়ে আছে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড গুদামে? কিংবা আনক্লেম্‌ড কাউন্টারে?"

"আমি অবসর সময়ে খুঁজে দেখতে পারি পার্সোনালি। আমাকে বরং একটা তালিকা দিয়ে যান জিনিসপত্তরের। আর বাক্সোর বর্ণনা।"

"এই তো জেরক্সকপি আমার কমপ্লেন্ট ফর্মের, এবং টিকিটের। আপনি রেখে দিন না?"

"এই লিস্ট তো অকেজো। ইনডিয়ানদের সব বাক্সোতেই শাড়ি থাকবে, শাল থাকবে, জুতো থাকবে। ডিটেইলস কই? কী-রকম শাড়ি? দু' একটার বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিন। সুমনের সই করা বাটিকের শাড়ি, লাল কাশ্মীরি শালের ড্রেসিং গাউন, বাদামী টেম্পলশাড়ি—যা যা মনে পড়ল বললুম। ছেলেটা অধৈর্য হয়ে বলে—

"এনিথিং স্পেশাল? সামথিং দ্যাট মে আইডেনটিফাই দিস কেস অ্যাজ ইওরস?"

"এনিথিং স্পেশাল?" বুকের মধ্যে ধড়ফড় করতে থাকে—ওকে বলবো? ওকে বললে ক্ষতি নেই। বলেই দি,—যদি এতে পাওয়া যায়?

"ইয়েস। দেয়ার ইজ সামথিং ভেরি স্পেশাল। একটা সিল্কের স্কার্ফে জড়ানো, একটা প্লাস্টিকের থলিতে ভরা আ বাণ্ড অফ লেটার্স ইন বেঙ্গলি। যার জন্যে এত হাহাকার—যার জন্যে এই অসীম চেষ্টা—সেই গোপন কথাটি শেষ পর্যন্ত নিজহানীকে বলে ফেলতে হলো। কেন এই বাক্সোর জন্যে মাথাকোটা। এ জীবনে যা আর ডুপ্লিকেটেড হবে না।

"বাণ্ড অফ বেঙ্গলি লেটার্স···র‍্যাপ্ট ইন আ সিল্ক স্কার্ফ···গুড। ভেরি গুড। এতেই হবে। দেখি, কী পারি।" নিজহানী উপদেশ দেয়—"জীবনে আর এভাবে কদাচ নাম-ঠিকানাবিহীন বাক্সো নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। ওপরে তো বটেই—বাক্সোর ভেতরেও এক প্রস্থ নামঠিকানা লিখে রাখবেন। ওপরেরটা অনেক সময় ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। দেশের ঠিকানা রেখে যান। আমি খুঁজতে চেষ্টা করব। ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম। হয় বাক্সো, নয়তো ত্রিশ কেজির ক্ষতি-পূরণ, এ আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।"

১৮

কেবল চিঠির অংশটা বাদ দিয়ে বিশিষ্ট বস্তুটি কী? না "এ বুক অফ বেঙ্গলি পোয়েমস্" বলে গল্পটা রুনুদিকে বললুম।

রুনুদি শুনে বলল—"সত্যি সত্যি তোর কপালেই ঘটেও বাপু! তা দুটোই হারিয়েছিস, এটা তো সত্যি নয়? ফেরত পেয়েছিস তো বাবা একটা! অবশ্য পার্থরটা না পেয়ে, নিজেরটা পেলেই ভালো হতো, কি বল? তা যেটা কিনলি হাওয়া-ই-হিন্দের পয়সায়, সেইটে কেমন দেখি?"

ইতিমধ্যে বেশ খানিকক্ষণ হলো দাদামণিও এসে পড়েছেন, রুনুদিকে নিয়ে যেতে।

নতুন বাক্সো দেখে রুনুদি বলল,—"ওমা। এই? এর চেয়ে একটু ভালো দেখে কিনতে পারলি না? পরের পয়সাতেও কিপটেমি? স্বভাব যাবে

কোথায় !”

দাদামণি বললেন, “এবার থেকে যেখানেই যাবি, ‘ক্যারি-অন-ফ্লাইট’ ব্যাগ নিয়ে যাবি। আর তাতে কেবল নাইলন কাপড়।”

রুনুদি ফুটুনি কাটে, “আর ভালো কাপড়-চোপড় তো রইলও না বিশেষ। কুম্ভে কতগুলো ভালো কাপড় জলে চুবিয়ে শেষ করে আনলি, আর এখানে তো বাকীগুলো জন্মের শোধ ঘুচিয়েই এসেছিস।”

আমিই এবার পজিটিভ একটা স্টেটমেন্ট করি। “তবু লাভ এই যে শিক্ষাটা হলো !”

দাদামণি এক হুংকারে সেটা উড়িয়ে দেন। “আর শিক্ষা। যাই হোক, অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলো তাড়াতাড়ি। দেরিটা যেন করো না। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা তো করলে না দিল্লিতে। করলেই ঠিক হতো। একটা চিঠি অন্তত দিয়ে দাও। তাইতেই হয়তো কাজ বেশি হবে।”

“দেখি।”

দাদামণি অধৈর্য হয়ে পড়েন। “দেখি দেখি করে দেরি করিসনি খুকু—অ্যাপ্লিকেশনটা করে দে। ঐ নিজহানী যেমনটি বলেছে, তেমনি করে।”

“করব !”

দাদামণি যাবার সময়ে বারবার তাড়া দিয়ে গেলেন—“করব করব নয়। এক্ষুনি অ্যাপ্লাই করে ফেলো।”

ঠোঁট উল্টে মামণি বললেন—“যা গেঁতো, ও আর করেছে অ্যাপ্লিকেশন। যদিও বা লেখে, সেটা ওর টেবিলেই থাকবে। ডাকে আর যাবে না।”

১৯

কলকাতায় এলে যা হয়। কাজকর্মে, রোগে-রাগে অনুরাগে বাক্সোটা উদ্ধারের চেষ্টা আর হলো না। মনে মনে ধরে নিলুম—যা গেছে তা গেছেই। চিঠির চেয়ে বড় জিনিসই তো চলে গেছে। আর চিঠির জন্যে কেঁদে কী হবে। এই উল্টোপাল্টা দুঃখ-করা কাঁদুনি-গাওয়া এবং সহানুভূতি না-পাওয়াতেই গল্প শেষ হতো, যদি-না হঠাৎ একটা টেলিফোন আসতো হাওয়া-ই-হিন্দ থেকে। ফেরার পর মাস তিনেক হয়ে গেছে তখন।

“ডক্টর সেন ? একটা মেসেজ এসেছে আপনার জন্য। মিঃ নিজহানীর কাছ থেকে।”

“কার কাছ থেকে ?”

“মিঃ নিজহানী। লন্ডনের।”

"তিনি কে ?"

"হীথরোতে এয়ার ট্রাফিকে কাজ করেন—"

"ও হো, হ্যাঁ হ্যাঁ—বলুন, কী মেসেজ ?"

"আপনার বাক্সোটা পাওয়া গেছে ।"

"অ্যাঁ !"

"উনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, দু' তিনদিনের মধ্যেই পাবেন ।"

"আাঁ ।"

"এলে আমরা আবার খবর দেব ।"

"ধন্যবাদ । ধন্যবাদ ।"

"এ তো কর্তব্যমাত্র ।"

দু-দিনের মধ্যেই বাক্সো এসে গেল । শীলমোহর করা অবস্থায় । আমাকে দমদমে গিয়ে কাস্টমস ক্লিয়ার করিয়ে আনতে হলো । ইনট্যাক্ট আছে । সব আছে । সেগুলোও কিছু এদিক-ওদিক হয়নি । নিজহানীর মুখখানা কিছুতেই মনে পড়ল না । কেমন দেখতে ছিল ছেলেটাকে ? এ-বাক্সো কোথায় পেল সে ? কী করে উদ্ধার করল ?

সেদিনই একটা কাজে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দক্ষিণে রওনা হচ্ছি । চিঠিপত্রের বাক্সো খালি করে ব্যাগে ভরে নিলুম । ট্রেনে উঠে দেখি, আরে দাদামণি যে ! দাদামণিও যাচ্ছেন সঙ্গে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত । চিঠিপত্রগুলো খুলতে খুলতে দেখি মহারাজার দুটো চিঠি এসেছে । একটি হাওয়া-ই-হিন্দ হীথরো থেকে, আরেকটি হাওয়া-ই-হিন্দ নিউ ইয়র্ক । দাদামণি বললেন—"হীথরোটাই আগে খোলো ।" মোটাসোটা মোড়ক । নিজহানীর নিজহাতে লেখা লম্বা চিঠি । দাদামণি বললেন, "জোরে জোরে পড়, শুনি ।"

"ম্যাডাম, আপনি হয়ত আমাকে চিনতে পারবেন না । কিন্তু আমি আপনার বাক্সের কথা ভুলিনি । ঐ দু' কেজির ব্যাপারটা মনে হলেই ভয়ানক রাগ ও লজ্জা হতো । এরকম লোকদের জন্যেই কোম্পানির নিন্দে হয় । তাই হাতে সময় থাকলেই আমি গ্রেট ব্রিটিশের এবং হাওয়া-ই-হিন্দের লস্ট প্রপার্টি আর আনক্লেম্‌ড ব্যাগেজ-এর ওয়্যারহাউসে ঘুরে আসতাম । একদিন দেখি একটা বাদামী বিলিতি কেস আপনার সেই বর্ণনামতো, চারটে দেশী ক্লাম্পস আঁটা তাতে । নাম লেখা আছে মিসেস কাপুর । কিন্তু তিনি ওটা রিফিউজ করেছেন । এসেছে টোকিও থেকে । আমি তখন আপনার কাগজপত্তর নিয়ে গিয়ে ওটা খোলানোর ব্যবস্থা করলাম । খুলে দেখি হ্যাঁ, এই তো রয়েছে আপনার", (একটু কেসে নিয়ে বলি) ঃ "বুক অব্‌ বেঙ্গলি পোয়েম্‌স্‌ র‍্যাপ্ট ইন আ সিল্ক স্কার্ফ—" [খুব

একটা মিথ্যে বলাও হয় না। যে-চিঠির গুচ্ছটি হারাতে বসেছিলুম, তা কি কবিতার চেয়ে আলাদা ?] “ব্যাস, আর সন্দেহ রইল না। টেলেক্সটা পাঠিয়ে দিলাম। আপনি খুবই ভাগ্যবতী। আমিও। যে আপনাকে সত্যিই সাহায্য করতে পারলাম। আপনি কখনও জাপান ও কানাডা গেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আপনার বাক্সোটি ভ্যাঙ্কুভার, টোকিও দুই-ই ঘুরে এসেছে। আশাকরি ঠিকমতো পাবেন সব কিছু। ইতিমধ্যে কি টাকাটাও পেয়ে গেছেন ? পেলেও ক্ষতি নেই। স্যরি ফর দ্য ট্রাবল। প্রীতি নমস্কার নেবেন। আপনার, বিশ্বস্ত, নিজহানী।”

দাদামণিকে চিঠিটা পড়ে শোনাতে হলো পুরোটা। ভাগ্যিস ওঁর চশমা সুটকেসে। পড়তে চাইলেই তো হয়ে গিয়েছিল! দাদামণি বললেন—“জামাই করবার মতন যুবক। কিন্তু তোমার কন্যারা এখনও জামাই পাবার যোগ্য হয়নি এই যা দুঃখ। কী ? কবিতার খাতাটা হারিয়েছিল বুঝি ? তাই অত আপশোস ? যাক, এবার অন্যটা পড়ো।”

অন্যটা এসেছে আইখমানের কাছ থেকে। যিনি বলেছিলেন আমি কিছু জানি না, গিজদারকে বলো। খুবই বিনীত চিঠি। খানদানি কাগজে, আই. বি. এম. টাইপরাইটারে, ছাপার হরফে।

“প্রিয় ডক্টর সেন,

আমরা খুবই দুঃখিত যে আমরা অনেক চেষ্টা করেও আপনার এত নম্বর (বাদামী) এবং এত নম্বর (কালো) সুটকেস দুটির কোনোটিকেই ট্রেস করতে পারছি না। এ দুটির জন্য যথাযোগ্য রিজনেবল ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়ই আমরা দেবো। এ বিষয়ে দিল্লিতে অমুক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি। আপনার অসুবিধা সৃষ্টির জন্য হাওয়া-ই-হিন্দ যারপরনাই দুঃখিত। আশাকরি অবিলম্বেই সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। ইতি। আন্তরিকভাবেই আপনার, ইত্যাদি।”

বুঝলুম একগুঁয়ে নিশান পটেল সত্যিই হাওয়ার পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। পেন্টাগনে কি বিদেশমন্ত্রকে যেতে হয়নি, বিশুদ্ধ কোকাকোলার বোতলই যথেষ্ট হয়েছে। কলকাতায় কে না জানে সোডার বোতলের মহিমা ? ইন্দুদির জয় হয়েছে।

দাদামণি বললেন—“দাও এবার অ্যাপ্লিকেশনটা ঠুকে। ওদের ডান হাত কী করছে বাঁ হাত জানতে পারে না। হীথরো কী করছে জে এফ. কে. যেমন জানে না তেমনি দমদমে কী এলো, তা পালামে জানবে না। দাও, দু-খানার জন্যে ত্রিশ-ত্রিশ ষাট কেজি, ইনটু কুঁড়ি ডলার, ইজ ইকুয়ালটু বারোশো ডলার, এক্ষুনি অ্যাপ্লাই করে দাও। দেরি নয়। শালারা পাকা চোর। বাটপাড়ি

করলে ক্ষতি নেই।”

বাটপাড়ি করবার বদ্ ইচ্ছেটা বোধহয় মাথায় ঢুকেছিল। নইলে ভগবান শাস্তি দিলেন কেন?

ব্যাঙ্গালোরে নেমেই ব্যাগসুদ্ধ চুরি হয়ে গেল। সে দুখানা চিঠিও গেল, ফেরার টিকিটও গেল, সভার পেপারখানাও গেল। ব্যাগটা আর উদ্ধার হয়নি। কে দেবে? ব্যাঙ্গালোরে তো কোনো নিজহানী নেই, নিশান পটেলও নেই। এমনকি দাদামণিও না।

রুনুদি যখন ব্যাঙ্গালোরের গল্পটা শুনবে, কী বলবে কে জানে? আর মামণিই বা বলবেন কী?

টাংরী কাবাব

"আরে, পরীক্ষা যে দিলি, তা কী কী দেখে যাত্রা করেছিলি?"—চুরুট ধরিয়ে কুমারকাকা বলেন। বি. এ. পরীক্ষা শেষ হয়েছে, মনে সীমাহীন শান্তি। না, ভুল হলো। ঠিক সীমাহীন নয়। তিনমাসের মতো সুগভীর শান্তি। পরেরটা পরে দেখা যাবে। তার মধ্যে এ কী প্রশ্ন? রোববার সকালে হঠাৎ যেদিন কুমারকাকু এসে পড়েন সেদিনটা এক্সট্রা-স্পেশাল হয়ে যায়। কুমারকাকু সত্যি সত্যি রাজার ছেলে। এখনও ওঁদের দু'চারটে রাজপ্রাসাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উত্তরবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে, এ-পাহাড়ে, সে-পাহাড়ে, এ-তীর্থে, সে-তীর্থে। কুমারকাকুর বাবা-ঠাকুর্দার সবাই রাজত্বই করতেন। কুমারকাকু ঠিক সেটা পারেননি, ব্যারিস্টারি পাশ করে একের পর এক নানারকমের চাকরি করেছেন, স্বদেশী করে জেলেও গেছেন, স্বদেশী ব্যবসা করে ডুবেও গেছেন, এখন একটা খুব ভালো মনের মতন চাকরি করেন। কাজটা যে ঠিক কী, আমি অতো জানি না, দিনরাত দিল্লি-টোকিও ঘুরে বেড়ানো, আর জাপানীদের সঙ্গে দহরম-মহরমটাই দেখতে পাই। ফিরে এসে নানারকমের গপ্পো বলেন। আধা-সাহেব, আধা-জাপানী, আধা-বাঙাল, আর পুরোটা মিলে অখণ্ড রাজপুত্তুর এই কুমারকাকা ঢুকলেই বাড়ির রং পালটে যায়। মা পর্যন্ত হাতের সব কাজ ফেলে রেখে এঘরে এসে বসেন গল্প শুনতে। কুমারকাকার কথাবার্তার লেভেলটাই আলাদা।

"কী কী দেখে যাত্রা করেছিলি বল্, আমি বলে দিচ্ছি। কত পার্সেন্ট মার্কস্ পাবি। সবটা ডিপেনড করছে ঐ যাত্রা করার ওপরে।"

"কী আবার? ঐ বাবা-মাকে প্রণাম, ঠাকুরঘরে প্রণাম, দইয়ের ফোঁটা, রুমালের কোণায় পেসাদী ফুল—ব্যস্।"

"ব্যস?"

"ব্যস। আর মাথার ওপরে মা ইষ্টমন্ত্র জপ করে দেন।"

"যা বাবা। মাত্র এই? তাহলে পারলুম না। এ তোমার মায়ের ইষ্টমন্ত্র-জপের হাতযশ আর তোমার লাক। আমাদের সময়ে ছিল মোট উনিশটা শুভ জিনিস দেখে বেরুনো নিয়ম। আর কুড়ি নম্বর হচ্ছে পূজ্যপাদ প্রণাম। প্রত্যেকটাতে পাঁচ নম্বর। সবগুলো করতে পারলে একশোয়-একশো। কেউ মারতে পারবে না। আমরা কখনো যে একশোয়-একশো পাইনি তার কারণ কখনোই বিশটা একসঙ্গে হয়নি। তবে অনেকগুলোই হতো।"

প্রায়ই বাবা-মা জমিদারিতে গ্রামে থাকতেন, আমরা শহরে ইশ্কুলে পড়তাম।

পরীক্ষার সময়ে মা রওনা করিয়ে দিতে পারতেন না, তাই আমাদের বাড়িতে যিনি গার্ডিয়ান টিউটর থাকতেন তিনিই এই ভারটা নিতেন। আমরা দুই ভাই পরীক্ষা দিতে বেরুবার আগে সারা বাড়িতে কেন পুরো পাড়া জুড়ে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার শুরু হয়ে যেতো। আমাদের গার্ডিয়ান টিউটর ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, জানকী-বল্লভ চক্রবর্তী, ভয়ানক কড়া শাস্ত্রজ্ঞ। ত্রিবেদী ছিলেন তিনি। শাস্ত্রের বিধান প্রত্যেকটি তিনি পই-পই করে মেনে চলতেন। নিজের জীবনেও যেমন মানতেন, তেমনি আমাদেরও জোর করে মানাতেন। যেদিনই আমরা পরীক্ষা দিতে রওনা হতাম, ঠিক তার আগেই একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল লেগে যেতো বাড়িতে। মাস্টারমশাই একটি দীর্ঘ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন, আর বাড়িসুদ্ধু সবাই, গয়লা, গোমস্তা, বাবুর্চি-বামুন, দারোয়ান, মালী, সহিস, মাহুত প্রত্যেকেই অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াত। তারপর ক্রমশ রওনা হবার ব্যবস্থা একে একে কমপ্লিট হতো—প্রস্তুতি এবং রিহার্সাল শেষ হলে, তবে সদর খুলত। আমরা দুই ভাই ভাত খেয়ে চুল আঁচড়ে জুতোমোজা পরে পেন্সিল কলম রুলার নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দোরগোড়ায় প্রথম পা-টি ফেলতাম। মাস্টারমশাই বলতেন —"রামপ্রসাদ!" রামপ্রসাদ আমাদের রাখাল এবং গোরুপালক। সে টানতে টানতে নিয়ে আসত একটি দুগ্ধবতী গোরু—এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হতো বাছুরটাকে। সকাল থেকে তাকে দুধ খেতে দেওয়া হয়নি। ছাড়া মাত্র সে দৌড়ে গিয়ে বাঁটে মুখটি লাগাতো। এই দৃশ্যটাই শুভ। অমনি জানকীবল্লভ চক্রবর্তী নিশ্চিন্ত হয়ে বলতেন—"ওয়ান। ধেনুর্বৎস-প্রযুক্তা। একসেলেন্ট। এইবার দুই। রামপ্রসাদ!" রামপ্রসাদ ততক্ষণে গোরু-বাছুর সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গোরু কিঞ্চিৎ গোবরময় করে ফেলেছে সদরের পাশটা। সেই নিয়ে দরওয়ান রামপ্রসাদকে বকছে—এটা তো রিহার্সালে ছিল না। বকুনির মধ্যেই রামপ্রসাদকে ফিরতে হলো ষাঁড় সঙ্গে নিয়ে। কখনও মাঠের হালচাষের বলদ, কখনও-বা শিং না-ওঠা এঁড়ে বাছুর—কখনও রাস্তা থেকে ধর্মের ষাঁড় বিশ্বনাথকে —যখন যেটা হাতের কাছে পেতো, ধরে এনে, 'বৃষ' বলে চালিয়ে দিতো সে। পণ্ডিতমশাই তাতেই তুষ্ট। "টু। বৃষ। ফাইন। চৈতরাম। হাথী লাও। থ্রি।" চৈতরাম মাহুত, সে রেডিই ছিল লিলিকে নিয়ে। ঠাকুর্দার লিলি হচ্ছে ঠাকুর্দার প্রিয় হাতি। লিলি এসে শুঁড় তুলে সবাইকে নমস্কার করত। আমরা শুঁড়ে টাকা গুজে দিতাম। সেটা নিয়ে সে আমাদের আশীর্বাদ করত। তারপর টাকাটা সোজা চৈতরামকে দিয়ে দিত। স্যার বলতেন—"থ্রি। গজ। ফিনিশড। এবার তুরগা। লক্ষ্মীচন্দ! লক্ষ্মীচন্দ্র সহিস।" সেও ওপাশে রেডি থাকত। চৈতরাম লিলিকে নিয়ে সরে যাওয়ামাত্র খট্‌খট্ শব্দে ডার্কলেডিকে নিয়ে চলে আসত সামনে। বাবা তাঁর প্রিয় ডার্কলেডিতে চড়ে বেড়াতেও যেতেন, শিকারেও বেরুতেন। গ্রামে-গঞ্জে ট্রাভেলও করতেন। তখন নৌকো, ঘোড়া আর পাল্কিই

ছিল আমাদের প্রধান ট্রান্সপোর্ট। লোক দেখতেই থাকত মোটর। রাস্তা কৈ? ঘোড়াটিকে দেখা হয়ে গেলেই, স্যার এক নিশ্বাসে বলতেন, "ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা-বৃষগজতুরগা।" আমরা ডার্কলেডির গলায় হাত বুলিয়ে দিতাম। স্যার বলতেন, "'বৃষগজতুরগা' হয়ে গেল। এবার নাম্বার ফাইভ। দক্ষিণাবর্ত বহ্নি। ওরে ডানদিকে একটা প্রদীপ জ্বেলেছিস?" এটা প্রত্যেকবার একরকম হতো না। কোনোবার উঁচু পিতলের দীপদানে ১০৮ শিখা জ্বালা হতো—কোনোবার বা মালী শুকনো পাতা দিয়ে বাগানেই আমাদের ডানদিকে একটা ছোট বনফায়ার জ্বালাত। স্যার বলতেন—"দক্ষিণাবর্ত বহ্নি? হয়েছে। ও. কে.। এখন নাম্বার সিক্স। দিব্য স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভা—ওরে, মাকে একটু ডেকে আন। জলভরা কলসী দিয়ে দিবি হাতে।" আমাদের সংসার স্ত্রী-হীন সংসার ছিল। কর্মচারী সকলেই পুরুষ। কেবল এই গার্ডিয়ান টিউটরের বর্ষীয়সী স্ত্রী, আর তাঁর বুড়ি ঝি একদিকে থাকতেন। তাঁর ছেলেরা বড় বড়, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মহিলা মোটেই অসুন্দরী নন। কিন্তু দিব্যস্ত্রী বলতে কিশোরের চোখে যা ভেসে আসে, স্যারের গিন্নির সঙ্গে সেটা তো মেলে না? আমার তখন বয়স অল্প, কথাটা শুনে আমি বলেই ফেললাম—"কিন্তু স্যার, জ্যাঠাইমাকে···দিব্যস্ত্রী?" স্যারের নির্দেশে জ্যাঠাইমা যখন জরির দাঁত দেওয়া লালপাড় কড়িয়াল শাড়ি, নাকে মস্ত ফাঁদি নথ, এক-গা গহনা, কপালে মস্ত সিঁদুর টিপটি পরে লাজুক হেসে সদরে এসে দাঁড়ালেন কাঁখে সোনার মতো ঝকঝকে পেতলের কলসিটি নিয়ে, তখন তাকে ঠিক মা দুর্গার মতন দেখাচ্ছিল—এবং 'দিব্যস্ত্রী' নন বলে মোটেই মনে হচ্ছিল না। তবু স্যার একটু ফিসফিস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাদের কানে কানে বললেন—"এখন এমন দেখছিস তাই,—বয়েসকালে এই জ্যাঠাইমারই ছিল রে—দিব্যরূপই ছিল! সিক্স, সেভেন, দিব্যস্ত্রী, পূর্ণকুম্ভা। কমপ্লিট। এবারে নাম্বার এইট। দ্বিজ।" নিজের পা দুটি জোড়া করে, পৈতেটি ছুঁয়ে দাঁড়াতেন। দ্বিজদর্শন শেষ। "আইটেম নাইন। নৃপ। বড়কর্তার ছবি।" অমনি জম্পৎ রাই, আমাদের বৃদ্ধ কর্মচারী, আমার ঠাকুর্দা মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর মস্ত ছবিটা দুহাতে জাপ্টে এনে ধরতো চোখের সামনে। "ফাইন। আইটেম নাইন নিয়ে যাও—নৃপদর্শন শেষ। এবারে আইটেম টেন—গণিকা—ও কে.—টেন কমপ্লিট, গণিকা হলো, এবার পুষ্পমালা—মালী!" দাদা এতক্ষণে কথা বলে—"কৈ স্যার? টেন কোথায় কমপ্লিট? গণিকা তো হলো না? গণিকা দেখতে হবে না স্যার?" আমি অবাক হয়ে বললুম—"কিন্তু, গণিকারা তো খারাপ স্যার? খারাপ জিনিস দেখতে আছে?" স্যার একটু মুশকিলে পড়লেন। দাড়িহীন গাল চুলকে নিয়ে প্রথমে দাদাকে উত্তর দিলেন—

"থাক, আইমেটম টেন দেখে আর কাজ নেই। ওটা কেবল শ্রদ্ধাই চালিয়ে

নাও।" তারপর আমাকে জ্ঞান দিলেন—"ঠিকই বলেছ তুমি। এই বয়েসে গণিকা-টনিকা না দেখাই ভালো। যদিও গণিকাগৃহের দোরগোড়ার মাটি নিয়ে এসে পুজোর প্রতিমা তৈরি হয়। যাত্রারম্ভেও গণিকার মুখদর্শনে পুণ্য। তবু, সব কিছুরই যথাযথ সময় আছে—এখন ওটা শ্রুত্বার ওপর দিয়েই চলুক। নেক্সট—পুষ্পমালা। মালী! পুষ্পমালা, পতাকা কৈ? ইলেভেন, টুয়েলভ?" মালী অমনি গাঁদাফুলের মালা নিয়ে, আর হরনাথ বাগ্‌চি উল্টোদিক থেকে রঙিন ফ্ল্যাগের তৈরি মালা হাতে করে হাজির— আগেরদিন রাত্তিরে বসে বসে গঁদ, কাঁচি, রঙিন কাগজ আর সুতো নিয়ে গেঁথেছেন।—"ব্যস্ ব্যস্—পুষ্পমালা আর পতাকা।—বাবুর্চি?" বাঁয়ে বাবুর্চি অমনি একটা ডেকচি হাতে করে এসে দাঁড়ায়, তাতে টাটকা পাঁঠার মাংস, কাঁচারক্ত মাখা, দেখলেই গা গুলোয়। সদ্য ভাত খেয়েছি! "থার্টিন—সদ্য মাংস। বাঃ। ঘি, ঘি কই? ঘৃতং বা? ফোর্টিন? ঠাকুর! ঘি নিয়ে এসো।" বলতে না বলতে ডাইনে বামুনঠাকুর এসে দাঁড়ায়, হাতে ঘিয়ের পাথরবাটি। গরম ঘিয়ের গন্ধে সদরটা ম ম করে।…। কাঁচা-মাংসের স্মৃতিটা মুছে যায়। "—দধি, মধু, কাঞ্চনং, শুক্লধান্যং—কই গো?" পাঁচটা জিনিস রুপোর থালায় যত্ন করে সাজিয়ে ধান, দই, মধু, রুপোর টাকা সোনার গিনি সমেত সামনে এনে ধরে ঝি—একনজর সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে আমরা স্যারকে, আর স্যারের স্ত্রীকে প্রণাম করি। স্যারের স্ত্রী দইয়ের ফোঁটা পরিয়ে দেন কপালে।—"টোয়েন্টি আইটেমস কমপ্লিট—যাত্রা শুরু। এইবার—ড্রাইভার।" হাঁক পাড়েন স্যার। সদর থেকে হাতী-ঘোড়া সব কখন সরে গেছে—ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে আসে। টিউটর বিড়বিড় করেন, আর ভুরু কুঁচকে আঙুলের কড় গোনেন—"দেখি, কটা হলো—

ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা
দক্ষিণাবর্ত বহ্নি দিব্য-স্ত্রী পূর্ণকুম্ভা
দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমালাপতাকা
সদ্য মাংস ঘৃতং বা দধিমধুরজতং
কাঞ্চনং শুক্লধান্যং দৃষ্টা শ্রুত্বা পঠিত্বা
ফলমিহ মানবে গন্তুকাম। পূজ্যপদে প্রণাম।

যাত্রা সুফলা হোক। শিবমস্তু। জয়মস্তু।" বলতে বলতেই উঠে বসতেন গাড়িতে। গাড়ি এবার রওনা হতো আমাদের নিয়ে ইশ্‌কুলের দিকে। পিছনে চেয়ে দেখতে পেতাম বাড়ির সামনে ভিড়। বিশাল এক বিচিত্র শোভাযাত্রা গোরু বাছুর ষাঁড় হাতী ঘোড়া—কী নেই। তার মধ্যে স্যারের স্ত্রী ও কলসীভরা জল, আগুন, ঠাকুর্দার ছবি নিয়ে জম্পৎ রাই, মালা নিয়ে মালী, পতাকা নিয়ে হরনাথবাবু, কাঁচামাংসের ডেকচি নিয়ে খুদাবক্স বাবুর্চি, ঘিয়ের বাটি নিয়ে শংকর ঠাকুর, দধি মধু রজত কাঞ্চন ধান্যসমেত থালা নিয়ে সুভদ্রা ঝি। সবাই

মিলে আমাদের আপ্রাণ শুভকামনা করছে। কেবল গণিকাটিকে দেখা যেত না। অন্যলোকেরা দেখতে পেত না, কিন্তু সে থাকতো আমাদের মনে মনে একটা অচেনা বিচিত্র ভয়মাখানো প্রবল কৌতূহল হয়ে।—অবিশ্যি না দেখলেও তো ক্ষতি নেই। দৃষ্টা না হোক, শ্রুত্বা ; সেও না হোক, পঠিত্বা হলেও সমান পুণ্য ! আমাদের শাস্ত্রকাররা খুবই কনসিডারেট লোক ছিলেন। কী বলিস ? আর স্যার ছিলেন আবার নিদারুণ শাস্ত্রজ্ঞ।" — চুরুটে লম্বা টান দিয়ে কুমারকাকা বলেন, "তাঁর ছাত্র হলে কি হবে, আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানটা আবার একেবারেই ঠিকমতন হয়নি। এই হিন্দু শাস্ত্রপাঠ নিয়েই আমার একবার দারুণ ঝামেলা হয়েছিল। তখন কোরিয়ান ওয়ার চলছে, আমি জাকার্তায়। একটা কাগজে পলিটিকাল করেসপন্ডেন্ট, কোরিয়া থেকে বম্বে পর্যন্ত আমার এরিয়া। (ওই সময়ই তো এই জাপানী যোগাযোগটা হলো)। একবার দুটো বক্তৃতা দিতে বললে আমাকে জাকার্তায়, একটা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। প্রথম বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু কোরিয়ার যুদ্ধ। কোনোই অসুবিধা হলো না বলতে। আমারই তো সাবজেক্ট। দ্বিতীয় দিন বক্তৃতা দিতে বললে, 'অনু মন্দোদরী'। আমি তো ট্যারা। মন্দোদরীর উপরে বক্তৃতা ? কী বলব ? ওরা বললে—"আসলে এটা একটা ইনডিয়া-ইনডোনেশিয়া কালচারাল এক্সচেঞ্জের প্রশ্ন।"—মন্দোদরীর মন্দির আছে অনেক, ইন্দোনেশিয়ায়। মন্দোদরী সেখানে মহাসতী ; সতীত্বের প্রতীক। আমি বেচারী ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমার কেবলই মনে পড়ে যেতে লাগল, ছেলেবেলায়, দেশে, সাহেবালির কাছে শোনা মন্দোদরীর গপ্পোটা। সেটা বললে তো চলবে না !

সাহেবালি ছিল পাঠান বডিগার্ড, আমার বাবার। বাবাকে ছেলেবেলা থেকেই সে সামলাচ্ছে। ঠাকুর্দার পলিসি ছিল—"পয়লা দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারি।" প্রথমেই চেহারাটা কেমন, তার ওপর ঠাকুর্দা প্রচুর গুরুত্ব দিতেন। ফলে বাড়ির কর্মচারীরা সবাই কাজের হোক না হোক, দেখতে প্রত্যেকেই খুব টুকটুকে ফুটফুটে ছিল। সাহেবালি খান সবচেয়ে ভালো দেখতে। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, জোব্বাজাব্বা সব পেশোয়ারী, মাথায় লাল কুল্লা পাগড়ি, আরো এতখানি উঁচু হয়ে আছে—কোমরে ইয়াবড়া তরোয়াল ঝুলছে (ভারী কী!) জরির কোমরবন্দ থেকে, গোলাপী রঙের চামড়া, নীল চোখ, আমাদের সাহেবালিকে দারুণ পছন্দ ছিল। সারাক্ষণ ওর পিছু-পিছুই ঘুরঘুর করি। সন্ধ্যাবেলায় রোজ কর্মচারীদের গল্পের আসর বসে। কোনোদিন জম্পৎ রাই গল্প বলে, কোনোদিন হরনাথ বাগচি বলেন, কোনোদিন ঠুনোবুড়ো। এই ঠুনোবুড়োর যে বাড়িতে কী কাজ ছিল, কেন এবং কবে যে সে এসেছিল, তা আমরা জানতাম না। তখন সে থুত্থুরে বৃদ্ধ। তিনমাথা এক করে বসে থাকে, আর খুব ভালো ভালো গল্প বলে। আমরা ভাবতাম গল্প বলাই ঠুনোবুড়োর চাকরি। তার পৈতৃক নামও

কেউ জানতো না। কিন্তু এক-একদিন শংকর ঠাকুর, কি ড্রাইভার হরিরামও এসে উড়িশা, বিহারের গল্প বলত আমাদের। সাহেবালি একদিন বললে—আজ সে গল্প বলবে। সাহেবালির ধারণা হয়েছে, আমরা বড় বেশি সাহেবি হয়ে যাচ্ছি, নিজের দেশের পুরাণ-টুরাণ শেখা হচ্ছে না। তাই সেটা সে নিজেই শেখাবে। —"রামায়ণের গল্প জানো ?" আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। জানি, আবার জানিও না। রামসীতার গল্পটা কে না জানে ? আমরাও ওটা মোটামুটি জানি, তবে ওর যে বহু ডিটেলস আছে, যা আমরা জানি না, সে খবরও জানি ! সাহেবালি আমাদের অনিশ্চয়তা দেখে খুব বিরক্ত হলো ; এবং বলল—"আপনা দেশঘরকা কহানিয়াঁ সবসে পহেলে সুন্‌না চাহিয়ে। এক বহুৎ বাঢ়িয়া রাজা থা, উসকা নাম থা রাবণা। রাবণা রাজানে সুনা রামকো এক খুবসুরৎ জরু হ্যায়—বাস্, উসনে জলদি গিয়া, ঔর রামকো জরুকো উঠাকে আপনা প্যালেসমে লায়া। লেকিন রামা ভি বাঢ়িয়া ফাইটার থা। উসকা মিলিটারি উলিটারি কুছভি নহী থা উস্‌নে ক্যা কিয়া ? জঙ্গল কা ভল্লু-উল্লু বান্দর-উন্দর সব একসাথ করকে অ্যায়সা ট্রেনিং দে দিয়া, বাস ওহী লে কর রাবণাকো অ্যাটাক কিয়া। মার বি ডালা, খতম। রাবণাকো এক বেগম থী, মান্দোদুয়ারী। উসনে রামাকো গোড় লাগ্ গিয়া, ঔর কহা, রামা, হাম রাবণাকো প্যার নহী করতী, হাম তুমসে প্যার করতী হুঁ, তুম হামকো শাদি কর লো। রামানে তো বাৎ সুনাই নেহী, সীতা কো উঠা লেকর ঘর ভাগ্ রহা।—তব্ মান্দোদুয়ারী নে উসকা পিছে পড়া ঔর ফিরসে কহা ঃ রামা, তুম হামকো শাদী কর লো। তব রামানে কহা—মান্দোদুয়ারী, মেরী প্যারী, মেরে পাস তো এক জরু হ্যায়। হাম তুমকো শাদি নহী কর সক্‌তা —লেকিন—হাঁ, নিকাহ্ কর সকেঙ্গে।"—রাম মন্দোদরীকে নিকাহ্ করেছিল। কিনা, শেষটা আর সাহেবালি বলতে পারেনি। এতদূর গল্প শুনেই হরনাথ বাগচি ক্ষেপে উঠে লাঠি তুলে ওকে মারতে গেলেন। ফলে গল্পের আসর ভেঙে গেল। ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় লেকচারটাও আমার তাই স্থগিতই রইল। চিরদিনের জন্য।"

মা ইতিমধ্যে গরম গরম কাটলেট নিয়ে এলেন, তার গা থেকে মুরগীর ঠ্যাং আছে খোঁচা হয়ে, দেখেই কুমারকাকা বলেন, "টাংরী কাবাবের কথাটা মনে পড়ছে। বহুকাল আগেকার কথা। তখন আমাদের বাড়িতে পাঁঠার মাংস ছাড়া আর কোনো মাংস ঢোকে না। কুমড়ো বলি হতো পুজোর সময়, মহিষ-ছাগল কিছু না। অতি কষ্টে বাবা বাড়িতে পাঁঠার মাংস ঢোকালেন। তাও বাইরের বাড়ির উনুনে রান্না হতো। ভেতর-হেঁশেলে নয়। আমাদের গার্জেন টিউটর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যেহেতু তাঁর আপত্তি। মুরগীর ডিমও রান্নাঘরে ঢোকানো বারণ, মুরগীর মাংস তো দূরস্থান। অথচ বাবা মুরগী খান, আমাদের চিকেন

স্যান্ডউইচ প্রচুর খাওয়ান। কিন্তু বাড়িতে নয়। বাবা-মা কলকাতায় নেই, কিন্তু আমরা তখন আছি। বাধ্য হয়ে। দাদা পরের বছর এন্ট্রেস দেবে। আগেকার সেই গার্ডিয়ান টিউটরের হেফাজতেই আছি। পণ্ডিত জানকীবল্লভ চক্রবর্তী। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরেই মামারবাড়ি। বড়মামা রোজই খোঁজ নিয়ে যান। আমাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত।"

"বাবা খুব কুস্তি পছন্দ করতেন। বসার ঘরে বাবার গম্ভীর সব ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো ছিল, গোবরের সঙ্গে, বড়মামার সঙ্গে। ফলে আমাদের জন্যে রোজ ভোরবেলা কুস্তিগীর আসতো, কুস্তি শেখাতে। ভোর পাঁচটায় দিন শুরু হতো হুপহাপ করে কুস্তি দিয়ে। ছ'টায় স্নানের পর গার্ডিয়ান টিউটর সংস্কৃত বেদমন্ত্র গীতা, শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়াতেন। প্রথমে গায়ত্রী পড়িয়ে, কোশাকুশি নিয়ে জপ-টপ করিয়ে নিতেন। প্রত্যুষে শাস্ত্রপাঠের পরে ব্রেকফাস্ট। তারপর অঙ্ক স্যার। তারপর ইংরিজি স্যার। এইরকম সারাদিন চলত। গার্ডিয়ান টিউটরই সব রুটিন তৈরি করতেন, কোন টিচার কখন এসে কী পড়াবেন। সন্ধ্যাবেলা আমরা নিজেরাই পড়তে বসতুম। তত্ত্বাবধান উনি নিজে করতেন। এবং সংস্কৃত টেক্সট, যাবতীয় পাঠ্য তখনই আমাদের পড়াতেন। ব্যাকরণ, ট্রানস্লেশন ইত্যাদি। কলকাতায় থাকার কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলুম সন্ধ্যাবেলায় আমরা দু'ভাই নিজেরাই বসে বসে পড়ি। ঠুনোবুড়ো আধঘুমন্ত হয়ে পাহারা দেয়। কিংবা সাহেবালি তরোয়াল নিয়ে পাহারা দেয়। সংস্কৃত পড়াই বন্ধ। এদিকে দাদার টেস্টও এসে গেছে। সন্ধেবেলায় কোনোদিন আর স্যার বাড়িতে থাকেন না। স্যার যান কোথায়? সাহেবালিকেই বললুম—"রোজ সন্ধ্যা-বেলায় স্যার কোথায় যাচ্ছেন? জেনে দাও।"

শুনে সরল সাহেবালি বললে—"স্যার কো পুছো না?" বেশ! স্যারকে পুছতে তিনি বললেন—একটা জরুরী রিসার্চের কাজ করতে বেদান্ত সোসাইটির লাইব্রেরিতে যান। কাজটা শেষ হলেই আর যেতে হবে না। দাদা বলল, "বাজে কথা। স্যার অনেক রাত করে ফেরেন আজকাল। লাইব্রেরিতে অতক্ষণ থাকতে দেবে নাকি? হতেই পারে না।" ফের ধরো সাহেবালিকে।

এবার সাহেবালি ঠিক খবর এনে দিল। নিজেও কম বিচলিত হয়নি। স্যার নাকি প্রত্যেকদিন আমারই মামারবাড়িতে যান। সেখানে কোনোই বেদান্ত সোসাইটি নেই!

যদিও আমাদের মতো অতবড় তালুক মামাদের নেই, তবু মা যে আমাদের রাজকন্যা, এতে সন্দেহ ছিল না। দাদামশাই ধরণীকান্ত স্বদেশী করলে কি হবে, বড় হয়ে মামারা সবাই বিলেত গিয়ে বখে গেছেন। মামাবাড়ির বৈঠকখানা যেন একটা বিলিতি ক্লাব। যে যত খুশি বিলিতি মদ খাচ্ছে, তাস পিটছে, জুয়োয় টাকা হারছে এবং কষে মুরগী মাটন কাবাব রোস্ট খাচ্ছে। আমাদের মামাবাড়িতে

বেড়াতে যাওয়া বারণ ছিল, এক "কাজের বাড়িতে" ছাড়া। সেই নিষিদ্ধ মামাবাড়িতেই কি না আমাদের বেদজ্ঞ পণ্ডিত প্রত্যহ যাচ্ছেন? রোজ রোজ ওখানে তাঁর কী এত কাজ? বড়মামার সঙ্গে ওঁর হিন্দু স্কুলের ক্লাস-ফ্রেন্ড হিসেবে ছোট থেকেই অবিশ্যি বন্ধুতা আছে, তা বলে এত? আমাদের সন্ধে-বেলার পড়াশুনো মাথায় উঠেছে, সংস্কৃত সব ভুলেও গেছি। একদিন বড়মামা আসতেই দাদা বললে, "বড়মামা, স্যার আর আমাদের সন্ধেবেলায় পড়ান না। বেদান্ত সোসাইটি লাইব্রেরিতে রিসার্চ করতে চলে যান প্রত্যেকদিন। এতে আমাদের খুব ক্ষতি হচ্ছে, সামনেই পরীক্ষা। তার ওপর এত বৈদান্তিক পড়া-শুনো করে স্যার বেজায় কনজারভেটিভ হয়ে যাচ্ছেন, হপ্তায় মাত্র একদিন মাংস রান্না হয়। কলকাতায় সবাই মুরগীর ডিম খায়, মুরগীও খায়, কেবল আমাদের বাড়িতেই সব বারণ। এত বামনাই কি আজকালকার দিনে কেউ করে? আপনি প্লিজ একটু ওঁকে বুঝিয়ে বেদান্ত সোসাইটি বন্ধ করুন—আমার টেস্ট পরীক্ষা সামনে। ওজনও কমে যাচ্ছে।"

"তাই তো? ডিম খেতে দেয় না? মুরগীও না? জানকীটা তো আচ্ছা গোলমেলে বামুন হয়েছে?" বড়মামা চোখ বড় বড় করে নকল রাগ করলেন। "নাঃ, ওকে তো বলতেই হবে দেখছি। ঠিকই বলেছিস, ঐ বেদান্ত সোসাইটি করে-করেই ওর মনটা আরোই পিছনদিকে চলে যাচ্ছে।" বড়মামা কিছুক্ষণ হাসি-হাসি মুখে চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোরা দুজনে এক কাজ কর। কালকে সন্ধের মুখে আমাদের বাড়ি চলে আসবি। বৈঠকখানায় পর্দার আড়ালে চুপটি করে লুকিয়ে বসে থাকবি। দেখবি কী হয়। খুব মজা হবে, দেখিস! জানকীকে বলিস না!" আমরা তো বিকেল থেকেই নাচছি। স্যারকে না-বলে মজা দেখব! —"সাহেবালি, নিয়ে চলো। বড়মামা বলেছেন।" কিন্তু গার্ডিয়ান টিউটরের অনুমতি ভিন্ন আমাদের কিছুতেই সাহেবালি নিয়ে যাবে না। বড়মামা তো এদিকে বারণ করেছেন স্যারকে বলতে। কী করি? মহা মুশকিল হলো।

গার্ডিয়ান টিউটরের অনুমতি ভিন্ন আমাদের বাড়ি থেকে এক পা বেরুনোর নিয়ম ছিল না। তা তিনি যখন বলেননি, তখন, ড্রাইভারও নিয়ে যাবে না। এক সাহেবালিই ভরসা। সে বাবাকে মানুষ-করা বডিগার্ড বলে কথা। এখানে বাবা তাকেই আমাদের কাছে রেখে দিয়েছেন, বাবার কাছে আছে সাহেবালির ছেলে, গোলামালি। মামার বারণ আছে শুনে সাহেবালি খানিক কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, "ঠিক আছে। কাপড়া লাগাও।"

আমাদের মামাবাড়িতে যেতে খুব ভালো লাগত। নিষিদ্ধ ছিল বলেই বোধহয়। আর দিদিমা ছিলেন বলে মামাবাড়িতে গেলে রানী ভবানীর কালের অনেক গল্প দিদিমার মুখে শোনা যেত। পিতৃকুলে, মাতৃকুলে, আমরা দু'পক্ষেই

কেমন করে যেন রানী ভবানীর সঙ্গে জড়ানো। আমাদের বাড়িতে দু-হাজার কলসী গঙ্গাজল লাগতো বছরে। দিদিমাদের লাগতো আরেকটু কম। কিন্তু আমাদের উত্তরবঙ্গের বাস তো গঙ্গার ওপর নয়। খুব কষ্ট করেই প্রত্যেক বছর অন্যের জায়গা থেকে জল আনতে হতো। রানী ভবানী, তাই, জামাইকে গঙ্গা-জলের সুবিধার জন্য বহরমপুর মৌজাটি লিখে দিলেন। যদিও রাজা-জামাইয়ের অবস্থা মোটেই খারাপ ছিল না, তবু জামাইবাড়ি থেকে মেয়ে যখন লিখল, "এইসব অঞ্চলে তেমন ভালো রেশমী বস্ত্র পাওয়া যায় না," তার উত্তরে তখন রানী ভবানীর খাগের কলমে মোটামোটা করে লেখা একটা সই করা কাগজ এল, এই বলে যে, 'রেশমবস্ত্রের জন্য বগুড়ার ডামাজানী জামাতা বাবাজীবনকে মৌজা দেওয়া হইল'। ডামাজানী তখন বগুড়া সিল্কের ঘাঁটি, শ্রেষ্ঠ এন্ডির কাপড় তৈরি হতো সেখানে। দিদিমা বলেন, "এমনি করে-করেই আমরা দিনে দিনে চন্দ্রকলার মতো বৃদ্ধি পেয়েছি। আর তাঁরা কমেছেন।"

দিদিমার কাছে গেলে আমাদের খুব ভালো লাগে। অথচ মা-মাসী কেউ সঙ্গে না গেলে ও-বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ। মদে-মাংসে-জুয়ায় ওটা একটা বিলিতি ক্লাব হাউসের মতো হয়েছিল। ছোট ছেলেদের পক্ষে বিষবৎ। তবে এসব কাণ্ড হতো বারবাড়িতে। তারপর লন, বাগান পেরিয়ে অন্দরে দাদু-দিদিমার মহল। সেখানে একেবারে আলাদা আবহাওয়া। মামাবাড়িটা ছিল সাহেবপাড়ার মাঝখানে। আমরা মামাবাড়ি গিয়ে দিদিমার কাছে না গিয়ে বারবাড়িতে ঢুকছি, সাহেবালি তো মহা আপত্তি শুরু করেছে। ওখানে ছোটদের যাওয়া নিষেধ। আমি বললুম, "বড়মামাকে জিজ্ঞেস করে এস, যাও।" বড়মামার অনুমতি নিয়ে এলেই হবে না, দিদিমার মতও চাই। সাহেবালিকে শেষ পর্যন্ত রাজি করানো গেল। আমরা তো ফাঁকা বৈঠকখানায় ঢুকে বিরাট বিরাট ফ্রেঞ্চ উইনডোর সামনে বিশাল ভারী মখমলের পর্দার পিছনে লুকিয়ে বসে আছি। একসময়ে মাইফেল শুরু হলো। মশাদের খুব মজা। আমাদের বাগে পেয়ে মনের সুখে কামড়াচ্ছে। পাগলের মতন কেবল মশা মারছি, শব্দ না করে। আর মুগ্ধনেত্রে 'নিষিদ্ধ দৃশ্য' দেখছি। অবশ্য ক্রমশ ঘরে এতই হৈ চৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল, যে চড়চাপড়ের তুচ্ছ শব্দ কারুর কানেই গেল না। মামারা তিন ভাই আছেন, তাঁদের মোসায়েবরা আছেন। কয়েকজন সাহেবও আছে। হুইস্কি চলছে। ফ্ল্যাশ, রামি, ব্রিজ খেলা হচ্ছে। আর শামী কাবাব, টাংরী কাবাবের পাত্র আসছে তো আসছেই। আর তারই মধ্যে গলায় গরদের চাদর, মাথায় শিখা, পায়ে বিদ্যাসাগরী লাল চটি, আমাদের স্যারমশাই বসে বসে খুব ফুর্তিসে বেদান্ত সোসাইটির জরুরি রিসার্চ করছেন। দুইহাতে সুদীর্ঘ টাংরী কাবাব ধরে দাঁতে বসাচ্ছেন। টাংরী কাবাব জানিস তো? মুরগীর ঠ্যাং দিয়ে তৈরি হয়। দেখে ফিসফিস করে দাদা আমাকে বললে, "চল, বেরুই। এই হচ্ছে দ্য রাইট মোমেন্ট।"

আমি ভয় পাচ্ছি। এই তো শেষ মোমেন্ট নয়। তারপর তো বাড়ি যেতেই হবে। দাদা বললে, "ধ্যুৎ, কিছু হবে না, ক্যাট রেড হ্যানডেড। টাংরী হ্যানডেড।" আমরা গুঁড়ি মেরে পর্দার পিছন থেকে বেরিয়ে স্যারের পিছনে গিয়ে ডুয়েটে ডাকলুম, "স্যার!" স্যারের হাত কেঁপে কাবাব পড়ে গেল। বড়-মামাই ধরে ফেললেন। স্যার কিন্তু দারুণ স্মার্ট! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলে কথা! আমরা মুখ খোলবার আগেই, "কার সঙ্গে এসেছ? দরওয়ান কেন তোমাদের বেরুতে দিয়েছে এত রাতে? ড্রাইভার কেন তোমাদের এনেছে? কার অনুমতিতে তোমরা এখন হোমওয়ার্ক না করে—" দাদা বললে, "স্যার, আপনি নিজে কাছে না বসলে আমাদের হোমওয়ার্ক কে করাবে? তাই তো আপনাকে ডাকতেই এসেছি!" স্যারের সেই এক কথা। "কিন্তু দরওয়ান কেন? কিন্তু ড্রাইভার কেন—?" দাদা বললে, "আমরা হেঁটেই এসেছি।" কাবাবের গন্ধে ঘর ম ম করছে। স্যার খেতে-খেতে জেরা করছেন। "আমরাও একটা করে কি টাংরী কাবাব খেতে পারি স্যার?" আমি আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললুম। চোখ কপালে তুলে স্যার বললেন, "কুক্কুট মাংস? মোটেই খাবে না। তোমাদের না উপনয়ন হয়েছে? তোমরা কুক্কুট মাংস স্পর্শমাত্র করবে না। ব্রহ্মচর্যের মধ্যে যত ম্লেচ্ছাচার।" বলে টাংরী কাবাবে মন দিলেন।

"আপনার উপনয়ন হয়নি স্যার?" দাদা বললে।

"আমার কথা আলাদা। আমি যা করি, তা ভেবেচিন্তেই করি। প্রথমত, আমি এখন ব্রহ্মচারী নই, গার্হস্থ্য আশ্রমে আছি। সেটা অনেক কম কঠোর। দ্বিতীয়ত, এটা রাজদ্বার। আমি রাজকুমার যামিনীকান্ত, রজনীকান্ত, রমণীকান্ত তিনজনের সামনে বসে আছি। রাজদ্বারে সবই মার্জনীয়। এমনকি ভিতর-বাড়িতে স্বয়ং রাজা ধরণীকান্তও আছেন। মনে রেখো, রাজদ্বারে সব মার্জনীয়। তৃতীয়ত, অধিকারী ভেদ আছে। অধিকারী হওয়া চাই। আমি বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ। অধিকারী বলেই এমন অনেক কিছু করতে পারি, যা ব্রহ্মচারী অবস্থায় তোমরা অপোগণ্ডরা এখনই পারো না। আমার হৃদয়ে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত, আমি যাই খাই, যেখানেই যাই, অশুচি হই না, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং—বুঝলে হে ছোকরাদ্বয়, টাংরী কাবাব আমার চলতে পারে, কিন্তু তোমাদের চলে না।"

"কিন্তু আমরাও তো রাজদ্বারে"—দাদা তবু কথা কয়।

"না, তোমরা মাতুলালয়ে।" স্যার দাদাকে মাটিতে মিশিয়ে দেন।

এবার বড়মামা এগিয়ে এসে আমাদের হাতে টাংরী কাবাব তুলে দিয়ে, হেসে বললেন, "এই নে। নে, তোদের অধিকারী করে দিলাম। আর তিনবার মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ বলে নে, তোরাও ইন অ্যান্ড আউট শুচি হয়ে যাবি। ও-মন্ত্র সকলের জন্য। সবার বেলায়ই এক কাজ দেবে। কেন ভাই জানকীবল্লভ এদের এত কষ্ট দিচ্ছ? বারবাড়িতে বাবুর্চির কিচেনে মুরগীটা

চালু করে দিলেই পারো এবার। মাংস তো হচ্ছেই। তাহলে তুমিও বাড়িতে বসেই রুচিমতন মুরগী খেতে-টেতে পারো—হুইস্কিতে তোমার তো আসক্তি নেই। তাসেও না।”

সাহেবালির সঙ্গে আমরা তিনজনেই ফিরলাম। হেঁটে। পরদিন থেকে স্যারের বেদান্ত সোসাইটির রিসার্চের পরিসমাপ্তি ঘটল। খুদাবক্স আমাদের বাড়িতেই টাংরী কাবাব তৈরি করতে লাগল, ব্রেকফাস্টে মুরগীর ডিমের পোচ খাওয়া চালু হলো এবং যথানিয়মে রোজ সন্ধ্যায় আবার আমরা সংস্কৃত পড়তে বসলাম।

দাদামণির আংটি

কী কুক্ষণেই যে অতো বড়ো শান্তিনিকেতনী চামড়ার থলেটা এনেছিলুম। ওঃ! না হয় সস্তাই হয়েছে ফুলকপি, তাব'লে অ্যাতো কিনতে হবে?

—হ্যাঁ, হবে। ফুলকপির সিঙাড়া, ফুলকপির ডালনা, ফুলকপি ভাজা, অ্যাতোরকম গুষ্টির পিণ্ডি হবে কিসে? মেনু অরডারের বেলায় তো বাদশাই চাল।

—তোমার ভাষাটা একটু বদলাও। এ-যুগে ওরকম প্রাইমিভ্যাল ল্যাংগুয়েজ আর চলে না! বুঝলে গিন্নি? একটু পালিশ চড়াও।

—আর ফিউড্যাল অরডারগুলো চলে, না? হ্যান রাঁধেগা, ত্যান রাঁধেগা, তারবেলা? বিয়ে তো করেছো একটা রাঁধুনিকে, দরকার কী ছিল ইংরিজি অনার্সের? শুনি? নো নীড…পালিশ তো ছিলই। সব উঠে গেছে—

—কী করবো, কুকিং অনার্স তো এখনো চালু হয়নি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট লেভেলে এখন যদি-বা! তোমাদের উইমেন্স লিব-এ এই সমস্তই করা উচিত। মেয়েদের নিজস্ব জগৎ গড়ার ব্যবস্থা নেই—

—কে বলেছে নেই? নিউট্রিশানের অনার্স কোর্স হয়, হোমসায়েন্সে হয়। কিন্তু, এই সবই যে উইমেন্স লিব সেটা তোমাকে কে বলেছে? বরং এর উল্টোটাই।

—উইমেন্স লিব তাহলে কী? উইমেন্স্ ঔন ওয়ার্ল্ড তো? তার মানেই কিচেন? —দ্য ওয়ে টু আ ম্যানস হার্ট ইজ থ্রু…

—নিকুচি করেছে কিচেনের। এক্ষুনি ছুঁড়ে ফেলে দেবো তোমার ফুলকপির থলি—কে চায় পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে? নোংরা জায়গা, কেবল অ্যামবিশান দিয়ে ভর্তি, আর লোভ দিয়ে। তোমরা ভাবো মেয়েদের আর কাজ নেই, কেবল পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশের জন্যে হন্যে হয়ে অলি-গলি খুঁজছে? —সেসব দিন আর নেই গো—গন্ ফরেভার! ওইসা দিন ঔর নেহী আয়েগা—বুঝলে স্যার?

—এই ফুলকপির পাহাড় রান্না তোমাকে নিজেই করতে হবে জেনে-শুনেও তো কিনলে? কেন কিনলে? কেউ কি সেধেছিল? টেল মি দ্যাট। হু ফোর্সড য়ু। যত্তোসব।

বেশ করেছি। অসম্ভব সস্তায় পাচ্ছি, তায় রিকশায় চড়ে আসতেই হবে, রাত হয়েছে, তোমার পকেটে অতগুলো টাকা। পথে একটু বাজার করে নিলে ক্ষতি

কী ? বইতে তো হচ্ছে না।

—কিন্তু এই যে পায়ের কাছে কয়লার বস্তার মতন এক বিপুল, যতই কারুকার্য করা হোক, সব্জীর বস্তা—এতে জার্নিটা খুবই আনকমফর্টেবল—

—রোজ রোজ তো যাওয়া হয় না ওদিকে, এক হপ্তার বাজার যে হয়ে গেল, সেটা ভাবছো না ?—জার্নি আনকমফর্টেবল তো এরপরে হোলপটারে বাড়ি ফিরো। গাড়ি তো একটা কিনতে পারলে না। পঁচিশ বছর ধরে শুনে গেলুম কিনছি কিনছি।

—ট্যাক্সি থাকতে গাড়ি কেনে কেবল মূর্খরা আর কালোবাজারিরা। পঁচিশ বছর আগে আমি মূর্খ ছিলাম। অবভিয়াসলি।

—আমিও। ট্যাক্সি তো জীবনেও ধরতে পারো না। ধরো তো কেবল রিকশা।

—ট্যাক্সিশালারা যেতে চায় না যে! রিকশাওলারা ভদ্রলোক, প্রপার জেন্টেলমেন। চাইলেই পাবে—এবার থলেটা তোমার পায়ের দিকে শিফট করছি। অনেকক্ষণ শিটিয়ে বসে বসে ডান পাটা কেমন মানকচুর মতন হেভী ফিল করছি—

—"আ্যাই রিকশা, রোককে"—কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল রাস্তায়। সাঁ-করে হঠাৎ একটা মোটরসাইকেল পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল। আর থামা দূরের কথা, রিকশাওলা রেসের ঘোড়া হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলে। দাদামণি অমনি অস্থির—

—আশ্চর্য তো। থামতে বলছে আর তুমি ছুটছো ? নিশ্চয় দে নীড সামথিং। অ্যাই রিকশা রোককে ! সামবডি মাস্ট বি ইল। নির্ঘাৎ শালারা ট্যাক্সি পাচ্ছে না তাই রিকশা খুঁজছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কাউকে—নাও, এবারে বওগে তোমার একমণ সস্তার সব্জীর বস্তা—ইতিমধ্যে মোটরসাইকেল রিকশার সামনে এসে ব্যাঁকা হয়ে থেমেছে। রিকশাওলার না দাঁড়িয়ে উপায় নেই, কিন্তু রিকশা সে নামায়নি। চড়া গলায় বললে—ক্যা মাংতা ? রুখা কাহে কো ? প্যাসিঞ্জার হ্যায়—

—চুপ রও, উল্লু কাঁহাকা। ছুটতা থা কিঁউ ? বলতে বলতে আরোহী দুজন মোটরসাইকেল গাছতলায় পার্ক করে নেমে এল। একজন দাদামণির পেটে একটা খোলা ভোজালি ধরল। অন্যহাতে সব্জীর থলেটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে মোটরসাইকেলের পার্শ্বস্থ ক্যারিয়ার-খাঁচায় ভরে দিল। তারপর বাঁ হাতটা পেতে বললে—"যা আছে দিয়ে দিন।" কালবিলম্ব না করে স্বয়ংক্রিয় অঙ্গুলি তুলে ইনোসেন্টলি দাদামণি সোজা বউদির দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন —"যথাসর্বস্ব ঐ ভ্যানিটি ব্যাগে দাদা। পকেটে কেবল প্রাণটি !" অন্য ছেলেটি ইতিমধ্যে বউদির দিকে একটা বেঁটে নলপানা যন্তর তুলে ধরে বলছে—"গয়নাগাটি

গা থেকে সব খুলে দিন বউদি—" তার কথায় কর্ণপাত না করে রুদ্ধশ্বাসে বউদি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওগো, ওই বোধহয় সেই জিনিস না গো, পাইপগান না কী যেন বলে? কাগজে ওটার নাম সেই কবে থেকে পড়ছি—অ্যাদ্দিনে—স্বচক্ষে দেখা হলো—এটাই তো পাইপগান, না ভাই?" বন্দুক হাতে ভাইটি তার ফলে বউদির হাঁটুতে ঠাঁই করে হঠাৎ একটা ঠোক্কর মেরে বললে—" মেলা চেল্লাবেন না বউদি, দয়া করে—গয়নাগুলো খুলে দিন—" এদিকে বউদির পাটি ঘা খেয়েই ডাক্তারী হাতুড়ি-পরীক্ষার মতো সাঁ করে লাফিয়ে উঠে ছেলেটার বুকে অটোমেটি-ক্যালি লাথি মেরে ফেলল, ফলে ক্ষিপ্ত ছেলেটি বউদির পায়ের হাড়ে, আরেক ঘা ঠাঁই করে মেরে বললে, "লাথি মারছেন? সাহস তো কম নয়?" স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বউদি বললেন—"তোমার বন্দুকে গুলি নেই বোঝাই যাচ্ছে। থাকলে অমন রুলারের মতো ঠাঁই-ঠুঁই যন্ত্রতন্ত্র চালাতে না। আর ওটাকে বলে অটো-মেটিক রিফ্লেক্স। এটাও পড়নি?" দাদামণির বুকে ভোজালি-ধরা ছেলেটা বাঁ হাত বাড়িয়েই বউদির ব্যাগটা কেড়ে নিলে এবার। পাইপগানওলা ছেলেটা যেই বউদির ঘড়িটা খুলতে হাত বাড়িয়েছে—"ছোঁবেন না। বলছি—ছোঁবেন না বলছি, মেয়েছেলের গায়ে হাত দিলে অ্যাইসা শিক্ষা দিয়ে দোবো—" বলে বউদি বিনা নোটিসে হঠাৎ চিল চেঁচিয়ে উঠলেন—"ঘড়ি কি আমি নিজে খুলতে জানি না? ছিনতাইও করবেন, অথচ ঘড়িটা খুলতে দু-মিনিট ধৈর্য নেই গা?" বউদি ঘড়ি খুলে ধীরে-সুস্থেই ছেলেটার হাতে দিলেন। এবং বললেন—"হাতের চুড়িও নকল, কানের ফুলও নকল, আর গলার মালাটা পুঁতির। চাই? পরে ধরে থাপ্পড়-টাপ্পড় মারলে কিন্তু ভালো হবে না! কেউ এত রাত্তিরে আপনাদের উবগার করবে বলে সোনার গয়না পরে বের হয় না রাস্তায়।" ছেলেটা বললে—"কোনো কথা না বলে হাতের চুড়ি কানের রিং—"

—"ও ভাই, ব্যাগে আমার অ্যানুয়ালের নম্বরগুলো আছে, ঐ দরকারী কাগজগুলো বেছে নিতে দিন, কেমন? আপনাদের তো—"

—"অতো কথা বলবেন না। কাগজপত্র সর্ট-আউট করবার সময় নেই।—চুড়ি খুলে দিন, আসল-নকল আমরা বুঝবো! মালাটা পুঁতির হলে চাই না।" ভোজালি ততক্ষণে দাদামণির বিয়ের ঘড়িটাও বাগিয়ে নিয়েছে, আর বুকপকেট থেকে পার্সটা তুলে নিয়েছে। রিকশাওলা বললে—"আবতো কামউম সারে খতম? হামকো ছোড় দো। ভুখ লাগা, সাড়ে দশ বাজ গিয়া—"তাকেও এক গোত্তা মেরে পাইপগান বললে—"আগে গেঁজে খোল্। গেঁজে খোল্। দে, টাকা বের করে দে"—এবার ক্ষিপ্ত রিকশাওলা বললে—"বাবু, ইয়ে অপ ক্যা কর রহেঁ হ্যায়, হাম গরীব আদমি—হামকো পৈসা চোরি করনা ঠিক নাহী, আপলোক তো রইস্ আদমী", ভোজালী বললে—"আরে আরে, ওকে ছেড়ে দে—চ' আর দেরি করিস না, শেষে ওরা রাউন্ডে এসে পড়বে"—গোব্দা শান্তিনিকেতনী চামড়ার

ব্যাগে ছদ্মবেশী সব্জীর থলি, দু-দুটো ঘড়ি, দাদার পার্স আর বউদির হ্যান্ড-ব্যাগ নিয়ে ওরা গর্‌র্‌ করে মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। মনে হলো, যাবার সময় কী যেন ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।

২

ইতিমধ্যে সামনে এক বাড়ির দরজা খুলে গেল। আলোর ফ্রেমে এক ভদ্রমহিলাকে আলুথালু বেশে ছুটে আসতে দেখা গেল। তিনি চেঁচাতে লাগলেন। পিছু পিছু পাজামা-পরা এক ভদ্রলোক পাল্লা দিয়ে ছুটে, তাঁর আঁচল ধরে টানতে লাগলেন—"থামো! ওগো, থামো! কই যাও"—ভদ্রমহিলা চেঁচিয়েই চললেন —"চোর! চোর! ছিন্‌তাই! ছিন্‌তাই। পালালো! পালালো! পাকড়ো! পাকড়ো!" বউদিও সঙ্গে সঙ্গে গলা মেলালেন। রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেল। হাল ছেড়ে, রিকশাওলা এবারে হাতলটা মাটিতে নামিয়ে, সরে গিয়ে, ফুটপাথে বসে পড়ল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে আপনমনে বলল, "রাম! রাম! শালে ডাকু, বদমাস!"

বউদি বললেন—"শান্তিনিকেতনী থলেতে সব্জী আছে বুঝলে, ওরা ওটা নিত না। অল্পবয়সী ছেলে তো। বুঝতে পারেনি। ভেবেছে হয়তো কাপড়-চোপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছি"—

দাদামণি বললেন—"পার্সটার দাম সাড়ে সাত টাকা। আর ভিতরে ছিল সাড়ে পাঁচ টাকার মতন—যাক্‌ বাবা, তের টার ওপর দিয়ে গেছে। আমার টাকাটা কিন্তু ইনট্যাক্ট আছে, হিপপকেটে, সীটের সঙ্গে লাগোয়া। ভাগ্যিস রিকশাটা নাবায়নি! রিকশাওলার গুণেই টাকাটা বেঁচে গেল। সাধে বলি ওরা জেন্টেলম্যান।"

—"আর আমার বাবার দেওয়া ঘড়িটা? সেটা যে গেল?"

—"ওটার তো পঁচিশ বছর হয়েছিল। অনেকদিন ধরেই আমার একটা জাপানী কম্পিউটার ঘড়ি কেনার ইচ্ছে—নেহাত ওটা ছিল বলেই—"

—"ওঃ, তাহলে তো বিয়ের ঘড়িটা গিয়ে খুব খুশিই হয়েছো—কী বলো? আপদ গেছে—"

—"আজকাল বড্ড স্লো হয়ে যাচ্ছিল—তোমারটাও তো নিয়ে গেছে—তার বেলায় দুঃখ করছো না তো?"

—"কেন করবো? তুমি জাপান থেকে এনে দিয়েছো বলে বড়োমুখ করে যাকেই দেখাতে যাই, বলে, এরকম তো এসপ্ল্যানেডে চল্লিশ টাকাতে পাওয়া যায়। গেছে গেছে, আপদ গেছে। বাড়িতে আমার বিয়ের ঘড়িটা তোলা আছে। সোনার ঘড়ি।"

—"আর হ্যান্ডব্যাগ? ওতে কত খসলো?"

—"হ্যাঁ! হ্যাঁ! ব্যাগ! ব্যাগ! টাকাকড়ি তো সব বাজার করতেই বেরিয়ে গেল—কিন্তু ইশ্‌কুলের অ্যানুয়েলের নম্বরগুলো সব ওতে ছিলো গো—ব্যাটাদের আমি অতো করে বললুম, বলে কি, পেপার্স সর্ট করবার নাকি সময় নেই!"

—"ওর তো রাফ কপি পাবে বাড়িতে। নম্বরের তো কপি রাখো—অমন কচ্ছো কেন? আর কী কী ছিল? টাকা তাহলে ছিল না? তবু ভালো—"

—"ম্যানিব্যাগটাই তো বিলিতি—মিনি ম্যানচেস্টার থেকে—ওর মধ্যে নবনীতার আনা মার্কিনি লিপস্টিকটা ছিল, আর তারার দেওয়া জাপানী কম্‌প্যাক্ট—আহাহা—ও-সব জিনিস আর কোথায় পাবো গো?"

বউদির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মহিলা বললেন, "দেখুনগে যদি ফেলে দিয়ে গিয়ে থাকে। ওরা অনেক সময়ে শুধু টাকাটা নিয়ে, ব্যাগটা ফেলে দেয়—" দাদামণি তখুনি ছুটলেন—"চলুন, চলুন, দেখি"—ইতিমধ্যে আরেকটি দরজা খুলে গেল। একটি দীর্ঘ ভয়ংকরদর্শন বল্লম হাতে নিয়ে স্লিপিংস্যুটপরা এক ভদ্রলোক বেরুলেন। বেরিয়েই, ওপরে বারান্দার দিকে একপলক তাকিয়ে নিলেন। সেখানে দেখা গেল একসারি দর্শক। নারী-পুরুষ-শিশু কিছু বাদ নেই। প্রত্যেক তলার বারান্দাতে মানুষ ভর্তি। এরা এতক্ষণ ছিল কোথায়? বল্লম হাতে ভদ্রলোক বললেন—"ব্যাগটা ওইখানে ফেলে দিয়েছে। ঐ যে। আমরা বারান্দা থেকে দেখিচি।" ভেংচে উঠে বউদি বললেন—"দেকেচেন তো নামলেন না কেন নিচে? চেঁচালেন না কেন? এখন এসে কী হবে?"

—"নামতেই তো চেষ্টা করচি সমানে। আনআর্মড হয়ে তো নামা যায় না! চেঁচালে যদি আপনাদের কোনো ক্ষতি করে দেয়? গুলিটুলি মেরে দেয়? এই রমলার জন্যেই তো যত গোলমাল হলো।"

—বারান্দা থেকে উত্তর এল—"ওঃ, রমলার জন্যেই বুঝি গোলমাল? কে বললে যে, ছিনতাই হচ্ছে, দেখবে এসো? কে বললে নাগাল্যান্ডের বল্লমটা দেয়াল থেকে নাবিয়ে নিয়ে তেড়ে যাও?"

—"বল্লমটা তুমি দড়ি দিয়ে বেঁধে না রাখলেই তক্ষুনি আসা যেত। অ্যাবসার্ড যত বুদ্ধি! বেঁধে রেখেছে!"

—"দড়ি দিয়ে না-বেঁধে কেউ বসবার ঘরে ট্রাইবাল অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে রাখে না। হাওয়া দিলেই ঘাড়ের ওপর পড়ে যায়। হুকে টাঙানো থাকে না। পুরুলিয়ার তীরধনুক তো রোজই পড়ে যেত।" এতক্ষণে খেয়াল করি মস্ত একটা তীরধনুক হাতে করে বছর-বারোর একজন ছেলেও ওই বারান্দায় শূন্যে তাক করছে।—সেও বললে—"তীরধনুকটা সময়মতো মা নামাতে পারলেই আমি লোকদুটোকে এখান থেকেই খতম করে দিতে পারতাম। কিন্তু মা এমনই গেঁট

বেঁধে রেখেছিলেন—যে সেটা খুলতে খুলতেই ডাকাত পালিয়ে গেল—।” নাগাদের বল্লম হাতে ভদ্রলোক আবার বললেন, “ঐতো আপনার ব্যাগ।” এমন সময় দাদামণি, হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল, এমনভাবে বললেন,—“আচ্ছা, তোমার চুড়ি, কানের ফুল সবই নকল ছিল, সত্যি ? আমি তো ভাবতুম সোনারই। নাকি গুল মারছিলে ?”

—“নাঃ। নকল। কেবল গলার মঙ্গলসূত্রটাই সোনায় গাঁধা। যেটা ওরা পুঁতির মালা বলে নিলে না।” বউদি সগর্বে গলার মালাটা ছোঁন। সস্নেহেও। দাদামণি কাতরে ওঠেন—“আংটি ? তোমার আংটি কই ? ওটা তো কমল-হীরে।”

—“আছে, আছে—গায়ে হাত দেবেন না বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ওটাকে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছি।” বউদি মহান এক তৃপ্তির হাসি হাসেন। ওটাই যা এক দামী গয়না। দাদামণির ফুলশয্যের রাত্রের উপহার। যতই ঝগড়া করুন বউদি ওটা হাত থেকে খোলেন না। হীরেটাকে ভেতর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে পথে চলাফেরা করেন। ব্যাগটা নিয়ে এলেন ঐ ভদ্রমহিলাই। ব্যাগটা খালি। ভেতরে কিছু নেই। তাড়াহুড়োতে চেনের ক্লিপটাও ছিঁড়ে ফেলেছে। তবু ব্যাগটা তো পাওয়া গেল! ভেতরে অবশ্য ম্যানচেস্টারের মানিব্যাগ নেই। বৌদি ব্যাগ বগলে করে বললেন—“হতচ্ছাড়ারা আমার বিদেশী লিপস্টিক, জাপানী কমপ্যাক্ট, সবগুলো নিয়ে নিলে ? মায় অ্যানুয়ালের নম্বরগুলো পর্যন্ত ? মানিব্যাগ যে নেবেই সেটা না-হয় বুঝি।”

—“আর তোমার ফুলকপি-কড়াইশুঁটির জন্যে দুঃখু হচ্ছে না ?”

—“বাজে বোকো না।”

—“চলিয়ে বাবুজী চলিয়ে—ঔর কুছ নাহি মিলেগা—“রিকশাওলা এবার উঠে দাঁড়ায়। ভদ্রমহিলা বললেন—“আপনারা পুলিশে এফ. আই. আর. করুন। এই নিয়ে এখানে অনেকবার ছিনতাই হলো। আমিই তো সেকেন্ডবার দেখলুম। উনি কিছুতেই বেরুতে দিলেন না, নইলে ব্যাটাদের ঠিক আটকানো যেত। জাপটে ধরে রইলেন, এত বীরপুরুষ।” স্বামী কঁকিয়ে ওঠেন—“বেরুতে দিলেন না ? না দিলে বেরিয়েছ কী করে ?”

—“সে চোর পালালে বেরিয়ে কী লাভ ? অন্যলোকে একটু চেঁচামেচি করলেও তো লাভ হয় ? পালিয়ে যেত”—

বউদি বলেন—“হয়তো! আপনারা কিন্তু বল্লম খোলাখুলি না করে যদি ঐ দোতলা থেকেই একটু হাঁকডাক করতেন, চোর চোর বলে চেঁচাতেনও, তাহলেই ব্যাটারা পালাতো। ওদেরও তো প্রাণের ভয় আছে!”

—“আচ্ছা, এর পরের বারে তাই করবো”—দোতলার ভদ্রমহিলা জানালেন। —“ওপর থেকেই চেঁচাবো, যদি তাতে কিছু হয়। আমি তো খেয়েদেয়ে বারান্দায়

দাঁড়িয়েছিলাম, স্বচক্ষে সবটাই দেখেছি। একটা লোক ওঁর পার্সটা বের করে নিলে, সেই লোকটাই এঁর হ্যান্ডব্যাগও নিয়ে নিলে। অন্যটা কেবল ভদ্রমহিলার হাঁটুতে ঠাঁই-ঠাঁই করে মারছিল—গয়নাগুলোর জন্যে—" শুনেই বউদি চেঁচিয়ে ওঠেন— "বাপ রে, হাঁটুতে আমার একেই আরথ্রাইটিস। খুব টনটন করছে"—

বউদিকে থামিয়ে দাদামণি বলেন, "এতটাই দেখেছেন? তবে আপনিও থানায় চলুন, সাক্ষী দিতে হবে তো?"—দাদামণি হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠতেই, স্লিপিংস্যুটের ভদ্রলোক বল্লম উঁচিয়ে বললেন—"পাগল নাকি? এত রাত্তিরে কে থানায় যাবে? ওর যত বেশি বেশি কথা বলা অভ্যাস।" বউদি ব্যাপারটা হাল্কা করতে বললেন—"তা, অল্পের ওপর দিয়েই গ্যাছে—ওঁর পকেটে ন'শো টাকা ছিল"—

—"আংটিটা কোথায়?" দাদামণি এক ধমক দেন।

—"এই যে"—বলেই বউদি জামার ভেতর হাত পুরে, আর কিন্তু আংটিটা খুঁজে পেলেন না। আঁতিপাঁতি খুঁজেও না। রিকশাতেও পড়েনি। তবে কি রাস্তায়? উপস্থিত কৌতূহলী ব্যক্তিবৃন্দ প্রত্যেকেই এবার পথের ওপর উপুড় হয়ে একমনে চাঁদের আলোয় কমলহীরের আংটি খুঁজতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। কে বলে বাঙালী পরের জন্যে করে না? কে বলে বাঙালীর ঐক্য নেই? রাস্তা খুবই স্বল্পালোকিত। যদিও লোডশেডিং নয়, তবু অন্ধকারই। ঠিক এইখানটাতে আবার একখানা গাছের ধ্যাবড়া ছায়া। ঝিরঝিরে চাঁদের আলোয় আংটি খোঁজা রীতিমতো রোমান্টিক হয়ে দাঁড়ালো। তবুও ইনস্ট্যান্ট সার্চ পার্টি কাজে লেগে গেল। অনেকক্ষণ খোঁজ চলল। পরস্পরের দিকেও নজর আছে কড়া। অন্য কেউ না-পেয়ে যায়। কিন্তু পাওয়া গেল না। রিকশাওলাও খুঁজছিল, দাদা-বউদির সঙ্গে।

—"নকল গয়নাগুলোর সঙ্গে আপনি ওটাও নির্ঘাৎ দিয়ে দিয়েছেন"—

—"জামার মধ্যে আর ভরা হয়নি, হাতেই ছিলো মনে হয়"—

—"এফ. আই. আর.-এ আংটিটাও মেনশন করে দেবেন"—

—"নিশ্চয়ই ওরাই নিয়ে গেছে। নইলে হীরের আংটিতো, এত খুঁজে ঠিকই পাওয়া যেত।" উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের মতের সঙ্গে দাদামণিরও মত অভিন্ন। বউদিই জীবনে প্রথমবার প্রায় নির্বাক।—"কিন্তু, কিন্তু আমি সত্যিই জামার মধ্যে"—দাদামণি এক ধমক লাগান— "বাজে কথা বোলো না, জামার মধ্যে হলে যাবে কোথায়?"

রিকশাওলা ক্লান্ত গলায় বললে—"বাবু, আব ক্যা করেগা? থানেমে যায়েগা? চলিয়ে"—

—"মোটেই না। আগে বাড়ি যাবো। আমার বেচারা ছেলেপুলেগুলো ভয়েই মরে গেল এতক্ষণে। এবং খিদেতেও। কে যাবে থানায়? আগে ওদের

দুটো ভাত বেড়ে দিইগে যাই—চলো হে রিকশাওলা, পয়লে যিধার বোলা থা, ওই ঘরমে চলো"। বউদি রিকশাওলাকে ডিরেকশন দিয়েই পড়শীদের ধন্যবাদ দিতে থাকেনঃ "আচ্ছা ভাই! থ্যাংকিউ! থ্যাংকিউ! অনেক করলেন আপনারা—এই মাঝরাত্তিরে শীতের মধ্যে—বল্লম-টল্লম নিয়ে"—

—"কী আর করেছি, কিছুই তো করিনি। এ আর এমন কি, এতো সবাই করে, নইলে মানুষ সমাজে আর বাস করবে কেন—এফ আই আর.-টা কিন্তু দাদা আজই করতে ভুলবেন না—ভেরি সরি, আমাদের পাড়ায় এসে আপনাদের ক্ষতি হয়ে গেল"—এইসব মধুর আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে রিকশাওলা দাদামণির বাড়ির দিকে ছুটলো।

৩

খাবার টেবিলে তুলকালাম বেধে গেল।—"রিকশাওলাকে দশটাকা দেবার কী হয়েছিলো, শুনি?"

—"ওরই জন্যে তো নশো টাকা বেঁচে গেছে। ও যদি রিকশাটাকে একবারও রাস্তায় নামাতো, তবেই ওরা আমাদের টেনে নাবিয়ে বডি সার্চ করতোই এবং টাকাটি পেয়ে যেতো—দারুণ নার্ভ এবং উপস্থিত বুদ্ধি ঐ রিকশাওলাটার"—

—"খুব সম্ভব দলেরই লোক—ষড় ছিলো কিনা কে জানে?"

—"বাজে কথা বোলো না। তাহলে রোক্কো বলতেই অমন ছুটতো না। রিকশাটি নাবিয়ে, পিটটান দিতো—নাঃ, সত্যিই তুমি বড্ডোই মীন মাইনডেড।

"চলো এবার থানায় যাই। সত্যি, এফ. আই. আর. করতেই হবে। হলো তোমার কাঁটা চিবুনো? রাত বাড়ছে।"

—"আগে অনুপদাকে বরং একটা ফোন করে দাও। আর বাচ্চুদাকে? ওদের তাড়া না খেলে থানা আঙুল নাড়বে?"

—"বাচ্চুকে করেছি। অনুপ বোসকে এসব ছোট ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটানো চলে না, বুঝেছ? বাচ্চুকেও চলে না, তবে কিনা, সে ক্লাসফ্রেন্ড।"

—"যদি খুন করে দিত? ছিলো তো পাইপগান, ভোজালি।"

—"তাহলে নিশ্চয় বলতুম। খুন তো করেনি। দিব্যি বহালতবিয়তে কাঁটা চিবুচ্ছ।"

—"করলে খুশিই হতে মনে হচ্ছে।"

—"তা বলতে পারি না। ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই অনেস্ট ওপিনিয়ন, মাঝে মাঝে আমারই তো তোমাকে খুন করতে ইচ্ছে করে।"

—"আমারও। জেনে রেখো আমারও করে। নেহাৎ হিন্দুঘরের বিবাহিত স্বামী, তাই বেঁচে রয়েছো। মাছকাটা বঁটিটা আমার হাতেই থাকে। তোমার ঐ লেটার-ওপ্‌নার দিয়ে খুন হয় না।

—"হয় হয়, তেমন কায়দা জানলে আলপিন দিয়েও খুন হয়।"

—"মা, তোমরা কাল বরং থানায় যেও। এখন দ্যাখো আলপিন আর লেটারওপনার দিয়ে কদ্দূর কী হয়।"

—"তুই চুপ করে থাক দিকিনি খোকন। সব কথায় কথা!" এবার বাবলুও বলে।

—"রাত প্রায় বারোটা বাজে, মা। যাবে তো যাও। নিচের ব্যানার্জিকাকু কখন গাড়ি বের করে ওয়েট করছেন তোমাদের থানায় নিয়ে যাবার জন্যে। ওঁরাও তো শোবেন, নাকি?"

৪

বুটপরা দুপা টেবিলে। সামনে এক ভাঁড় চা। বাঁ-কানের ফুটোয় দেশলাইকাঠি ঘুরছে। এক চোখ খুলে ভদ্রলোক বললেন—"এগুলোকে কে এখানে ঢোকালে?" সেপাই কাঁপতে কাঁপতে বললে—"আমি ঢোকাইনি স্যার। অনেক বারণ করিছিলুম, জবরদস্তি ঢুকে পড়লো। এফ. আই. আর. করবেই। ছিনতাই কেস।"

—"হুঁ। নিকাল দো। এখন রাত বারোটা। কাল হবে।"

—বউদি হঠাৎ ফেটে পড়লেন, যেন আণবিক বিস্ফোরণ ঘটল। "ক্যানো, ইয়ার্কি পায়া? নিকাল দো? ক্যানো? সরকারি পয়সায় টেবিলে ঠ্যাং তুলে সরকারি পয়সায় চা খেতে খেতে ভারি তেল হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ঠ্যাং নাবিয়ে ভদ্রলোকের মতন বসুন তো? ট্যাক্স-পেয়ার্স-মানিতে আপনি মাইনে পান। বুঝলেন? এবং ইউ আর অন ডিউটি নাউ। বুঝলেন? খাতা বের করুন। এফ. আই. আর. নিতে আপনি বাধ্য। নইলে আপনার নামেই এফ. আই. আর. করবো।" ভদ্রলোকের কানের ফুটোতে দেশলাই থেমে গেছে। সত্যি-সত্যিই পা নাবিয়ে খাড়া হয়ে বসে, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"এটা পুলিশ থানা। আপনাদের কেমন করে সিদে করতে হয় সেটা আমরা জানি। রঘু।" হুঙ্কারে একটুও ভীত না হয়ে বউদি বললেন, "আর আপনাদেরও কেমন করে সিদে করতে হয় সেটাও আমরা জানি। উঃ হু, কী হচ্ছে কী? অত জোরে চিমটি কাটে? জানো না আমার হাঁটুতে কীরকম ব্যথা? তার ওপরে হাঁটুতেই অতবার ব্যাটারা মারলে, পাইপগান দিয়ে—উহুহুহু—"

—"রঘুবীর! শুনতা নেহি?"

—"জী হুজুর।"

—"ইসকো নিকাল দো। নেহিতো লকআপমে—"

এবার দাদামণি অত্যন্ত ভদ্র, নিচু গলায়, প্রায় লজ্জা দেবার মতো সুরে প্রেমনিবেদনের মতো বললেন—"আপনিই কি এই থানার ও. সি.? আপনি এফ. আই. আর.-এর খাতাটা বের করবেন? আমরা ছিনতাই কেস রিপোর্ট করতে চাই।"

—"চান তো বেশ ভালো কথা। রাত বারোটায় ওসব হবে না। কাল সকালে আসবেন। এখন যান।"

—"ছিনতাইটা এখনই হয়েছে কিনা।"

—"ছিনতাই রাতে হবে না তো কি দিনের আলোয় হবে? ও আকচার হচ্ছে মশাই। ও নিয়ে মাথা ঘামালে থানাগুলো উঠে যেত।"

—"থানা তো উঠেই গ্যাচে যা বুঝছি—" বউদি ফের কথা বলে ওঠেন।—"আপনারা কি পুলিশ? অ্যাঁ? কুড়েমির পাহাড় এক-একজন। দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে। নিন, খাতা বের করুন। কাল সকালে সবার আপিস আছে। এখানে বসে রগড় করবার সময় নেই আপনার মতন।"

ও. সি. কে দেখে মনে হলো ভদ্রলোক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ এই সময়ে বললেন—

—"আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি। আপনারা কাজটা মিটিয়ে আসুন। শেষে গাড়িটাও চুরি হয়ে গেলে, এরা তো কিছুই করবে না, যা বুঝচি। যত্তোসব কেলোর কীর্তি। অ্যাদ্দিন শুনেছিলুম বটে থানাগুলোতে কীরকম কী হয়, এবারে চোখে দেখলুম। অ্যাদ্দিন বিশ্বাস করিনি। শব্দ করে বেঞ্চিটা ঠেলে, ব্যানার্জিসায়েব, এমনিতে নেহাৎ শান্ত নিপাট ভালোমানুষ, ঘুম পেয়েছে না কী হয়েছে কে জানে, রেগে গটমট করে বেরিয়ে গেলেন।

—"কই, খাতা কই?" —খাতা বের না করেই ভদ্রলোক বললেন।

—"কোন রাস্তায় হয়েছিল?" দাদামণি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিতে শুরু করেন।

—"অমুক রোডের সঙ্গে অমুক লেনের মোড়ে।"

—"কটার সময়ে।"

—"দশটা! সাড়ে দশটায়।"

—"দশটায় না সাড়ে দশটায়।"

—"দশটা পনেরো।"

—"কজন লোক ছিল।"

—"আমরা দুজন। আর রিকশোওলা।"

—"রিকশোওলা কই?"

এবার বৌদি মুখ খোলেন।

—"সে চলে গেছে। সে খাবে না? শোবে না? ওকে জ্বালিয়ে লাভ কী?"

—"ধরে আনুন। মেইন উইটনেসকেই ছেড়ে দিয়েছেন?"

বউদি—"আপনারাই ধরে আনুন। আপনারাই পুলিশ। এবার খাতা বের না করলে একটা কথারও জবাব দেব না। একে এফ. আই. আর. করা বলে না, লিখে নিচ্ছেন না কিছুই। গপ্পো মারছেন।"

—"সেটা আমি বুঝব।"

বউদি—"আপনি বুঝলে খাতা বের করতেন।"

—"কজন লোক ছিল?"

—"আমরা দুজন। আর রিকশাওলা। কবার বলব?"

—"সেকথা হচ্ছে না। ছিনতাই পার্টির মেম্বারদের কথা—"

—"দুজন।"

—"পায় হেঁটে? সাইকেলে? বয়েস কত? আপনি থামুন ওঁকে বলতে দিন।"

—"মোটর সাইকেলে। বয়েস বেশি নয়। ত্রিশের নিচে।"

—"কোন্ মেক? কী রং?"

—"রাজদূত। ব্ল্যাক। যদ্দুর মনে হয়, ছায়া ছিল কিনা গাছতলায় তো?"

—"আঃ! কেন যে বকছো শুধু শুধু? দেখছ না কিছুই লিখে নিচ্ছে না?"

—"লেখা হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আপনাকে ভাবতে হবে না। প্রশ্নের জবাব দিন।" এমন সময় ফোন বাজলো।

৫

রঘুবীর ধরলো ফোনটা। তারপরেই দৌড়োতে দৌড়োতে এলো—ও. সি. বললেন,—"কে? বীরুবাবু তো? বলে দে এখন হবে না।"

—"ন্না স্যার, আই. জি.।"

—"কক্ কেঃ?"

—"আই. জি.! কথা বলবেন, স্যার। আপনার সঙ্গে।" মুহূর্তের মধ্যে তড়াক করে লম্ফ দিয়ে ও. সি. ফোনে। কথাবার্তা হলো। অল্প কিছুক্ষণই মাত্র। তারপরেই ম্যাজিক। ফিরে এসে টেবিলে সামনেই পড়ে থাকা একটা লম্বাটে বিলবুক টাইপের খাতা টেনে নিয়ে ও. সি বললেন, গলায় বিনয় ঝরে পড়ছে, "নমস্কার! নমস্কার! আপনারাই কি ডক্টর চক্রবর্তী? আরে, আরে, কীঃ আশ্চর্য! আগে বলবেন তো? কী মুশকিল। রঘুবীর। চা লাও। চা খাবেন নিশ্চয়ই? গাড়িসে ওই বাবুকো বুলাও। গাড়ি পর ছুটু সিংকো নজর

রাখতে বোলো। অ্যাতো আজেবাজে লোক এসে সময় নষ্ট করে। বুইলেন না? আগেই তো খুলে বলতে হয় আপনি আইজির ফ্রেন্ড? বলুন, বলুন কী ব্যাপারটা হয়েছিল। সত্যি এ শালাদের জ্বালায় একটু রাত করে আর পথে বেরুনোর উপায় নেই।" খাতা খুলে কলম বাগিয়ে বললেন—"অমুক রাস্তার মোড়ে, অতটার সময়ে একটা কালো রাজদূতে চড়ে দুজন কালপ্রিট, কত যেন বয়েস? হ্যাঁ, তিরিশের নিচে, কী কী নিলে? আরে সব্জীর থলে? হাউ স্ট্রেঞ্জ। এতদিন এত ছিনতাই হওয়া শুনিচি মশাই ঘড়ি, চুড়ি, হার, হ্যান্ডব্যাগ, এসবই নেয়, সব্জীর থলে এই ফার্স্ট টাইম। হ্যাঁ সব্জীর থলে, ডিটেল চাই না, আর কী? দুজনের দুটো ঘড়ি—কী কী মেক? ফেভার-লিউবা, আর ক্যাসিও? লেডিজ? না? আর? পার্স? কত ছিল? সাড়ে পাঁচ টাকা? ধুর মশাই, ওটা আবার একটা অ্যামাউন্ট হলো? হ্যান্ডব্যাগে? সামান্যই? কত ঠিক মনে নেই? জাপানী পাউডার-কমপ্যাক্ট, আর আমেরিকান লিপস্টিক, আর বিলিতি মনিব্যাগ ছিল? আর? অ্যানুয়ালের মার্কস? সে যাগ্‌গে, আর? গয়নাগাটি কী কী নিলে? কেন যে গয়না পরে ঘুরে বেড়ান। ওঃ নকল? কানের ফুল, আর চুড়ি? অ্যাঁ কী বলছেন মশাই? কমলহীরের আংটি? রিয়্যাল? কোন আক্কেলে ওটা পরে ঘুরছিলেন পথে পথে? অ। সেন্টিমেন্ট। তা, গেল তো? দেখি, যদি এইবেলা চেপে ধরলে উদ্ধার হয়। চলুন, সাইটেও একবার যেতে হবে। মোটরসাইকেলটা রাজদূতই ছিল তো? কী করে বুঝলেন অন্য কিছু নয়? কোথায় পার্ক করা ছিল? গাছতলায়? কী গাছ? জানেন না? বড় গাছ? ঝিরঝিরে পাতা? কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া? বাঁদরলাঠি, শিরীষ? যে কোনো কিছু হতে পারে? ছায়া ছায়া ছিল? তবে কেমন করে এত ডেফিনিট হচ্ছেন যে ওটা রাজদূত, ইয়াজদানি না? ছায়াতে গাছ চিনতে পারছেন না, অথচ মোটরসাইকেলের মেক পড়তে পারছেন?"

—"আহাঃ", দাদামণি এবার অস্থির—"আমাদের অফিসের একজন আমার কাছে খানিক ধার নিয়েছিল একটা রাজদূত কিনবে বলে। কেনার পরে আমাকে প্রায়ই চড়াতো যে। রাজদূতটা আমি তাই চিনি," বলেই বউদির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে নিলেন।

—"বেশ। সে লোকটার নাম-ঠিকানা? রাজদূতটার নম্বর কত?

—"আরে সেই লোকটা তো ছিনতাই করেনি। তার নাম-ঠিকানা দিয়ে আপনার কী হবে?"

—"এই যে বললেন রাজদূতটা চেনেন।"

—"মেকটা চিনি বলেছি। যেমন লোকে ফিয়াট চেনে, মারুতি চেনে, মার্সিডিজ চেনে। ওটা রাজদূত ছিল। নম্বর জানি না। কালো রঙ।"

—"লোকগুলো কেমন দেখতে?"

—"ভালো করে দেখিনি মশাই। সাধারণ চেহারা, তবে ভদ্রলোকের মতন দেখতে। কথাবার্তার টানেও মনে হলো লেখাপড়া শিখেছিল কোনোকালে।" এবার বউদি কথা বলেন—"আমি বলছি। চান তো লিখুন। কালো, শুটকোপ্যানা, মুখে বসন্তের দাগ, গায়ে নস্যিরঙ চাদর, সে ব্যাটা মোটর-সাইকেলের পেছনে বসে চলে গেল। পরনে প্যান্টই ছিল, ঘন রঙ। অন্য ব্যাটাচ্ছেলের দিব্যি কার্তিকের মতন চেহারা, বেশ ফর্সাপানা, গোঁপ আছে, অল্প অল্প দাড়িও আছে। কালোরঙের লেদার-জ্যাকেট পরা শাদাপ্যান্ট। ব্যাটারা কেউই হেলমেট পরে ছিল না। অথচ শুনেছিলুম নাকি মোটরসাইকেলে দুজনেরই হেলমেট পরা আইন? এইটারই মোটরসাইকেল মনে হলো, এটাই চালাচ্ছিল এবং আমার হাঁটুতে পাইপগান দিয়ে বারবার ঠোক্কর মারছিল। বেজায় রাগী। আলোয়ান গায়ে লোকটা ভোজালি হাতে হলেও অনেক ধীরস্থির। যা কিছু লুঠপাঠ অবিশ্যি সেই করেছে, ব্যাগ, পার্স, ঘড়ি-টড়ি। লেদার-জ্যাকেট কেবল গয়না গয়না করেই মরছিল। বললুম নকল, তবুও নিয়ে নিলে। এমনই স্টুপিড। আংটিটা ঐ ফাঁকে কী গোলেমালে কখন যে ওদের কাছে চলে গেল, আমি লুকোতে চেষ্টা করেছিলুম ব্লাউজের মধ্যে। ঠিকমতো পেরে উঠিনি দেখছি।"

—"তা পারবে কেন? নকলগুলোর সঙ্গেই হ্যান্ডওভার করে দিয়েছ।"

—"চলুন, সাইটে যাই। পাড়ার লোকরা সাক্ষী ছিল?

—"ছিল। প্রচুর। বারান্দা থেকে মজা দেখছিল, জানলা দিয়ে মজা দেখছিল, ডাকাতরা ভেগে যাবার পরে সবাই বেরিয়ে এল, সড়কি-তীরধনুক নিয়ে। যেন বনবাসী রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।"

—"সড়কি? তীরধনুক? কী বলছেন আপনি?

—"ঠিকই বলছি। চলুন স্বচক্ষে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে আসবেন। এক মহিলা ছুটে আসছিলেন ডাকাতদের বাধা দিতে, কিন্তু তার স্বামী দুহাতে বউয়ের কোমর চেপে ধরে 'ওগো যেক না, ওগো যেও না" বলে চীৎকার করছিল।"

—"যাঃ। হতেই পারে না। মহিলা ছুটে আসছিলেন, আর ভদ্রলোক—"

—"চলুন না, হতে পারে কি পারে না জেনেই আসবেন।" বউদির ইস্পাত স্বরে বিব্রত দাদামণি বাধা দেন—

—"না না, এখন কী করে যাবেন? রাত প্রায় একটা বেজে গেল। এখন তাঁদের বিরক্ত করা—"

—"পুলিশের ওসব টাইম-বেটাইম নেই বুঝলেন। রঘুবীর। চা কী হলো? ও, এই যে। নিন চা-টা খেয়েই চলুন যাই। ছোটু সিংকো বোলো, গাড়ি নিকালনা। রামলাল আউর শম্ভু সাথমে চলেগা। টাইমে যানা হ্যায়। সীরিয়াস কেস। জলদি করো।"

৬

খটাখট। খটাখট। খটাখট। দমাদ্দম্।

—"কে? কে ওখেনে?" (স্ত্রীকণ্ঠ)

—"খুলো না বলছি। সাড়া দিও না। চুপ। চুপ।" [পুংকণ্ঠ]

—"সাড়া কেন দেব না? কে ওখেনে? দোর যে ভেঙে ফেলবে!"

—"খুলুন। খুলুন। পুলিশ।"

—"পুলিশ বলছে। খবদ্দার খুলো না। মিথ্যেকথা।" [পুং]

—"পুলিশই হও, আর ডাকাতই হও, দোর ভেঙে ফেলবার কী দরকার? কী চাই? এত রাত্তিরে হামলা কিসের?" [স্ত্রী]

—"দরজা খুলুন। ভয়ের কিছু নেই। পুলিশ।"

—"ভয়ের কিছু নেই, পুলিশ? পুলিশ মানেই ভয়ের কিছু।" [পুং]

—"আগে বলুন কোন থানা থেকে এয়েচেন, কী প্রয়োজন।" [স্ত্রী]

দমাদ্দম্। দমাদ্দম্। ঠাস্। দড়াম্।

—"ওরে বাপরে। তাইলে ভেঙেই ঢুকুন। আমি খুলব না।" [স্ত্রী]

এবার দাদামণি বললেন বউদিকে, "তুমি কথা বলে দেখ না? ওরা ভয়ে খুলছে না।" বউদি গলা খাঁকারি দিয়ে—"দিদি? আমরা। আমার মোটে ইচ্ছে ছিল না মাঝরাত্তিরে এভাবে আপনাদের বিরক্ত করা। পুলিশব্যাটারা শুনলে না। দেখুন না, জোর করে ধরে নিয়ে এসে হামলা কচ্চে। সেই ছিনতাই কেস।" দোর খুলে গেল। ভদ্রমহিলা। পেছন পেছন পুংকণ্ঠ—

—"একটাও কথা বলবে না। কোনো স্টেটমেন্ট দেবে না বলে দিচ্ছি, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা—এক্কেবারে সাইলেন্স।"

—"কী ব্যাপার?"

—"আপনি ছিনতাই করা দেখেছিলেন?"

—"ঠিক দেখিনি, তবে টের পেইছিলুম। যখন পালাচ্ছিল তখন দেখেচি। দুটো লোক। মোটর সাইকেলে চড়ে পালালো।"

—"সময় কত? তখন?"

—"এই দশটা-সাড়ে দশটা হবে।"

—"দশটা, না সাড়ে দশটা? ঠিক করে বলুন।"

—"থামুন মশাই। আমি কি ঘড়ি দেখিচি? ওই দশটা সাড়ে দশটাই লিখে নিন। খেয়ে উঠে পান সাজছিলুম।"

—"সোয়া দশটা লিখে নিন না।" পুংকণ্ঠ।

—"মোটরসাইকেলের রং কী ছিল। নম্বর কত ছিল?"

—"কালোই তো রঙ মনে হলো। অন্ধকারে কী নম্বর দেখা যায়?"

—"ছিনতাইকারীদের কেমন দেখতে?"

—"তারা কি আমার মেয়ের পাত্তর? যে যত্ন করে দেখব? ব্যাটারা হুশ্ করে বেরিয়ে গেল, পেছন থেকে দেখলাম। মুখটুকু দেখিনি। কালো-জ্যাকেট শাদা পেন্টুলুন। আরেকটার গায়ে চাদর।"

—"যাঁদের ছিনতাই করা হলো, তাঁরা ক'জন ছিলেন?"

—"স্বামী-স্ত্রী দুজন। বাজার করে ফিরছিলেন। বললেন তো বাজারের থলেটাও নিয়ে গ্যাছে। আশ্চায্যি!"

—"হেঁটেই ফিরছিলেন? স্বামী-স্ত্রী?"

—"না না। রিকশোতে। এই তো, ইনি আর উনি।"

—"জায়গাটা চিনিয়ে দিতে পারবেন? যেখানে ছিনতাই"—

—"কেন পারবো না? কতক্ষণ ধরে আংটি খোঁজা হলো সেখেনে।"

—"মানে?"

—"মানে, উনি বলছিলেন হীরের আংটিটা ওদের হাতে খুলে দেননি, কিন্তু সেটা ও'র হাতেও নেই। যদি পড়ে গিয়ে থাকে, তাই আমরা সবাই খুঁজছিলুম রাস্তায়।"

—"পার্নান?"

—"নাঃ। টর্চ ছিল না অবিশ্যি কারুরই।"

—"জায়গাটা একবার যদি কাইন্ড্‌লি—"

—"এত রাত্তিরে বেড়িও না বলছি—" (পুং কণ্ঠ)

—"তবে তুমিই যাও।"

—"আমি তো শুয়ে পড়িচি।"

—"তবে বাক্যি কেন বেরুচ্চে? চলুন দেখিয়ে দিচ্চি।"

—"আর কে কে বেরিয়ে এসেছিলেন?"

—"ঐ তো ওইখেনে ফ্ল্যাটবাড়ির অনেকেই বেরিয়েছিল। একজন তো একটা বর্শা না বল্লম কী যেন অস্তর নিয়ে বেরুল। যেন যাত্রাপার্টি।"

—"শুনলেন তো? বউদি। সড়কি-বল্লম ছিল কিনা? শুধু তাই নয়। বারান্দায় তীরধনুকও ছিল। ছিল না?"

—"হ্যাঁ ছিল। এক ছোঁড়া তীরধনুক নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করছিল।" মহিলা সায় দেন।

—"আপনার নাম? আপনার স্বামীর নাম? বাড়ির ঠিকানা?" শ্রবণমাত্র পুংকণ্ঠ মশারির অন্তরাল থেকে কঁকিয়ে উঠল।

—"দিও না। দিও না! কিছু দিও না। কিছু তুমি বলতে বাধ্য নও।

বলবে আমার ল্যাইয়ারের পরামর্শ না নিয়ে একটা কথাও বলব না।"

—"আহা, কিছু ভয় নেই। আপনার নামতো মিসেস মিত্র—" ও সি. বাড়ির বাইরে নেমপ্লেট পড়তে শুরু করে দেন। নাম-ঠিকানা আর গোপন করা গেল না। মহিলা বললেন—"চলুন চলুন জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে আসি। কাল সোমবার। আপিসের দিন। রাত বোধহয় দুটো বাজলো। তুমি শুয়ে থাকো। কড়া নাড়লে উঠে এসে দোরটা খুলে দিও দয়া করে।"

৭

জায়গা দেখাতে গিয়ে পুলিশ এতই চেঁচামেচি করলে, যে আবার প্রত্যেক বারান্দায় লোকজন বেরুলো। চেঁচিয়ে তাদের ডেকে পুলিশ বললে—"বল্লম নিয়ে কে নেমেছিলেন? শিগগির নেমে আসুন। বল্লমের লাইসেন্স আছে?" সমস্ত বারান্দা মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল।

—"রিকশো কোথায় ছিল?" বউদিকে প্রশ্ন করা হলো।

—"এইখানে।"

—"আপনারা কে কোথায় বসেছিলেন? কে ডাইনে কে বাঁয়ে?"

—"উনি রাস্তার দিকে, আমি ফুটপাতের দিকে। ডাইনে-বাঁয়ে জানি না। নিজে হিসেব করে নিন।"

—"রিকশোর মুখ কোনদিকে ছিল? পুবে না পশ্চিমে?"

—"এইদিকে। পুব-পশ্চিম জানি না। ওসব আপনি বুঝুন।"

—"মোটরসাইকেল কোথা দিয়ে এল?"

—"ঐ গলি দিয়ে। এইখানে থামল। এই গাছের নিচে।"

পুলিশ ইতিমধ্যে বারান্দাবাড়িতে গিয়ে দমাদ্দম্ দমাদ্দম্ শুরু করেছে। দরজা খুললো, স্লিপিংসুটে কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রলোক বেরুলেন। সঙ্গে স্ত্রী।

—"বল্লমের লাইসেন্স ছিল?"

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন।

—"দেখুন, ওগুলো শো-পিস্। উনি আগে তো নাগাল্যান্ডে পোস্টেড ছিলেন; তাছাড়া পুরুলিয়াতেও ছিলেন। নানারকম ট্রাইবাল জিনিসপত্তরই কিউরিও হিসেবে আমরা কালেক্ট করি। এও তারই একটা। এটা তো অস্ত্র নয়। ধার নেই। কেউ কখনো কিউরিওর লাইসেন্স করায়? আপনিই বলুন।" স্ত্রীর মাথা খুবই ঠাণ্ডা।

—"তবে ওটা নিয়ে নেবেছিলেন কেন, ডাকাত মারতে?"

—"সে বিপদের সময়ে লোকে তো হাতা-খুন্তি-ছাতা নিয়েও ছোটে—তার

জন্যে লাইসেন্স লাগে ?''

—''ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন ! এমনই কাণ্ড করছে এই পুলিশগুলো যাতে পাড়াপড়শীরা আর ভুলেও অন্যের সাহায্যে না বেরোয়। যেন ও'দেরই সব দোষ। ছিনতাইটাই গেল চুলোয়, বল্লমের লাইসেন্স নিয়ে পড়েছে। বলি, আগে তো জিজ্ঞেস করবেন ছিনতাইয়ের কথাটা, এত রাত্তিরে সেইজন্যেই তো এসেছেন ? না কি ?'' বউদির চাঁছাছোলা স্পষ্ট গলা ঝনঝন করে রাত্তিরের হিমেল বাতাস কেটে বেজে ওঠে।—''এমন করলে আর কি ও'রা সাক্ষী দেবেন ? ও'রাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদর্শী—বারান্দা থেকে পুরোটা দেখেছেন—নেহাৎ সড়কি-বল্লমগুলো দড়ি দিয়ে দেয়ালের হুকে বাঁধা ছিল। খুলতে দেরি হয়ে গেল বলেই তাই সময় মতন নেবে এসে ডাকাতি থামাতে পারেননি—''

''কী কী দেখেছেন ? কে কে দেখেছেন ? দুজনেই দেখলেন ?''

—''আগে আমিই দেখতে পাই। তারপরে খোকাকে আর ও'কে ডেকে এনে দেখালুম—কালো রঙের মোটরসাইকেলে করে দুটো লোক ঐ গলি থেকে বেরিয়ে রিকশা থামিয়ে এ'দের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিলে।''

—''যথাসর্বস্ব কেড়ে নিলে, আর আপনারা চুপচাপ দেখে গেলেন ? বাধা দিলেন না ?''

—''দোতলা থেকে কী করে দেবো ? ঝাঁপিয়ে পড়বো ?''

—''চেঁচাতে পারতেন তো ? তাতেই পালিয়ে যেতো।''

—''আর যদি গুলি করে দিতো ও'দের ? পাইপগান ছিল। ঐ ভদ্রলোকের পেটে তো চেপেই ধরেছিল। চেঁচালে যদি ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতো ?''

ভুঁড়ির প্রসঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠে দাদামণি বললেন—''রাত দুটো বাজে মশাই। শুতেটুতে হবে না ? আপনাদের উইটনেসের তো সব কথাই মিলছে। আর কতক্ষণ ? এবার এ'দের ছেড়ে দিন ?''

—''আর দুটো প্রশ্ন। টাইম ক'টা ছিল ?''

—''এই দশটা-সাড়ে দশটা ?''

—''দশটা, না সাড়ে দশটা ?''

—''ধরে নিন দশটা পনেরো।'' এতক্ষণে স্বামী কথা বললেন।

—''লোকগুলোর পরনে কী ছিল ?''

—''একটা লোক চামড়ার কোট পরেছিল, অন্যটার গায়ে র‍্যাপার জড়ানো ছিল। ডার্ক-রঙের।''

''বয়স কত হবে ?''

—''বুঝতে পারিনি। এটা তিন নম্বর প্রশ্ন হয়ে গেল কিন্তু।'' মহিলা বললেন।

—''হোকগে। তীরধনুক নিয়ে কে বেরিয়েছিল ?''

—"খোকা, খোকা। আমার ছেলে। ইস্কুলে পড়ে। খেলনার তীরধনুক।। সে এখন ঘুমুচ্ছে। খেলনারও লাইসেন্স চাই নাকি?"

বউদি-দাদামণি জানেন, খেলনা নয়। তবুও চুপ করে থাকেন। কার্যত খেলনাই তো। অস্ত্রও তো নয়। জানেই না এরা ট্রাইবালদের তীরধনুক কীভাবে ছুঁড়তে হয়!

—"অঃ, তাই বলুন। বাচ্চাছেলের তীরধনুক? ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই তো বলি, তীরধনুক, সড়কি, বল্লম এসব এল কোত্থেকে? আপনাদের নাম-ঠিকানাটা? ইনভেস্টিগেশনে—"

—"ইনভেস্টিগেশনটা কি হবে বল্লম আর তীরধনুক কোথা থেকে এল, সেই বিষয়ে?"—মহিলার কাটাকাটা কথা।

—"না, না, না, ওসব চুকেবুকে গেছে। এঁরা আই. জি-র ফ্রেন্ড—বুঝলেন না, আপনাদের কোনোরকম ভয়ের কিছু নেই। ফরম্যালিটির জন্যে নেম-আড্রেসটা তো চাই-ই। উইটনেস তো আপানারা? ছিনতাই কেসেরই ইনভেস্টিগেশন—"

৮

সক্কালবেলাই বাচ্চুদার টেলিফোন। সঙ্গে সঙ্গে বউদি ডিটেলস দিয়ে দিলেন, কানে দেশলাই কাঠি থেকে শুরু করে বল্লমের লাইসেন্স পর্যন্ত। অর্থাৎ পুলিশের শ্রাদ্ধ করলেন, বাচ্চুদা অবিচলিত। হাস্য সহকারে বললেন, "থানা-টানায় ওরকম এটুআটু হয়ই। কাজের বেলায় ঠিকই করবে, যা যা করবার।—যাবো বিকেলের দিকে।"

দাদামণির গা-ম্যাজম্যাজ করছে। শুতে-শুতেই তিনটে বেজে গেছে। ফের সকালে উঠে বাজার করতে হয়েছে। কালকের দ্বিগুণ দামে। গা কর্‌কর্‌ও করছে। তাই দাদামণি আপিস না গিয়ে, এককাপ চা নিয়ে সোফায় শুয়ে আছেন। আজ বউদিও ইশ্‌কুলে যাননি, আসলে মনটাও খারাপ। যে আংটিটা ফুলশয্যায় বউদিকে পরিয়ে দিয়েছিলেন দাদামণি সেইটে আসলে দাদামণির ঠাকুর্দাদা তাঁর নিজস্ব বউকে উপহার দিয়েছিলেন। ঠাকুমাই আদর করে বড়-নাতির আঙুলে পরিয়ে যান নিজের বরের দেওয়া সোহাগের আংটিটি। বয়েস তো হচ্ছে, ছেলেরা বড় হয়ে গেছে। আজ দাদামণির ঠাকুমার দেওয়া আংটির জনে হুহু করে মন কেমন করছে। কীভাবেই জিনিসটা চলে গেল। কিছু শাকসব্জী আর আজেবাজে নকল গয়নার সঙ্গে। আশ্চর্য! ছেলেদের কপালে নেই আর-কি বংশের এয়ারলুম পাওয়া। ওর জন্যে আলাদা ভাগ্য করে আসা চাই!

এমন সময়ে ফোনটা গেল বিগড়ে।

হঠাৎ একটানা ক্রু-র-র করে বেজেই চলল, যেন জেলের পাগলাঘণ্টি। কেমন একটা অশুভ সংকেতের মতো, দাদামণির শ্যালক বিদেশে—কোনো দুঃসংবাদ নয় তো? বুক ধড়াস করে উঠলো। যদি—ফোনটা ঠিক একটা ডেনজার সিগন্যালের মতো শব্দ করেছে, বুক ধড়ফড় করানো। তবু, না ধরেও আর উপায় নেই।

—"একী বিতিকিচ্ছিরি শব্দ কচ্চে ফোনটা?" এবার বউদি স্বয়ং রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছেন, হাতে একটা সিম। ফোন দাদামণি ধরেই ফেললেন—"হ্যালো!"

—"হ্যাল্লো! হ্যাল্লো! লালবাজার বলছি! লালবাজার!"

—"আঁঃ? লালবাজার? সর্বনাশ! কী হয়েছে?"

—"ডঃ চক্রবর্তী আছেন? ডঃ চক্রবর্তী? ডঃ চক্রবর্তী?"

—"আছি, আছি। কথা বলছি (খোকা-বাবলুর মুখগুলো চোখে ভেসে উঠেছে)।"

—"কমিশনার সাহেব কথা বলবেন। হোল্ড অন করুন। হোল্ড অন! এই যে।"

—"তারপর অনন্ত নৈঃশব্দ্য। অবশেষে একটি অশেষ মার্জিত কণ্ঠ ও-প্রান্তে শোনা গেল—"

—"হ্যালো, ডঃ চক্রবর্তী? আমি অনুপ বোস বলছি। বলুন তো কী ব্যাপার? কালরাত্রে আপনাদের নাকি আংটি, ঘড়ি, পার্স, হ্যান্ডব্যাগ সব ছিনতাই হয়ে গেছে?"

—"কি আশ্চর্য। কে বললে? বাচ্চু নির্ঘাৎ? সত্যি—"

—"না, না, এই আজকে সকালে আমার টেবিলে যেসব ফাইল এসেছে, সবচেয়ে ওপরেই আপনার ফাইলটা। ঠিক আছে। ডোন্ট ওয়ারি, বেলা তিনটের সময়ে আসছি। দুজনেই একটু থাকবেন কিন্তু।"

—"আপনি? নিজে আসবেন? তুচ্ছ ঘটনা, কী দরকার?"

—"না না তুচ্ছ নয়, মোটেই তুচ্ছ নয়, ইটস আ কোয়েশ্চেন অব ল অ্যান্ড অর্ডার—ওদিকটায় প্রায়ই ছিনতাই হচ্ছে, অলমোস্ট প্রতিদিনই—মাঝে মাঝে সরেজমিনে তদন্তে না গেলে হয় না, সাইটে একবার গিয়ে পড়াই দরকার এবারে—"

—"বেশ বেশ। চলে আসুন। এসে পড়ুন। কিন্তু সত্যিই কি স্বয়ং পরিদর্শনের মতো জরুরি এ ব্যাপারটা?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, জরুরি—তিনটের সময়ে আসছি তাহলে? ও কে?"

—"ও কে !···অ গিন্নি ! কমিশনার সাহেব আসবেনই তিনটের সময়ে। আটকানো গেল না।

—"আটকাচ্ছিলে কেন ? আসুন না অনুপদা।"

—ছিনতাই কেসের জন্যে কমিশনারকে—বুঝলে না ? খুন নয়, রেপ নয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়, এই তুচ্ছ ব্যাপারে মানে, একটু লজ্জা করছে এই আরকি—"

—"তুচ্ছ বলে তোমার মনটা খারাপ-খারাপ মনে হচ্ছে ?"

—"খুনজখম-রেপ হলেই যেন খুশি হতে ? নিদেনপক্ষে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা—"

—"দাঙ্গাহাঙ্গামা তো ঘরেই টোয়েন্টিফোর আওয়ার্সই দেখছি, গিন্নি ওকথা হচ্ছে না। বলছি, তোমার অনুপদা আসবে, তোমাকেও বাড়িতে থাকতে বললে। তুমি আবার প্রাণের দুঃখ ভুলতে ম্যাটিনিতে অমিতাভ বচ্চনের খোঁজে বেরিয়ে যেও না যেন।"

—"যত্তো বাজে কথা।" বউদি নিজেই এবার দুকাপ চা নিয়ে এসে বসলেন। আরেক কাপ চা দেখেই দাদামণির বলবৃদ্ধি হলো—

—"টেক কেয়ার, টেক কেয়ার গিন্নি—ভেবেচিন্তে কথা বলো—সুপারস্টার নিয়ে কথা।"

—"অত ভাবনাচিন্তার কী আছে। যত্তো ধুমধাড়াক্কা আর মারদাঙ্গা !"

"আঁহ্ আঃ !" দাদামণি সদ্য প্রাকটিস্ করা মার্কিনি কায়দা ছাড়লেন।" ওটি বোলো না গিন্নি, ইউ আর গিভিং অ্যাওয়ে ইওর এজ—ওটা বললেই ডেটেড হয়ে গেল। কোনদিন বলবে ডগ্লাস ফেয়ারব্যাংকের কাছে কেউ লাগে না—"

—"লাগে নাই তো। দেখেছিলে, 'থীফ অফ বাগদাদ' ?"

—"উঃ", যন্ত্রণাতাড়িত মূর্তি দাদামণি বলেন, "আর বোলো না গিন্নি ! আমাকে একটুও ইলিউশান রাখতে দাও। বলো ডাস্টিন হফম্যান !"

"—তিনটের সময়ে আসবেন মানেই চা খাবেন। তা, কী করবো ? ফুলকপির সিঙাড়া, না কড়াইশুঁটির কচুরি ?"

—"সেসব তো ছিনতাই হয়ে গেছে।"

—"বাজারসুদ্ধু তো ছিনতাই হয়নি। পকেটের ন'শ টাকাও ছিনতাই হয়নি। যাও, কিনে আনোগে। কজনের মতন তৈরি করবো ? ছ-সাত জন না দশ-বারো জন ? জনাকুড়ির মতোই করি কি বলো ?"

—"কী করবে অত দিয়ে ? আসবে তো কমিশনার, সঙ্গে নিশ্চয় ও. সি. আসবে আরও দু চারটে চামচা-কনস্টেবল আসবে কয়েকটা, তা ডজনখানেক লোক হয়েই যাবে। আমরাও আছি চারজন। ব্যানার্জিকেও খাওয়ানো উচিত, ওঁর গাড়ি করে অত রাত্তিরে—ঐ ধরো, বিশ বাইশ-ই ধরো—"

—"কচুরি না সিঙাড়া ? কড়াইশুঁটি, না ফুলকপি ?"

—"তোমার যেটা তৈরি করতে সুবিধে—"

—"দুটোই অসুবিধের। যাই হোক, কড়াইশুঁটির কচুরিই হোক, ওটা খোকা-বাবলু ভালোবাসে। আর বেশি করে নলেনগুড়ের সন্দেশ এনো।"

—"ভালো চা আছে তো ঘরে?"

—"তবু, আটু ভালো চা এনো। অনুপদা এই প্রথমবার আসছেন।"

—"তোমার মাসতুতো বোনের ভাসুর বলেই—"

—"সেজন্যে নয়। কমিশনার অফ পুলিশ বলে কথা। আর শোনো, বাচ্চুদাকেও আসতে বলে দাও। উনি ফোন না করলে পুলিশ ব্যাটারা নড়ে বসত না! উনিই আমাদের বল-ভরসা।"

—"পুলিশ আসছে ইনভেস্টিগেশনে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ছিনতাইটাকে টি-পার্টি দিয়ে সেলিব্রেট করছ। এমন মেতে উঠেছ ঠিক যেন কোনো উৎসব হচ্ছে। যেন হীরের আংটি খোয়া যায়নি, বরং লটারি পেয়েছো। বিচিত্র বটে মেয়েমানুষের চরিত্র।" —দাদামণি থলে হাতে চটিতে পা গলান। মুখে যাই বলুন, পুরুষমানুষের চরিত্রও কিছু কম বিচিত্র নয়।

৯

ঠিক তিনটের সময়ে দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল। দু'জন কনস্টেবল। সেলাম করে বললে—"কমিশনার সাহাবনে গাড়ি ভেজা।"

—"তিনি কোথায়?"

—"সাইট মে হ্যায়। আপ উধর চলিয়ে। মেমসাবকো ভি যানা হ্যায়।"

—"কে নিয়ে গেল, সাইটে? জায়গা দেখাল কে?"

—"ও. সি সাহাবনে দিখায়া।"

সাইটে পৌঁছে দেখা গেল হৈহৈ কাণ্ড, রৈরৈ ব্যাপার। পুলিশের জীপ থেকে দাদামণিরা যেই ভূমিষ্ঠ হলেন সাঁইত্রিশজন খাকি-পরা পুলিশ একসঙ্গে তাঁদের স্যালুট দিল। দাদামণি সমাজে বেশ মান্যগণ্য ব্যক্তি বটে, কিন্তু এ-রকমটি জীবনে কদাচ হয়নি। খুন নয়, রেপ নয়, দাঙ্গা নয়, ছিনতাই-এর সাইট পরিদর্শনে কমিশনার স্বয়ং এসেছেন, এও তো এই থানার জীবৎকালে অন্তত কখনো ঘটেনি। অনুপ বোস অসামান্য ভদ্রলোক, বাচ্চুদাও আছেন। এক কোণে দাঁড়িয়ে আপনমনে সিগারেট খাচ্ছেন। পরনে সিবিলিয়ান ড্রেস। ডিউটিতে নেই, বোঝাই যাচ্ছে। অনুপবাবু বললেন যদিও সাইট দেখা হয়ে গেছে তবুও ফরমালিটির জন্য ওঁদের ডেকে আনা। একবার মিসেস চক্রবর্তীকে শুধু ক্রস এগজামিনেশন করতে হবে। পাড়াপড়শী বলতে বল্লমধারী স্ত্রী ও সেই ডাকাত ধরতে ছোটা ভদ্রমহিলাও দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের

কর্তারা অফিসে। গিন্নিদের ক্রস এগজামিনেশন হয়ে গেছে। না, কোনো অমিল পাওয়া যায়নি, থ্যাংক গড। তাঁরা খুবই চালু ব্যক্তি দুজনেই। পুলিশের পরোয়া করেন থোড়াই। দাদামণি বললেন, "সকলে মিলেই চলুন, একটু আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। একটু চা খেয়ে যাবেন। চারটে বাজে, ইট্'স টি-টাইম।" বল্লমধারীর স্ত্রী আসবেন না বললেন, ছেলের ইশ্‌কুল থেকে ফেরার টাইম। অন্য মহিলাটি বললেন, "চলুন, চা-টা খেয়েই আসি।" কমিশনার বারকয়েক গাঁইগুঁই করলেও বাচ্চুদার উৎসাহে রাজী হয়ে গেলেন। পুলিশ কমিশনার কখনও একা আসেন? সঙ্গে দু'জন বিভিন্ন ডি. সি., একজন ডি. সি. ডি. ডি., একজন ডি. সি. (সাউথ), একজন এ. সি. (সাউথ), আরেকজন এ. সি. (কে যে কোথাকার) এবং প্রচুর পুলিশ, জনতা। সেই ও. সি. ও আছেন। মোট সাঁইত্রিশ জন। বউদি ফিসফিস করে দাদাকে বললেন—"অতজনের কচুরি হবে না তো? দশজনের মতন কচুরি কিনে আনো।" দাদামণি ফিসফিস করে বউদিকে বললেন—"সবাই খাবে না, ওতেই হয়ে যাবেখন…"

বাচ্চুদা আর অনুপবাবু বসে পড়বার পরে দেখা গেল ডি. সি. ডি. ডি. (সাউথ), এবং এ. সি. রা দু'জনে, এঁরাই কেবল বসলেন। কমিশনার সাহেব এবং আই. জি. সাহেবের সামনে বসে পড়া সহজ নাকি? মহিলা রান্নাঘরে চলে এলেন বউদিকে সাহায্য করতে। বাকিরা সবাই দাঁড়িয়েই রইলেন। কেউ কেউ ঘরে, আর অন্যেরা সকলেই করিডরে। কিছুতেই তাঁদের বসানো গেল না। স্বয়ং কমিশনার, আই. জি.—ছি ছি ছি—এঁদের সামনে বসে থাকা? বউদি আর মিসেস মিত্র (সেই মহিলার নাম মিসেস মিত্র) চা কচুরি-সন্দেশ নিয়ে এলেন। কমিশনার, আই. জি. ও ডি. সি, রা চা-কচুরি নিলেন। এ. সি.-রা কিছুই নিলেন না। এদিকে বউদি আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে খোকন-বাবলুকে পাঠিয়ে নানারকমের কাপডিশ চেয়ে আনিয়ে সাঁইত্রিশ কাপ চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তাছাড়া নিজেরাও ক'জনে আছেন, খান চল্লিশেক চা হবেই। কেউ চা খাবেন না শুনে বউদি ক্ষেপে লাল। "সে কী মশাই? আজকের দিনে দুধ সস্তা না চিনি সস্তা? এত গুচ্ছের চা করালেন কিসের জন্য? খেতেই হবে চা! আপনাদের আইন যা হোকগে—প্রোটোকলের নিকুচি করেছে—" অনুপ বোস অতীব ভদ্রলোক। তিনিও বললেন—"খান না মশাই খান, কেন লজ্জা পাচ্ছেন? চায়ের সময়ে চা পাচ্ছেন, খাবেন না এ কেমন কথা?"

এ. সি.-রা অতএব গুটিশুটি চায়ের কাপ তুলে নেন। বউদি এবার খোকন-বাবলু সমেত দণ্ডায়মান পুলিশদের চা খাওয়াতে এইসা প্রচণ্ড জেদাজেদি শুরু করলেন যে ক্রমে-ক্রমে প্রত্যেকেই বাইরে করিডরে বসে গিয়ে চা খেতে থাকেন।

ঘরে কেবল এ. সি., ডি. সি. গণ, আই. জি. আর কমিশনার। কমিশনার বললেন —"মিসেস চক্রবর্তীকে এবার একটু ক্রস এগজামিন করতে পারি কি?"

—"কচুরি খেতে খেতে করতে পারেন। যেন ঠাণ্ডা হয়ে যায় না।" বললেন বউদি।

—"দিদি কি নিজেই করলেন? দারুণ হয়েছে কিন্তু!"

উচ্ছ্বসিত মিসেস মিত্রের কথার ওপরে হঠাৎ কথা বলে ওঠেন অনুপ বোস— তাঁরও উচ্ছ্বাস কম নয়—

—"থ্যাংকিউ মিসেস মিত্র। আপনাদের মতো সাহসী পাড়াপড়শী নেই বলেই এত ছিনতাই সহজ হয়েছে।"

—"কিন্তু আমাদের স্বামীদের তো দেখেননি? তাঁরা এখনও আপিসে। আঁচল ধরে টেনে না রাখলে ছিনতাইটা আটকানো যেত।"

লজ্জায় অনুপবাবু কথা পাল্টালেন—"মিসেস চক্রবর্তী? ঠিক ক'টা নাগাদ ঘটনাটা ঘটল? মনে পড়ে?"

—"এই দশটা-সাড়ে ..." দাদামণি চোখ পাকাতেই বউদি সামলে নেন— "স্যার, ঠিক সোয়া দশটায়।"

—"ডক্টর. চক্রবর্তী, আপনার স্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করবো দয়া করে তাঁর মুখে কথা জুগিয়ে দেবেন না যেন। উই নীড হার ওন রেসপন্সেস।"

—"আপনি তো আমার স্ত্রীকে চেনেন না। যদিও সম্প্রতি তিনি আপনার ছোটো ভাইয়ের মাসতুতো শ্যালিকা হয়েছেন। তাঁর মুখে কথা যুগিয়ে দেবার মতো ভাগ্য করে আমার জন্ম হয়নি। তিনি জিব নেড়েই ছিন্‌তাই করতে পারেন। ভোজালি-বল্লম লাগে না।"

—"যতো বাজে কথা! তাহলে আর ছিনতাই হলো কেন? জিব নেড়েই তো ডাকতদের তাড়িয়ে দিতুম।"

—"তারা তো তোমার হতভাগ্য স্বামী নয়।"

—"তা, হতভাগ্য স্বামীকেও তো তাড়াতে এখনো কৈ পারিনি। দিব্যি বহাল তবিয়তেই কড়াইশুঁটির কচুরি ওড়াচ্ছেন আর বউয়ের নিন্দে গাইছেন মনের আনন্দে। পঁচিশ বছর তো চেষ্টা কম করিনি।"

—অনুপ বোস যে কী করে পুলিশ হয়েছেন তা এক সরকার ভগবানই জানেন। স্বামী-স্ত্রীর এই নিঃশঙ্ক অসঙ্কোচ বিবাদে তাঁরই মুখ শরমে লাল হয়ে উঠল। তিনি কথা ঘোরাতে বললেন—

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা, মোটরসাইকেলটার কোন মেক্ ছিল?"

"সেই এককথা! রাজদূত; রাজদূত! উনি দেখেছেন। আমি অবিশ্যি চিনি না।"

—"চেনেন না?"

—"আমি মোটরসাইকেল, স্কুটার আর মোপেডের মধ্যে তফাৎই বুঝি না। তফাৎ আছে না কি কিছু?" নির্ভীক উত্তর।

—"আই সী!" অনুপবাবু হঠাৎই আর প্রশ্ন খুঁজে পেলেন না। তারপর বললেন, অনেক ভেবেচিন্তে ঃ

—"গাছটা কী ছিল?"

—"আমি কি বটানিস্ট? না কি রাস্তার ধারের প্রত্যেকটা গাছপালার গায়ে আপনারা আজকাল লেবেল এঁটে রাখেন? এসব আজেবাজে প্রশ্ন কেন করেন? গাছ দিয়ে কী হবে বলুন তো? তবু গাছে ফুল থাকলেও যদিবা চেনা যেত। আপনিও তো এইমাত্র গাছটা দেখে এলেন। দিনের বেলায় কটকটে রোদে। কী গাছ বুঝলেন? বলুন তো কী গাছ?" আকর্ণ রক্তিম হয়ে অনুপ বোস অন্য প্রশ্ন করলেন—

—"অত রাত্তিরে হঠাৎ রিকশা করে ফিরছিলেন-ই বা কেন বাজার থেকে? জানেন তো ওতে ছিনতাই হবার চান্স থাকে।"

বউদি বললেন ঃ

—"প্রথম কথা, বাজার থেকে ফিরছিলুম না। ফিরছিলুম বাপের বাড়িতে রুগী দেখে। পথেই সস্তায় পেয়ে বাজারটা করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় কথা, রিকশা করে ফিরব না তো কি পুলিশের জীপে চড়ে ফিরবো? যাতে ছিনতাই না হয়? ওঁকে তো বলছিই একটা হেলিকপ্টার কিনতে ; তা আর কেনা হচ্ছে কই? দেবো, আরেকটি কচুরি?"

বোধহয় অনুপ বোস একটু বাক্যিহারা বোধ করছেন। তাই ঘাড় নেড়ে 'নাঃ বললেন কি 'হ্যাঁ' বললেন ঠিক বোঝা গেল না। বউদি দুটো কচুরি দিয়েই দিলেন। এমন সময় দোরে কলিংবেল। দাদামণি দোর খুলতেই তিনটি কিশোর ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কলকণ্ঠে বলে উঠল—"কী ব্যাপার কী, মেসোমশাই? চান্দিকে এত গুচ্ছের মামা যে? একগাদা খোচরও যেন দেখছি —যাঃ বাবা—ভ্যানতাড়া নিতে এসেছে তো? ওদের সঙ্গেই তো কমিশন সিস্টেম থাকে, মেসোমশাই! পুলিশকে বলে কী হবে? ওরা জীবনে ধরবে? বাবলু বলেছিল, আমরা খোঁজ নিয়ে এসেছি। পঞ্চাননতলা নয়, কেয়াতলাও না। ওদের সেদিনকে, মানে গতকালকে কোনো অ্যাকশনই ছিল না। যদ্দুরে মনে হয় কাঁকুলিয়ার পার্টি"—

"এরা করা?" হঠাৎ বাচ্চুদা চা সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করেন। দাদামণি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, "ওরা? বাবলুর বন্ধু। ফুটবল কিনবে বলে চাঁদার পয়সা চেয়েছিল, সেই বিষয়ে কথা বলছে—"

—"পঞ্চাননতলা, কেয়াতলা কী সব যেন বলল?"

—"ফুটবল ক্লাব, ফুটবল ক্লাব। সব পাড়ায়-পাড়ায় ফুটবল ক্লাব থাকে তো?

সেইসব ক্লাবের কথা বলছে। রে বাছারা, তোরা এখন খেলতে যা। আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই, বরং পরে আসিস।"

ছেলেগুলো বেরিয়ে গেল। যাবার সময়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আগাপাশতলা বিষনজর বুলিয়ে গেল পুলিশ কমিশনার, আই. জি., এ. সি.-ডি. সি. সব্বার ওপরে। সে-নজরে শরীর বরফ হয়ে যায়।

দরজার দুধারে দুজন কনস্টেবল ছিল। একজনের গোঁফ দুধে-ধোয়া সাদা, চামড়ায় এত আঁকিবুকি, যে মনে হয় চাকরিতে ঢোকার সময়ে দু-কুড়ি বছর কম লিখিয়েছিল। সে হঠাৎ মহাউল্লাসে হাত শূন্যে নেড়ে বলে উঠল—

—"বাবু! ইয়ে চিস্‌কো পাকড়া হ্যায় না আপ, ইয়ে খাসবাত্ত বাতা দেগা। হম্‌সে বাঢ়িয়া খবর ভেজেগা উও। সব্‌সে আচ্ছা সোর্স হ্যায়—ছিন্‌তাই-পার্টিকো বাবালোগসে ইনকো দোস্তি হোতা—আজকাল তো ছিন্‌তাইপার্টি গরমিন্ট কার্টরমে বি বন্‌তা—ট্যাবলিট খানেকো পৈসা উঠাতা হ্যায়, সারে ডাকুলোগ পারিলিখি বালোঁক-বচ্চোঁ, আনপঢ় গরীব আদমি থোড়ী হ্যায় উও ইয়ে যো বাবালোগ আয়া হায় না, একদম সাচ্চা খবর বাতা দিয়া, কাল রাতকো ইয়া পঞ্চাননতাল্লামে ইয়া কেয়াতাল্লামে—কোঈবি এক্‌সান নাহী থা—থানাকো খবর বি্‌ ওহী হ্যায়—উস্‌কো কুছ পৈসা দেয়া করো, ওহী পকড় দেগা মাল—"

এবারে অফ-ডিউটি সিবিলিয়ান পোশাকের আই. জি. কড়াইশুঁটির কচুরি থেকে জেগে উঠে চেঁচালেন—

—"ফুটবল কিনতে এসেছে না ছাই! রামদেও। পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো উস্‌কো —ভাগ্‌তা হ্যায়—উওবি ছিনতাই পার্টি—পাক্‌ড়ো—"

"হো সাক্‌তা সাব, জরুর! লেকিন আব তো উসনে কুছ কিয়া নাহি—জী সাব—কৈসে পকড়ু?"—রামদেও বিনীত হাতজোড় করে।

—"জ্বালিয়ে খেলে?" বউদি এবার ফিল্‌ডে নামেন—দুটো নলেনগুড়ের সন্দেশ আই. জি.-র প্লেটে দিয়েই খিঁচিয়ে ওঠেন—"বাড়িতে কি লোকজন আসতে পারবে না? ওরা সবাই খোকন-বাবলুর বন্ধু।"

—"তবে তো খোকন-বাবুলকেও ধরতে হয়। হতেই পারে ওরা পাড়ার মাস্তানদের চেনে, তা'বলে ওরাও মাস্তান? আপনারাও তো সব চোর-ছ্যাঁচোড়দের চেনেন, আপনারাও কি চোর-ছ্যাঁচোড়?"

কমিশনার, বাচ্চুদার আকস্মিক কর্তব্যবোধে যত না বিচলিত, বউদির অকস্মাৎ এহেন "রূপ তেরা মস্তানা" মূর্তি দেখে একেবারে ঘাবড়ে গেলেন। মরীয়া হয়ে কথা ঘোরাতে ব্যস্ত বয়ে পড়লেন রামভন্দর অনুপ বোস। বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা পেন্টিংয়ের অ্যালবাম তুলে নিয়ে বললেন—"ফ্রেঞ্চ ইম্‌প্রেশনিস্টস্‌? অদ্ভুত কালারের সেন্স ছিল সত্যি ওদের"—

অমনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন জাতীয় ঐতিহ্যবাদী বাচ্চুদা ঃ

—"কেন ? মধুবনী পেন্টার্সদের কালারের সেন্স নেই ? সেও কি একেবারে আশ্চর্য নয় ?" দাদামণি নিশ্চিন্ত হয়ে আড়চাউনিতে বউদিকে ইশারায় বললেন —"আরেক প্রস্থ চা হয় না ?" বউদিও বিনাবাক্যে চক্ষুদ্বারা জানালেন—"না। মোস্ট ডেফিনিটলি হয় না।" ডাকাত ধরনেবালী মিসেস মিত্র এই বাক্যালাপ নির্বিবাদেই ফলো করতে পারলেন এবং সশব্দে রায় দিলেন—"চল্লিশ কাপ চা করবার পরেও যারা আবার বউকে চা করতে বলতে পারে, তারা ছিনতাই-কারীদের চেয়েও সমাজের পক্ষে ভয়াবহ—তাদেরই পুলিশে দেয়া উচিত"—সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে আই. জি., কমিশনার, ডি. সি.-বৃন্দ এবং এ. সি.-বৃন্দ অবাক হয়ে আপত্তি করে বললেন—এমন ঐকতান ভুখামিছিলেও চট্ করে দেখা যায় না। "না, না, না, কে বলেছে ফের চা করতে ? পাগল নাকি ?" দাদামণি চোরের মতন বললেন—"না, এই মানে, আমিই একটু ভাবছিলাম যদি আরেকবার"—

এর ফল হলো টুপি মাথায় দিয়ে পকেটে হাত পুরে লম্বা হয়ে অনুপ বোস উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সব্বাই। খটাখট স্যালুট করলো চোর-ধরা দুই সেপাই।

—"আচ্ছা, আজকে তবে চলি। থ্যাংকিউ। লালবাজারে যখন আইডেন্টি-ফিকেশন প্যারেড হবে, কষ্ট করে তখন একবার যেতে হবে কিন্তু।"

—"নিশ্চয়। নিশ্চয়। গিন্নি যাবেন।" দাদামণি স্মার্টলি বলেন।

—"আপনাকেও যেতে হবে যে"—

—"কিন্তু আমি কি পারবো ? আমি অত ভাল করে দেখিনি।" হঠাৎ দাদামণির স্মার্টনেস উধাও।

—"খুব পারবে। লোকটা তোমার বুকে অতক্ষণ ভোজালি চেপে ধরে রইলো, আর তুমি তার মুখখানা ভুলে যাবে ? আচ্ছা ক্যালাস মানুষ তো ! আরেকজন তোমার ঠাকুদ্দাদার কমলহীরের আংটিখানা ছিনিয়ে নিলে। তাদেরকে চিনতে পারবে না ? ডেন্‌জারাস লোক বাপু তুমি।" বউদির এক ধমকেই শোনা গেল দাদামণি বলছেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় যাবো।"

গণ্যমান্য পুলিশবাহিনী বেরুতেই, করিডরে সাঁইতিরিশজনের বুটে-বুটে স্যালুট। তারপরেও মজা ছিলো। নিচে নেমে যেই জীপে উঠতে যাচ্ছেন কমিশনার সাহেব, পার্কের গায়ে হেলান দিয়ে বিড়ি খাচ্ছিলেন, এমন কিছু আজেবাজে ফালতু লোক হঠাৎ অ্যাটেন্‌শন হয়ে গিয়ে খটাখট স্যালুট মেরে দিয়ে। কমিশনার মৃদু হাসলেন বউদি ও মিসেস মিত্র চোখাচোখি বিস্ময় বিনিময় করতেই দাদামণি নেহাৎ কৃপার চোখে তাকিয়ে তাঁদের জানালেন—

—"ওরা হচ্ছে প্লেনক্লোদস্‌মেন। সাদাপোশাকের পুলিশ। এও বুঝতে পারলে না ! এবার থেকে পাড়া পাহারা দেবে !"

১০

পুলিশের গাড়িগুলি চলে যেতেই বউদি পাড়াপড়শীর যত কাপড়িস ধুয়ে ফেরত দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঠিকের লোক মেনকা এসেছে। ঘরবাড়ি ঝাঁট দিয়ে দিচ্ছে। একগাদা বুটজুতোর ধুলো হয়েছে বসাব ঘরে। শোবার ঘর ঝাঁট দিতে দিতে মেনকা চেঁচালো—"বউদিদি!—ইটি আবার কী? অ, বউদিদি? এটাই তোমার আংটি লয়? এই তো আল্লার নেচে পইড়েছিলো?" বলতে বলতে বউদির ছাড়া-ব্লাউজ ইত্যাদির বান্ডিল আর কমলহিরের আংটিটা এনে হাজির করলো রান্নাঘরে। মেনকার হাতে হীরের আংটি দেখেই বউদির চোখমুখে ভয় আর শোক উথলে উঠলো। কোথায় গেল তাঁর সেই বাঘিনীর মূর্তি—কোথায় গেল সেই সদা-সর্বদার অনমনীয় কনফিডেন্স—যা নিয়ে তিনি ছিনতাইবাজদের পেছনে চেঁচাচ্ছিলেন—"অন্তত মার্কসগুলো দিয়ে যাবেন তো?"

বামালসমেত ধরা পড়া চোরের মতো অসহায় চোখে বউদি প্রায় কেঁদে ফেললেন—"সর্বনাশ! এখন কী হবে? ওগো, থানায় চলো। রিপোর্টটা এক্ষুনি বদ্‌লে আসতে হবে। আংটিটা ঘরের ভেতরেই পড়ে যে? পুলিশে তো মিথ্যে রিপোর্ট করা যেতে পারে না, এক্ষুনি চলো। জামাটার খাঁজে তখন কোথায় ঢুকে গেছলো। কিছুতেই খুঁজে পাইনি, জামার সঙ্গেই কখন পড়ে গেছে। ওদিকে এফ. আই. আর. হয়ে গেছে।"

—"থামো দিকিনি!" দাদামণির গলায় এতক্ষণে সুন্দরবনের যোগ্য হুংকার এসেছে।

—"আরো মোটা হও। আরো ঘুমোও রোববার দুপুরে। এরপর মুখ দেখাবে কী করে? এফ. আই. আর. কেউ বদলায়? ও ঘড়ি-সব্জী কিছুই পাওয়া যাবে না, আংটি তো নয়ই—এখন রিপোর্ট বদলাতে গেলেই বরং প্রচণ্ড ঝামেলা হবে—

একেবারে কমিশনার পর্যন্ত এমব্যারাস্‌ড্ হবেন—স্রেফ চেপে যাও। কাউকে বোলো না, বাচ্চুদাকেও না—কীপ মাম্ এবং ও-আংটিটা আর পোরোই না। এই তোমার শাস্তি। ব্যাংকে রেখে এসো। খোকনের বউকে দিও।"

১১

গল্পটা এখানে শেষ হলেই ভালো হতো। কিন্তু তা হলো না। পরের দিনই দাদামণির ফোন ফের পাগলাঘণ্টির মতন বাজলো। তাঁকে লালবাজারে ডাকা হচ্ছে তিনশো দশটি ক্যাসিও ঘড়ি এবং একশো বাষট্টিটি ফেভার-লিউবা থেকে

তাঁদের ঘড়িদুটিকে সনাক্ত করে নিতে। হীরের আংটিও আছে পাঁচটা। আসুন দাদা, দেখে যান। দাদামণি গেলেন! এবং একটি সস্তা ক্যাসিও ঘড়ি নিয়ে ফিরে এলেন। সবগুলোই একরকম। কিন্তু পঁচিশ বছরের নিত্যসঙ্গী সোনার ফেভার-লিউবাটি নিশ্চিত ওখানে ছিল না। (হীরের আংটিটাতো নয়ই।)

—"যাক্! তবু তো একটা বস্তুও উদ্ধার হলো।" তৃপ্ত হেসে বলেছে ডি. সি. ডি. ডি।—"বাকিগুলোও পাবেন।"—দাদামণি তো জানেন ও-ঘড়ি দেখলেই বউদি ক্ষেপে লাল হয়ে উঠবেন তাই ফিরেই বললেন ঃ

—"বাবলু! খোকন। কে নিবি নিয়ে নে। এই যে, এই ঘড়িটা ফেরৎ পাওয়া গেছে।" ছেলেরা ছুটে এলো। বউদিও। বউদি দেখেই মুখ বেঁকালেন —"এর চেয়ে যে-কোনো একটা ফেভার-লিউবা নিয়ে এলে না কেন? খোকন-বাবলু দুজনেরই ওর চেয়ে ভালো ঘড়ি আছে। তারা উদার সুরে বললে— "বাবা, তুমিই এই ঘড়িটা ততদিন পরো যতোদিন না নেক্সট জাপানে যাবার নেমন্তন্ন পাচ্ছো।"

পরদিন সকালের কাগজে দাদামণি দেখলেন ঃ

—"উত্তর কলিকাতা হইতে তিনশত পঞ্চাশজন ছিনতাইকারীকে লালবাজারে লক-আপে ভরা হইয়াছে। সমাজবিরোধীদের অত্যাচার দৃঢ়হস্তে দমনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা পুলিশের প্রশংসনীয় প্রয়াস।" বউদি বললেন—"বাঃ। দেখেছো? অনুপদার কাণ্ড?"

তার পরের দিন সকালের কাগজে চোখ রেখেই বউদি শিউরে উঠে দাদামণিকে দেখালেন—"ওগো, আরো সাড়ে চারশোজনকে ধরেছে—এবারে 'দক্ষিণ কলিকাতা হইতে'। তার মানে মোট আটশোজন ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে। যাক্! এবারে রাস্তাঘাটে হাঁটাচলা করা যাবে। বাচ্চুদাকে একটা থ্যাংকস দিতে হবে।" দাদামণি দাড়ি কামাচ্ছিলেন। হাত কেঁপে গেল। গালে শাদা ফেনার ওপরে রক্তের দানা ফুটে উঠলো।

—"ক্-কীঃ? আ-ট-শো? চলো, আজই বিকেলের ট্রেনে শান্তিনিকেতনে পালাই। বাক্স গোছাও কুইক্। বাঁচতে চাও তো পালাও।"

—"কেন? হঠাৎ? এখন তো কোনো ছুটি নেই?"

—সর্বনাশ হয়েছে···আট-শো ধরেছে? কেলেংকারি হবে! বুঝতে পারছো না কালকেই আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড হবে! আটশো জন ছিনতাইকারীকে রোদে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখবে। তাদের 'পরণে' সেই লেদার-জ্যাকেটও থাকবে না, সেই নস্যিরঙের র‍্যাপারও থাকবে না, সে-ভোজালিও থাকবে না, সে পাইপগানটাও থাকবে না, মুখে সে বুলিও থাকবে না। চোখে সে চাউনিও থাকবে না···কাউকে তুমি চিনতে পারবে না গিন্নি, বিশ্বাস করো, কাউকেই না।

টোটালি কনফিউজড হয়ে যাবে। পালাও, গিন্নি, পালাও। ভুলভাল লোককে আইডেন্টিফাই করলে মহাপাপ হবে, আর ঠিকঠাক লোককে আইডেন্টিফাই করতে পারার প্রশ্নই উঠছে না! পুলিশের খপ্পরে একবার পড়লে আর রক্ষে নেই…"

পরদিন যখন দাদামণিদের টেলিফোনটা ফের পাগলাঘণ্টির মতন বেজে উঠলো, লালবাজারী কায়দায়, তখন তাকে থামাবার মতো কেউই ছিলো না বাড়িতে। বেজে বেজে আপনিই সে থেমে গেল ক্লান্ত।

পরিশিষ্ট? কী কী জানতে চান, বলুন? হ্যাঁ, বৌদি এখন আটটার মধ্যেই বাপের বাড়ি থেকে ফেরেন। তাঁর বাবা মা-ই আর তাঁকে ওপাড়ায় টি‍ঁকতে দেন না সাড়ে সাতটার পর।

না, দাদামণির এখনও জাপান যাওয়া হয়নি। ক্যালকুলেটর ঘড়িও কেনা হয়নি। ওই লালবাজারের ক্যাসিও ঘড়িটাও দারুণ সার্ভিস দিচ্ছে। (একবার ব্যাটারি বদলেছেন মাত্র) ও, আংটিটা? ব্যাংকের ভল্টের মধ্যে তোলা আছে। সাবধানেই আছে।

সেটার কথা অবিশ্যি ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসে বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে একফাঁকে পারমিতাকে বলেও রেখেছে খোকন। দারুণ পয়া আংটি। এয়ারলুম বলে কথা!

সেদিন দুজনে

এক যে ছিলেন কত্তা, তাঁর ছিলো এক গিন্নি। কত্তাটি ফর্সা ধবধবে, লম্বা চওড়া—গিন্নিটি কালোকোলো, ছোটোখাটো। কত্তা স্বল্পভাষী, গিন্নি বাক্য-নির্ঝর। কত্তা যেমনই সভ্যভব্য, কেতাদুরস্ত, শান্তশিষ্ট, ভদ্রলোক—গিন্নি তেমনি ছটফটে, দুরন্ত, সভ্যতাবিবর্জিত, বন্যপ্রাণী। দুর্ধর্ষ গিন্নিকে সামলাতে সামলাতে ভালোমানুষ কত্তার প্রাণ যায়-যায়। এহেন গিন্নিকে নিয়ে কত্তা সংসার পেতে বসলেন কোথায়? না সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে সেই মার্কিন মুলুকে। গিন্নি সেখানে ছাত্রী, আর কত্তা সেখানে মাস্টার। অবিশ্যি, কত্তার বাড়িটাই গিন্নির পক্ষে ইশ্কুল। গিন্নি দিবারাত্র উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে ফেলছেন। ভুলভাল কাজকম্মো করে ফেলছেন, আর কত্তা বেচারা সেগুলো কারেকট্ করতে করতে নাজেহাল!

যেমন ধরুন—একজন অতিথি এলেন চমৎকার একটি নতুন কোট গায়ে দিয়ে। আসবামাত্র গিন্নি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—'আরে! আরে! এই কোটটাই বুঝি তুমি কিনেছ? বাঃ। অমুক দোকানের সেলে তো? আমিও এটা শো-উইন্ডোতে দেখেছিলুম। নেব-নেবও ভেবেছিলুম—ইশ্, কী সস্তাতেই দিচ্ছিল ওটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিলুম না, কেননা উনি বললেন রঙটা বড্ড ক্যাটকেটে, বাঙালমার্কা—। তাই না গো?'

কত্তা গোড়া থেকেই টেবিলের তলা দিয়ে গিন্নির শ্রীচরণে সতর্কতামূলক মৃদু ঠোক্কর দিচ্ছিলেন, এবারে বোধহয় ততটা মৃদু আর রইল না। কেননা গিন্নি ককিয়ে উঠলেন—'উহ! ও কী হচ্ছে? লাগে না বুঝি? তোমার পায়ে শু-জুতো আর আমার পায়ে যে চটি?' অম্লানবদনে কত্তা বললেন—'ওহো, লেগে গেল নাকি? দুঃখিত।' কিন্তু গিন্নি তাতেই যে থামবেন, তাতো নয়।—'আহাহা, তখন থেকে ইচ্ছে করে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে এখন আবার বলছো—লেগে গেল নাকি? বা-রে মজা?'

এহেন ধর্মপত্নীকে জন্মের ভাত-কাপড় প্রমিস করে ফেলে কোন্ পতিদেবতার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে না? কখন যে গিন্নি কী করে বসেন। একদিন পাশের বাড়ির ডিনারসেট ধার করে এনে এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে কত্তাগিন্নি নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছেন, মহামান্য অতিথি বাসনের প্রশংসা করতেই গিন্নি মুখ খুললেন, 'এটা অবশ্য আমাদের জিনিস নয়। খুব সাবধানে ব্যবহার করবেন কিন্তু। স্মিথের বৌয়ের কাছে ধার করে এনেছি কিনা। আমাদের কাঁচের ডিনারসেট তো নেই, গত সেটটা

উনি যে সাতদিনেই ভেঙে শেষ করে দিলেন। যাতে ওঁকে বাসনটা না মাজতে দেয়া হয়। আমিও তেমনি। ছাড়বার পাত্র নই। হুঃ হুঃ বাবা, এমন আনব্রেকেবল প্লাস্টিকের সেট কিনেছি। দেখি এখন কেমন না-মেজে পারেন?'

গিন্নির বাগবিস্তারে কত্তাবেচারার মুখের চেহারাটি তখন ভেঙেফেলা কাচের বাসনের মতোই; আর অতিথিদের মুখের চেহারা? অত্যোধিক করুণ। তাঁদের মুখে আনব্রেকেবল প্লাস্টিকের হাসি।

২

এহেন কত্তাগিন্নি একবার এরোপ্লেনে চড়ে আকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাড়ি দিচ্ছেন, হেনকালে বাধিল প্রলয়। অর্থাৎ ঝড় উঠল। ওঃ, সে কী তুমুল ঝড়। যার মার্কিনী নাম বৈদ্যুতিক ঝঞ্ঝাবাত্যা (ইলেকট্রিক স্টর্ম)। যাত্রীরা প্রত্যেকে যে যার পেটে কোমরবন্ধ এঁটে ভয়ে কম্পমান—এমনকি স্টুয়ার্টদের পর্যন্ত সীটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বেল্টবন্দী করে। প্লেনটা নাগরদোলার মতো খেল দেখাচ্ছে উপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে। যেন স্বাধীনতা-দিবসে এয়ারফোর্সের শো দিচ্ছে। কখনো ঘাস-বিচালি, কখনো-বা দে দোল দোল। যাকে বলে—ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাসাই ভেলা। ঠিক তাই। জানলার বাইরে কালীপুজোর বাজীর মতন অঝোরে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে—যেন ডিজনিল্যান্ডের কোনো বানানো দুর্যোগের জগৎ। মিশকালো আঁধার ছিঁড়ে, খুঁড়ে জানলায় বিদ্যুতের শিখা লক্‌লক্‌ করে উঠছে। ক্যাপ্টেন সবিনয়ে এবারে জানালেন প্লেনের রাডারযন্ত্র অকেজো হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক চাপে—এখন ভগবানই ভরসা। একবার তো প্লেনটা এমনই ওঠানামা শুরু করলো যে সীটের মাথার ওপরে সরু তাক থেকে ব্রীফকেস, হ্যাটকেস ইত্যাদি ধুপধাপ নিচে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তখনকার দিনে ছোটো প্লেনে ওপরের তাকে ছোটো মালগুলো রাখতে দিতো। এখন অবশ্য আর দেয় না (ঠিকই করে)। এবারে প্লেনে মৃত্যুভয়ের হিম-শীতল আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে—গুনগুন করে ভ্রমরগুঞ্জনের মতো ইংরিজি প্রার্থনার মৃদুধ্বনি জমাট বাঁধছে বাতাসে। আমাদের কত্তাগিন্নিও বসে আছেন সেই প্লেনে। কত্তা একজন 'দায়িত্বশীল পুরুষ'। অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেও সেটা চেপে রেখে 'ছেলেমানুষ' গিন্নির হাতটি নিজের শক্ত-মুঠোয় ধরে, নীরবে ভরসা যোগাচ্ছেন। মুখে বাক্য নেই। কামরার বাতাসে মেরজাপ টানলেই টন করে টংকার হবে, এমনই ঝনঝনে টেনশন। এই সংকটময় মুহূর্তেও শ্রীমতী বক্‌তিয়ার খিলজির মুখে কথার যেন শেষ নেই। কত্তার মুখে শুধু মোনোসিলেবিক উত্তর। 'ওগো, উঁ কী ভীষণ ঝড়, না।' 'হুঁ।'

—'আচ্ছা, আমাদের পাসপোর্টগুলো কোথায় গো?'

—'কেন ?'

—'ঠিক আছে তো ?'

—'পকেটে ? বলো, না ?' 'কোনখানটাতে আছে ?'

—'আছে, আছে।'

—'আছে আছে মানে ? কই ? বের করো না ? বুকপকেটে ?'

—'ব্রীফকেসে।'

—'শিগ্‌গির বের করো না গো, লক্ষ্মীটি। খুব দরকার।'

—'কেন ?'

—'আমারটা আমাকে দাও। তোমারটা তোমার কাছে থাক।'

—'কেন ?'

—'কেননা প্লেনটা তো ঝড়ে পড়েই যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

—'সেক্ষেত্রে আর পাসপোর্ট···!'

—'বাঃ ? পাসপোর্টটা সঙ্গে থাকলে তবেই না ওদের ডেডবডি আইডেনটিফাই করতে সুবিধা হবে ? তোমারটা তুমি রাখো, আমারটা আমি। পুড়ে-টুড়ে তো ছাই হয়ে যাবো সব্বাই ! ওরা চিনবে কী করে কে কোনজন ? বাড়িতে খবরই বা দেবে কী করে ? বিদেশ বিভূঁইতে অকালে মরছি। একটা খবর তো অন্তত···'

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঘোর সংসারী লোকের হিসেবী সুরে গিন্নি কথাটা অসম্পূর্ণ রাখেন। এত উদ্বেগেও হেসে ফেললেন কত্তা। এবং ঝরঝর করে অনেকগুলো কথা বলেও ফেললেন একসঙ্গে, গিন্নির নিরেট নির্বুদ্ধিতায় চমৎকৃত হয়ে।

—'দূর পাগলি। মানুষ পুড়ে যাবে, আর পাসপোর্টগুলো বুঝি পুড়বে না ? এমন কথা কে তোমাকে শেখালো ? পাসপোর্ট বুঝি ফায়ারপ্রুফ মেটিরিয়ালে তৈরি হয় ?'

—'ওহো, তাই তো ?' গিন্নি এবার খুবই লজ্জিত, যারপরনাই অপ্রতিভ। 'সত্যিই তো। আগুন লাগলে পাসপোর্টও তো পুড়েই যাবে। তবে ? ইশ, কী বোকা আমি। ওই একটা ব্ল্যাকবক্‌স্‌ না কী যেন, কেবল সেটাই পোড়ে না শুনেছি। তা তারমধ্যে তো ঢোকা যাবে না। যাকগে, তার চেয়ে ওসব ভাবনা ছেড়ে দিয়ে আমি এখন বরং একটু ভগবানের নামই করি বাবা। কথায় বলে "মরণকালে হরিনাম"। তাই করি। 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।' তার-পরেই কত্তার কী করণীয়, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন গিন্নি। —'কিন্তু তুমি তো আবার ভগবানে বিশ্বাস করো না। তুমি তাহলে কী করবে এখন ?' গিন্নি ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে চশমা নাকে নামিয়ে খানিক ভাবলে— "গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন" বলা যায়। তারপরে ইউরেকা বলার মতো আবিষ্কারের আহ্লাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন—'এক কাজ করো। তুমি বরং

'লিটল রেডবুকের বাণীগুলো মনে করো।' (ঐ বইটা ঠিক গিন্নীর খুদে লাল পকেট-গীতাটার মতোই মিষ্টি দেখতে, হুবহু এক সাইজেরও)।

কত্তা এবার তেড়েফুঁড়ে ওঠেন—'আজেবাজে ইয়ারকি রাখো তো? ইডিয়টের মতো যত রি-অ্যাকশনারি রসিকতা। একটুখানি চুপ করে থাকবে? অ্যাঁ? একটু সিরিয়াস হও, ফর হেভেনস্ সেক।' 'হোল্ড ইয়োর টাং—অ্যান্ড লেট মী?···হুঁ হুঁ কী? লেট মী···"কী"?' চোখ গোল গোল করে, ফিক্ ফিক্ হেসে বোকা গিন্নী একা একাই ইয়ারকি মারেন, বাইরে তখন অন্ধকার খানখান করছে, বিজলীর উন্দাম ঝলক, বাতাসের গতি সাইক্লোনিক, গিন্নি বলছেন—'অবিশ্যি হেভেন্স সেক নয়, গডস্ সেক।' এবার বিরক্তিতে চোখ বুজে ফেলে কত্তা বলেন—'ইনকর্‌রিজিবল্।'···কত্তার রাগে লাল মুখখানা দেখে গিন্নি এবার হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হন। যাক বাবা, এই তো কত্তার নরমল ভোকাবুলারি ফিরে এসেছে, আতঙ্কটা তাহলে কেটেছে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। গিন্নিই এবার কত্তার হাতটি মুঠোয় চেপে ধরেন। আকাশও কিছুটা সামলে ওঠে ইতিমধ্যে, আর কত্তাগিন্নির উড়োজাহাজ অচানক্ অন্য এক বিমানবন্দরে নেমে পড়ে ঝুপ্ করে। তক্ষুনি গিন্নি সুর পালটে ফেলে, 'এই তো আমরা ফিলাডেলফিয়াতে এলুম, অথচ, হায়রে—ডনামারিয়ার সঙ্গে দেখাটা করা হলো না!'—বলে কত্তার কানের কাছে অবিশ্রাম ঝিঁঝিট রাগিনীতে শোকগাথা গাইতে লাগলেন। অবশেষে "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক" স্টাইলে কত্তা এই সান্ত্বনাবাক্যটি উচ্চারণ করলেন—'নেকসট ইলেকট্রিক স্টর্মের সময়ে নেমে গিয়ে তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে গেলেই হবে।' —'এই বলে আমাকে তুমি ফাঁকি দিচ্ছ, হ্যাঁ।' বলে গিন্নি ঠোঁট ফোলালেন। ততক্ষণে 'অল অ্যাবোর্ড' হাঁক পড়েছে। ঝড় থেমে এসেছে, প্লেন উড়তে রাজী।

৩

কত্তাগিন্নি যখন সংসারটি সদ্য পাতছেন তখন নিত্যি-নিত্যিই কিছু-না-কিছু ক্রাইসিস উৎপন্ন হতো। গিন্নি রান্নাবান্না শেখেননি তখনও, কিন্তু কত্তাকে দুটি রেঁধে-বেড়ে দিতে হবে তো? নইলে আর গিন্নি কিসের? অতএব ভাতের ডেকচি উনুনে চড়িয়েই টেলিফোন।

—'ললিতা? ছেড়ে দেবো এবার?'

—'কী ছাড়বি এবার? সিনে ক্লাবের টিকিট?'

—'দূর! চালরে, চাল। ভাত হচ্ছে না?'

—'জল ফুটেছে?'

—'মানে?'

—'মানে জোরে জোরে ধোঁওয়া বেরুচ্ছে ? জলটাতে কি বেশ বুদ্বুদ হচ্ছে ? ঢাকনাটা নজর করে দ্যাখ দিকি, ওঠাপড়া করছে কিনা—'

—'ওহো, সেই জেমস ওয়াট ? ধর, দেখে আসছি। ফোন নামিয়ে গিন্নি হাঁড়ি পরীক্ষা করতে ছোটেন। কর্তাগিন্নির পবিত্র সংসারধর্ম তখন এই স্টেজে।

গিন্নিমার ছেলেবেলায় দেশলাই জ্বালাতে খুব ভয় করতো। এখন রান্নাঘরে ঢুকে সেই ভয়টা একটু একটু করে কমে আসছিল। কিন্তু একটা ঘটনায় আবার গিন্নি পুনর্মূষিক হয়ে গেলেন। সেই গল্পটাই বলি। আগাগোড়া কাঠের তৈরি তিনতলা বাড়ি। খুব পুরোনো। পুরোনো ধরনের গ্যাসের উনুন সেখানে, এ দেশের মতোই দেশলাই জেবলে ধরাতে হয় (পাইলট ল্যাম্প নেই)। সদ্য বিবাহিত কর্তাগিন্নি "কপোতকপোতী সম উচ্চবৃক্ষচূড়ে" বাস করবেন বলে তিন-তলার চিলেকুঠুরিটা অল্পস্বল্প টাকাতে ভাড়া নিয়েছেন। মাস্টারমশাই হলে কি হবে, কর্তার বয়সটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতো—তাই মাইনেও বেশ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতোই। তাই, ঘর সাকুল্যে মাত্র দেড়খানি। বড়ঘরটি পাঁচ-কোণা। পঞ্চম কোণে একটু রান্নার ব্যবস্থা আছে। এই ঘরটা গিন্নির দারুণ পছন্দ, কেননা ঘরে ঢালু ছাদ, অসম দেয়াল, এবং মেঝে প্রায়ই আশ্চর্য আশ্চর্য জায়গায় এসে পরস্পরের সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ মিলেমিশে গেছে। বড়ো মজার, এবড়ো-খেবড়ো এই ঘরখানা—অদ্ভুত এলোমেলো তার গড়নপেটন। কখনো পুরনো হয়ে যায় না। কোণা-ঘুপচিতে ভরা। কর্তাটি লম্বা মানুষ, কিন্তু সাবধানী। তাই যখন-তখন যেখানে-সেখানে নেমে আসা ছাদে তাঁর উঁচু মাথা কদাচ ঠুকে যায় না, অথচ, ছোটোখাটো গিন্নির মাথাটি অনবরত ঠুকে-ঠুকে যেন আলুকাবলির ঠোঙা হয়ে গেছে। এতোই তিনি অন্যমনস্ক। হরেরকম রঙের টিন আর বুরুশ কিনে মনের সুখে আশ মিটিয়ে ছাদে, দেয়ালে, যত্রতত্র এতোল-বেতোল রঙ করেছেন গিন্নি, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে রঙবেরঙের কুশন কিনে এনে ঘরময় ছিটিয়েছেন আরামপ্রিয় কর্তা। ঘরখানাকে বড়োই সুখী-সুখী দেখায়। বড়ো হাসিখুসি।

জীবনের প্রথম সংসার। বড়ো যত্নে বড়ো আদরে দুজনে মিলে দেড়খানি কামরা সাজিয়েছেন-গুছিয়েছেন মরা সেকেন্ডহ্যান্ড আসবাবপত্র আর জ্যান্ত কাঁচ সবুজ গাছপালা দিয়ে। একটা গাছে মস্ত মস্ত চওড়া সবুজ পাতার বাহার—আরেকটা গাছে বেগুনী ফুল ফুটে আছে থোকা থোকা, একটা ক্ষুদে গাছে ক্ষুদে ক্ষুদে কমলালেবু টুনি বাল্বের মতো জ্বলছে, আর একটা ছোট লঙ্কাগাছে লাল টুকটুকে লঙ্কা ঝুমঝুম করছে। বসার ঘরেই বাস। রান্না-খাওয়া, বাসনমাজা, পড়াশুনো, আড্ডা, আরাম—সব। আর আধখানা ঘরটাতে শোওয়া। প্রকৃত অর্থেই 'শয়নমন্দির' সেটা—জোড়া খাটটি ছাড়া আর কিছুই ও-ঘরে আঁটে না। অতি কষ্টে দেয়াল-আলমারির পাল্লাটা ফাঁক করা যায়। বাথরুমে একটা বাঘপেয়ে

চটা-ওঠা বাথটাব আছে, যা কেবল জাংক ইয়ার্ডে আর মিউজিয়ামেই পাওয়া যায়। এখন সর্বত্র শাওয়ারের চল হয়েছে। আর বাথটাব মানেই টালি-পোর্সিলেনের রাজকীয় ব্যাপার। এমনি একখানা খুরোওলা বাথটাব দিয়েই দিব্যি বাড়িটার বয়স মাপা যায়। গোটা বাড়িটাই খুব ছোট্টো, দু-কামরার। তিনতলার চিলেকামরায় আমাদের বঙ্গজ কত্তাগিন্নি থাকেন, আর তাঁদের ঠিক নিচে দোতলার ফ্ল্যাটে দুজন ষণ্ডাগুণ্ডা মার্কিনী ছাত্রের বাস। তারা একটু একটু লরেল-হার্ডি'র মতো। একজন দৈত্যাকৃতি, ইয়া সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, অন্যজন বেঁটেখাটো, তারা একদম মিশুকে নয়। দিনরাত্রি পড়াশুনো করে, আর ফাঁক পেলেই ভালো ভালো রাঁধে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কত্তাগিন্নির ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্ হয়ে যায়। সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা থাকেন সবচেয়ে নিচে, একতলায়, একা একা। এক খুনখুনে থুত্থুরে বুড়ি। তাঁর ফোক্‌লা মুখের হাসিভরা 'গুডমর্নিং'টি গিন্নির বড়োই প্রিয়। বাড়িওলার নিজের বাসা চার্লস নদীর ওপারে, শহর বস্টনে। এই খেলনাবাড়িটি যতই ঝরঝরে হোক, কত্তাগিন্নির মনে দিব্যি ধরেছে, এবং পকেটেও!

সন্ধ্যেবেলা কলেজ থেকে ফিরে কত্তাটি এককাপ গরম কফি আর একটি পড়ার বই হাতে করে, তিনতলার ছাদের আরামকেদারায় গা-এলিয়ে, পাদুটি দু-ডলার দামের টেবিলে তুলে দিয়ে, দেড় ডলার দামের স্ট্যান্ডিং ল্যাম্পটির আলোর তলায় গুছিয়ে বসেন। আর গিন্নি রান্নাঘরে অর্থাৎ তিনগজ তফাতে রান্নাবান্নার কোণটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুটনো কোটেন কুটুর-কুটুর, বাসন মাজেন খুটুর-খুটুর, আর গড়গড় করে কথা বলেন। সারাদিন কলেজে কী হলো, সেইসব। কত্তা বই পড়তে-পড়তে হাঁ-হুঁ করেন। কখনো কখনো ভুলভাল জায়গায় 'হুঃ' বলে ফেললেই সর্বনাশ—তক্ষুনি পিছন ফিরে তাকান।—'ওঃ, তুমি বই পড়ছো? কিছুই শুনছিলে না?' কত্তার অমনি ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। কিন্তু সে-সব স্বীকার করার পাত্র তিনি নন। '—শুনব না কেন? তুমি জিজ্ঞেস কর না? প্রশ্ন করে দ্যাখো কী জানতে চাও? শুনেছি কিনা বুঝতে পারবে।'

গিন্নিও ছাড়বার পাত্রী নন—

—'বলো তো, আজ প্রফেসর হ্যারি লেভিন কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন? এইমাত্র এটাই বললুম তোমাকে।'

—'কার সঙ্গে বলো তো?' অপ্রতিভ কত্তা শেষরক্ষা করতে পারেন না।

—'বলব না, যাও।'

—'দেখলে তো, কিচ্ছুই তার মানে শুনছিলে না!' অভিমানে গলা বুজে আসে, গিন্নি ঠোঁট ফোলান। কত্তার কফিও শেষ। অগত্যা বই নামিয়ে টেবিল ঠেলে কত্তাকে এবার উঠতেই হয়। সম্মুখে কর্তব্যপালনের গুরুদায়িত্ব! এখন আশু কর্তব্য ঃ মানভঞ্জন।

পাঁচ মিনিট পরের দৃশ্য : গিন্নি আবার গুনগুনিয়ে গপ্পো করছেন, কত্তা আবার ভুরু কুঁচকে বই পড়ছেন, আর হুঁ-হুঁ করছেন। সামনে নতুন কফির ধোঁয়া।

৪

সেদিনও এমনিই চলছিল। গিন্নি একসময়ে বললেন—'দেশলাইটা একটু দাও তো?' কত্তা তিনইঞ্চি দীর্ঘ বিশাল কিচেনম্যাচেস দিয়ে অনবরত চুরুটটাকে ধরাচ্ছিলেন। আজকাল আবার কফির সঙ্গে এটা নতুন জুটেছে। কত্তা সিগারেট ছেড়ে চুরুট খেতে শিখছেন, কেননা চুরুট কত্তার কাঁচকাঁচ চেহারায় বেশ একটা ওজন এনে দেয়। বেশ ভার-ভারিক্কি দেখায়, মুখে মোট্‌কা একখানা চার্চিলী চুরট গোঁজা থাকলে। কিন্তু ঝামেলাও কম নয়। একটু অন্যমনস্ক হলেই অভিমানী চুরুট নিভে যেতে চায়। কিছুতেই চুরুটটাকে একটানা জ্বলন্ত রাখার কায়দাটা আয়ত্ত হচ্ছে না কত্তার। তাই অনবরতই ফস্‌ ফস্‌ করে দেশলাই জ্বালাতে হয়, অন্তত দশটা কাঠি লাগে—পরে চুরুট! গিন্নি চাইতে, অন্যমনে দেশলাইটা ছুঁড়ে দেন কত্তা গিন্নির দিকে। কিন্তু গিন্নি তো তখন পেছন ফিরে পেঁয়াজ কুচোচ্ছেন, আর থেকে থেকে চোখ মুছছেন। খানিকটা জল পেঁয়াজের জন্যে, আর বাকিটা সাতসমুদ্দুর তেরোনদীর পারে ফেলে আসা দুটি বুড়ো-বুড়ির জন্যে।

—'আহা, সেই তো রাঁধতে শিখলাম! অথচ ওঁদের কোনোদিন রেঁধে খাওয়ানো হয়নি—কে জানে কবে পারবো'—গিন্নি এইসব ভাবছেন আর চোখ মুছছেন, আর পেঁয়াজ কুচোচ্ছেন—মহামান্য দেশলাইয়ের শুভাগমন টের পেলেন না। আর—দেশলাই তো নয়, যেন স্বয়ং দুর্বাসা মুনি। বাপ্‌রে। প্রথমে ঠক্‌—তারপরেই ফোঁস্‌স। দুবার দুটি মৃদু শব্দ, একমুহূর্ত আগুনের ঝলসানি, গিন্নি পেছন ফিরে একঝলক তাকালেন, কত্তা বই থেকে একপলক চোখ তুললেন—অমনি 'দুম্‌ম্‌'—বিস্ফোরণের একটা চাপা গর্জন হয়েই বিপুল ধূম্রজালে বিশ্বচরাচর সমাচ্ছন্ন। ঘরের ও-প্রান্ত থেকে একটি আর্তরব উঠলো—

—'এই তো আমি। পারফেক্টলি অলরাইট!'

'তুমি?' বলতে বলতেই রামভক্ত গিন্নি এক লম্ফে সরু টেবিলটা ডিঙিয়ে কর্তার বক্ষোলগ্না হন। গিন্নির বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি না, স্বভাবটা ঠিক চড়ুই পাখির মতো চঞ্চল। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে তিনি আস্ত একটি বোধিবৃক্ষ, তাঁর তুল্য শান্ত, মাথাঠাণ্ডা, তথা প্রত্যুৎপন্নমতি ব্যক্তি ত্রিভুবনে বিরল। ত্রিভুবনে দ্বিতীয় কেউই অবশ্য গিন্নির এই ওরিজিন্যাল ধারণাকে

মদত্ দেন না। তাঁর আত্মীয়, গুরুজন, ইয়ার-বন্ধু কেউই না। বরং উল্টে তাঁরা মনে করেন গিন্নি ট্যালা, ক্যাবলা, অকারণে মাথা গরম করেন, এবং কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য। পাগল-ছাগলও বলে কেউ কেউ। বললে কি হবে, গিন্নি কিন্তু আত্মবিশ্বাসে অটল। অমন কাকে-কান-নিয়ে যাওয়া প্রকৃতি তাঁর নয়। গিন্নি লোকের মন্দকথায় কদাচ কান দেন না। তিনি অনেকবার লক্ষ্য করে দেখেছেন, পদে-পদে মাথাটা গরম হলেও বিপদে-আপদে মাথাটা ঠিক হয়ে যায়। যেমন সেবার এরোপ্লেনের বিজলী-ঝঞ্ঝার মধ্যে! এবারেও তাই হয়। কত্তাকে সান্ত্বনা দিয়েই নেক্সট্ মুভ্ হিসেবে গিন্নি দৌড়ে নিজের ভারী ওভারকোটটি এনে ছুঁড়ে দেন আগুনে। অবশ্য আগুন-টাগুন দেখা যাচ্ছে না, ধোঁয়ায়-ধোঁয়া ঘর, দম আটকে আসছে। তবে কথায় বলে, 'যেখানেই ধোঁয়া আছে, সেইখানেই অগ্নি'। তারপর গিন্নির হাত ধরে টানতে টানতে কত্তা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়েন, যাবার আগে সাবধানে দোরগুলো সব টেনে দিয়ে যান—যাতে আগুনটা সারাবাড়িতে ছড়িয়ে না পড়ে। (যেন আগুনের অভ্যেস ভদ্রলোকের মতো দরজা দিয়ে বেরিয়ে কলিং বেল টিপে অন্যের বাড়িতে ঢোকে!) মুচমুচে পলকা কাঠের বাড়ি তো? জতুগৃহের দশা হতে সময় লাগবে না। চটপট অন্যান্য বাসিন্দাদের খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু তার আগেই আগুনে পশমের কম্বল চাপা দেওয়া নিয়ম। পশমের কম্বল বাড়িতে একটাও নেই। সেন্ট্রাল হিটিং আছে বলে, এ-বাড়ির কম্বলগুলো সমস্তই নাইলনের। নাইলন তো বেশি বেশি জ্বালানি যোগায়। সেটা খেয়াল করে গিন্নি সেই কম্বল না-ছুঁড়ে কোট ছুঁড়েছেন, যেটা কিনা পিওর উলের, এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সিঁড়ি দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে গিন্নিকে একটু পিঠ চাপড়ে বাহবা না দিয়ে পারলেন না কত্তা! সেই সঙ্গেই বলে দিলেন—'দোতলায় গিয়ে কথাবার্তা যা বলবার সেটা আমিই বলবো কিন্তু।' কত্তার কাছে বাহবা পেয়ে গিন্নি খুব খুশি, তারই মধ্যে দুঃখু-দুঃখু প্রাণে একটু ভাবলেন, 'আহা, অতো দামী কোটটা এতক্ষণে ছাই হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু প্রশ্নটা যেখানে মানুষের জীবন-মরণের সেখানে একটা তুচ্ছ কোটের মরণ-বাঁচন নিয়ে ভাবলে চলবে কেন!'

৫

দোতলায় নেমেই গিন্নি ভুলে ছাত্রদের বন্ধদুয়ারে দমাদম প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে গেলেন। বাড়ির জানলা-দরজা কেঁপে ওঠে ঝনঝনিয়ে। অমনি কত্তার মৃদু ধমক—'ছি, বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে? হাজার হোক ওদের সঙ্গে আলাপ নেই তো?' তিনি তো সামাজিক আদবকায়দাসম্পন্ন মার্জিত ভদ্রলোক? গিন্নি

হলেনই বা বনোপ্রাণী! কত্তা শত বিপদেও সৌজন্য হারিয়ে ফেলেননি।

কিঞ্চিৎ লজ্জা পেলেও গিন্নি বলতে ছাড়েন না—

—'আহা, ডাকাত না পড়ুক, আগুন তো লেগেছে?

আমরা কি পাড়া বেড়াতে এসেছি নাকি?' অতিকায় দীর্ঘদেহ কিশোরটি দোর খুলে দেঁতো হাসলো—

—'হায়!' (হাহাকার নয় অবশ্য, প্রীতিসম্ভাষ।)

—'হ্যালো।' সহাস্যেই কত্তা বললেন।

—'ক্যান আই হেল্প ইয়ু?'

আরো হাসি।

কত্তাও আরো হাসেন! গিন্নি কেঁদে ফেলেন।

আর কি! ঘরে আগুন লেগেছে, সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়—সংকটের মুহূর্তে হায়-হ্যালো করে লোকলৌকিকতা করে কেউ? এই কি ভদ্রতার সময়? গিন্নির মুখের চেহারাতেই বোধহয় এস. ও. এস. বার্তা লেখা ছিল। অথবা তাঁর দোর ঠ্যাঙানির ধরনে। সাহেব ব্যস্তস্বরে নিজেই বললো—

—'ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম?'

কত্তা ভদ্রতায় গলে গিয়ে বলেন—

—'ধন্য, ধন্য—ভয়ের যদিও কোনো কারণ নেই, কিন্তু—দো দেয়ার ইজ নো কজ ফর প্যানিক, বাট—'

অকস্মাৎ গোমড়া হয়ে গেল ব্যায়ামবীর ছেলেটার শ্মশ্রুগুম্ফহীন হাসিমুখ। তারপর সাড়ে ছ ফুট শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে মুখখানা কত্তার মুখের খুব কাছে নামিয়ে এনে ভুরু পাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠলো—

—'প্যানিক? হোয়াই শুড আই প্যানিক, ম্যান?' কত্তাটিও দমবার নন। হলেনই বা পাঁচফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি। হাস্যবদনে সংযতকণ্ঠে তিনি জবাব দেন—

—'দ্যাটস্ রাইট! ইউ শুড নট প্যানিক! বাট দেয়ার ইজ এ স্মল ফায়ার আপস্টেয়ার্স।' অর্থাৎ কিনা ভয়ের কিছুই নেই, বাড়িতে কেবল যৎসামান্য আগুন লেগে গেছে। এই সৌজন্যপূর্ণ সংবাদটি শোনবামাত্র ছেলেটার মুখের চেহারা পালটে যায়। ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ঃ

—'কী বললেন? আগুন? ডিড ইউ সে আ ফায়ার? স্টীভি। স্টীভি। দেয়াজ আ ফায়ার আপস্টেরার্স'। —এবং তৎক্ষণাৎ দমাদ্দম শব্দে ধরিত্রী প্রকম্পিত করে কাঠের সিঁড়ি প্রায় সে ভাঙতে-ভাঙতে ওপরে দৌড়তে থাকে। তার পেছন পেছন কত্তাগিন্নিও সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ওপরে ঊর্ধ্বপানে ছোটেন। আর তাঁদের পশ্চাতে ছুটতে ছুটতে আসে স্টীভি নামক বেঁটে ছাত্রটি। তার হাতে একটা খুন্তি। সেও ডিনার রাঁধছিল মনে হয়। উঠে গিয়ে জোর দোর-ঠেলাঠেলি শুরু করেছে দৈত্যাকৃতি ছেলেটা—দোর আর খোলে না। এদিকে

অজস্র ধোঁয়া বেরুচ্ছে তার ফাঁক দিয়ে। ছেলেদুটোর কাঁধের ধাক্কায় দোর যখন ভাঙো-ভাঙো, তখন সন্তর্পণে তাদের একটু ঠেলে সরিয়ে—'নাউ, প্লীজ লেট মী ট্রাই—' বলে কত্তা এগিয়ে যান, এবং পকেট থেকে চাবিটি বের করেন।

—'ও-ও-হ্'···বলে একটা কাতর হাল-ছাড়া শব্দ বেরোয় ছেলেদুটির মুখ থেকে এবং খুট্ করে দরজা খুলে যায়।

—'জাস্ট ইম্যাজিন, স্টীভি,—অল দা হোয়াইল হি হ্যাড দ্যাট কী··· ! অ্যান্ড···!' অপ্রস্তুত স্বরে কত্তামশাই কৈফিয়ৎ দেন—'আমাকে তো আপনারা সুযোগই দিচ্ছিলেন না খুলতে—আমি কি করব।'

গিন্নি ভেবেছিলেন ঘরে ঢুকে দেখবেন সিনেমায় দেখা অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যের মতো ঘরময় লকলক করছে লাল-হলুদ আগুন, যাকে বলে 'লেলিহান অগ্নিশিখার খেলা', চেয়ার টেবিলগুলো পট্‌পট্ শব্দে পুড়ছে—পর্দাগুলো দাউদাউ করে জ্বলছে আর ফোমের কুশনগুলো ধিকি-ধিকি।

আহারে—কমলালেবু গাছ আর লঙ্কা গাছটার জন্যে খুব মায়া হয় গিন্নির। —ওগুলো জ্যান্ত ফলন্ত জিনিস তো ?

ওরই মধ্যে গিন্নি মনে মনে ভেবে নিচ্ছিলেন কেমন করে পাসপোর্ট দুটো, কবিতার খাতাটা, অর কত্তার সখের টাইপরাইটারটি উদ্ধার করা যায়। গরীব মাস্টার-মানুষ, সদ্য কিনেছেন বড়ো সাধের যন্তরটি। ইনশিওর করানো হয়নি এখনো। সুখের কথা এই যে এগুলো সবই আছে শোবার ঘরের দেয়াল-আলমারিতে। কিন্তু আগুন পেরিয়ে সেখানে যাওয়া যাবে তো ?

দরজা খুলে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শান্তিময় দৃশ্য। একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে। কেবল মেঝের একটাই জায়গা থেকে ঘোরতর ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। সেখানে মোটা শতরঞ্চিটা ক্রমাগত পুড়ছে। খুবই 'লোকালাইজড ধোঁয়া'। ঠিক তার পাশেই কোটটা শান্ত হয়ে আছে পোষা কুকুরের মতো। ঘরে কোনোই শান্তিভঙ্গের লক্ষণ নেই। সব ঠিকঠাক। প্লেটে কুচো পেঁয়াজের পাশে গিন্নির ছুরি মজুত টিপয়ে কত্তার কফির পাশে খোলা অর্থনীতির বই। খুদে কমলালেবু, লাল লঙ্কা হাসি-হাসি মুখে যে যার টাব থেকে কত্তাগিন্নিকে অভ্যর্থনা জানাল—'হায়।' আহ্লাদে গিন্নির চোখে জল এসে যায়।

আঃ, জীবন কত সুন্দর! ভগবান কত ভালো! কপালের ঘাম মুছে ছেলেদুটো বলল—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কী বাঁচাটাই বেঁচেছেন। দয়া করে ভবিষ্যতে আর দেশলাই ছোঁড়াছুড়ি করবেন না, ওটি বড়ই বিপজ্জনক খেলা। —এদেশে কিচেনম্যাচেস সেফটিম্যাচেস হয় না।' কত্তা নাক কুঁচকে বললেন, 'আমাদের দেশে কিন্তু সব দেশলাই-ই সেফটিম্যাচেস হয়।' ছেলেটি গিন্নির কোটটি মেঝে থেকে তুলে পি. সি. সরকারের মতো ঝেড়েঝুড়ে দেখালো যে এত আগুনেও তাতে একটি ফুটো পর্যন্ত হয়নি।

কোট পরীক্ষা করে নামিয়ে রেখে স্টীভি খুব গম্ভীর মুখে বলে—'নট শুড ইউ থ্রো ইওর কোটস ইন টু ফয়ার।' এই সময়ে দেখা গেল যে কোটের লাইনিংটা লাইলনের। কত্তাগিন্নিতে চোরাই চোখাচোখি হয়। নেহাৎ কপালজোরেই আগুনে পড়েনি লাইনিঙয়ের দিকটা। ভাগ্যিস। কত্তাগিন্নি সেই ছেলেদের কিছুতেই চা-কফি-বিয়র-হুইস্কি-কোকোকোলা-সেভেন আপ, কারি-রাইস—কিছুই খাওয়াতে রাজী করাতে পারলেন না। নাঃ, এই গোবদা ছেলেদুটোকে মোটেই মিশুকে বলা চলে না। পুরো এক বছরের মধ্যে কত্তাগিন্নির সঙ্গে তাদের সামাজিক যোগাযোগ হয়নি।

৬

সামাজিক যোগাযোগ হয়নি, কিন্তু অসামাজিক যোগাযোগ একবার একটা ঘটেছিল। এতই মনুষ্যসমাজ-বহির্ভূত সেই বিরল সাক্ষাৎ, যে উভয়পক্ষেই তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ঘটনাটি চেপে না রেখে বলে ফেলাই ভালো।

মার্কিন দেশের লোকেরা সাত তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে নেয়, অফিস থেকে ফিরেই, ছ'টা নাগাদ। আর সূর্য ডোবেন তাঁর যখন খুশি, রাত্তির আটটা, ন'টা, দশটায়। খুব দীর্ঘ গোধূলি। সেদিন বড় সুন্দর বাতাস বইছে, দেশে যাকে বলে দক্ষিণা বায়, মন রয় না রয় না রয় না ঘরে, মন রয় না। যদিও তখন শীতকালই, কিন্তু বসন্ত এই আসে কি সেই আসে বলে দারুণ শাসাচ্ছে। আবহাওয়াটি বড়ো মনোরম। ললিতলতা লবঙ্গলতা। পরিশীলন কোমল সেই সময় সমীরণে মোটেই ঠাণ্ডার কামড় নেই, কত্তাগিন্নি ভাবলেন, 'অহো, কি অপরূপ বসন্ত-সন্ধ্যা। আজ আর রেঁধে কাজ নেই। একটু বাইরে থেকে খেয়ে আসা যাক।' কত্তাগিন্নির এই ভাবনাটির মধ্যে অবশ্য বিশেষত্ব ছিল না। সপ্তাহে দু-একদিনই তাঁরা এরকম ভাবতেন। প্রত্যেকবার কারণগুলো ভিন্ন ভিন্ন তৈরি করে নিতেন। যথা : 'আজ বড় সময় কম, অনেক পড়াশুনা আছে, রাঁধতে বসলে দেরি হয়ে যাবে,' অথবা—'আজ হাতে ঢের উদ্বৃত্ত সময়, একটু ঘুরেফিরে খেয়েদেয়ে এলে কেমন হয়?' আসল কারণ দুটি। প্রথমত গিন্নি সদ্য রান্না শিখছেন, তখনও ঠিক 'রন্ধনে দ্রৌপদী' হননি, একেকদিন রান্না ফেল্ করে যায় —মুখে তোলা যায় না। দয়ার সাগর কত্তা যদিও তা স্বীকার করতে চান না, তবু তখন ডিম-রুটি-বেকন দিয়েই ডিনারের ফাস্ট ব্রেক করতে হয়। দ্বিতীয় কারণটি আরো জোরালো, বাড়ির পাশেই দুটি যারপরনাই সস্তা খাবারের দোকান আছে—একটি গ্রীক, অন্যটি চীনে। দোকান দুটি প্রধানত দেউলিয়া, ভবঘুরে, ভিখিরিদের জন্য হলেও গরীব কত্তাগিন্নির মুখে সেই রান্না অমৃত-

সমান লাগতো। বিশেষ বিলটা যখন আসত। দোকানদুটি প্রায় পাশাপাশি। পাঁচ মিনিটের হাঁটা রাস্তা। গিয়ে, খেয়ে, ফিরতে ঘণ্টাখানেক। অতএব কত্তা-গিন্নি আজ আর কেউই ওভারকোটের অতিরিক্ত ভারবহন করলেন না, এই আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে। রাত তো হবে না, শীত পড়বার ঢের আগেই তাঁরা ফিরে আসবেন হাল্‌কা হৃদয়ে পল্‌কা পায়ে। কুহু কুহু করে বেরিয়ে পড়লেন। কত্তার পকেটে পার্স আছে বলে গিন্নি তাঁর অহং-থলিটিও নিলেন না। গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে গিন্নি বেরুলেন—কত্তার প্রাণে বেশি আনন্দ হলে আই. পি. টি. এ-র গান গাইতে থাকেন। দুজনে দু'রকম গান গাইতে গাইতে গ্রীক দোকানে ঢুকলেন।

সেখানে গ্রীক গান বাজছিল জ্যাক্‌ বক্‌সে। গিন্নি মেনু দেখতে দেখতে বললেন, 'আহা, এখানে পয়সা ফেললে যদি রবীন্দ্রসংগীত হতো?'—'সেটা ভালো হতো না বিশেষ। বরং যদি "পথে নামো সাথী" বাজতো কিম্বা "ইনটারন্যাশনাল"—বলে কত্তা একটা বিয়র অর্ডার দেন। গিন্নি একটা কোকা-কোলা। তারপর গ্রীক ল্যাম্বরাইস্‌ স্যালাড। গজার মতো বাক্‌লাভা। তুর্কী কফি।

পেটপুরে প্রাণভরে খেয়েদেয়ে বাড়িতে ফিরে এসে তিনতলায় উঠে, পরিতৃপ্তি সহকারে ক্লোভ এবং কার্ডামম চিবুতে চিবুতে কত্তাগিন্নি আবিষ্কার করলেন—সর্বনাশই সমুৎপন্ন হয়েছে। এবং এই সর্বনাশে এমনকি পণ্ডিতের অর্ধেক ত্যাগ করার উপায় নেই। পুরোটাই পরিত্যাগ করতে হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘরবাড়ি ফ্ল্যাটে নো অ্যাডমিশান—কেননা কত্তার চাবিটি আছে তাঁর ওভার-কোটের পকেটে, গিন্নির চাবি তাঁর বটুয়ায়। এবং কোট-বটুয়া দুটোই ঘরের ভেতরে থেকে গেছে। ঘরে চাবিবন্ধ। অতএব আপন ঘরে পরবাসী-ঢুকতে আর পারিনে। এখন ঘরে ঢুকতে হলে এতগুলো কাজ করতে হয়। ১. বাড়ি-ওয়ালাকে বস্টনে টেলিফোন করে একস্‌ট্রা চাবি প্রার্থনা করতে হবে। ২. সেটাও কোনো ফোন বুথে গিয়ে। ৩ তারপরে সে-ই বস্টনে ছুটতে হবে চাবিটি আনতে (যদি তৃতীয় চাবি থাকে। কেননা দুটি চাবিই দিয়ে দিয়েছিলেন তিনি)। ৪ ইদিকে গাড়ির চাবিও তো রয়ে গেছে ঘরের মধ্যে—ঘরের চাবিরই সঙ্গে। অতএব টিউব ট্রেনে করে বস্টনে যেতে হবে। এবং ৫. ততক্ষণে শীত বেশ জাঁকিয়ে নেমে পড়বে। বসন্তকালের শীত নিশাচর, রাত হলেই ঝপাং করে তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েন জনমনুষ্যের ওপরে, বাঘের মতো। অথচ ওভার-কোটগুলোও ঘরের মধ্যে বন্দী। এই শীতে নদী পেরিয়ে বিনা-কোটে বস্টন যাওয়া…। কত্তার ফর্সা মুখটি শুকিয়ে বাসি বকুলফুল। এখন পাঁচদাগ সমস্যা সামনে—প্রত্যেকটাই খাঁটি। —হায়! হায়! কী গণ্ডগোলটাই যে পাকিয়ে গেল আজকে এই আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে!

হেনকালে গিন্নি লাজুক গলায় বেগনী-বেগনী মুখে কত্তাকে বললেন—'হ্যাঁগো, এদেশে রেইন-ওয়াটার পাইপ হয় না? আমি কিন্তু পাইপ বেয়ে উঠতে পারি।'

গিন্নির বাক্যংশুশ্রুষা চমৎকৃত কত্তার প্রথমে বাক্যরোধ হয়ে গেল। তারপরে সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি ভাঙাগলায় বললেন—'সে কি!' তাতেই যথেষ্ট উৎসাহ পেয়ে গিন্নি উবাচ—'অবিশ্যি এসব বাড়ির তো ঢালু ছাদ! রেইনওয়োটার পাইপ নাও থাকতে পারে। তা না-ই-থাকলো। চিমনির পাইপ-টাইপ যা হোক কিছু একটা থাকবেই নিশ্চয়?' বলেই নিচে ছুটলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। কত্তা আর কী করেন? তিনিও নিচে চললেন, ছায়াইব। যেহেতু কোনো সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান সাপ্লাই করতে পারছেন না, আপাতত বিষয়টাই এমন স্থূল, আন-ইন্টেলেকচুয়াল। অগত্যা গিন্নির সরল মোটা অ্যাপ্রোচটাই মেনে নেওয়া যাক।

বাড়ির পশ্চাদভাগে একটুখানি পোড়ো জমি। সেইখানে তিনটি ফ্ল্যাটের তিনখানি সুবৃহৎ আবর্জনা ভাণ্ড, মার্কিনী ভাষায় গারবেজ ক্যান, বসে আছেন কর্তা-ব্যক্তির মতো সারি সারি, সুগম্ভীর। এবং প্রায় অন্তঃসারশূন্যই, কেননা গতকালই পৌরসভার গাড়ি এক সপ্তাহের আবর্জনা কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। পাইপের সন্ধানে গিয়ে আরেকটি বস্তু আবিষ্কার করে ফেলেছেন গিন্নি এদিকে। করে তিনি আহ্লাদে আত্মহারা, আরে বাঃ সমস্যার সমাধান! সামনেই কিনা একটি —অতি দীর্ঘ লোহার মই! দেওয়ালে চমৎকার প্রলম্বিত। ঠিক কত্তাগিন্নির চিলকোঠার শয়নকক্ষের বাতায়নই উৎসমূল। এবং সেই জানলা, নিচে থেকেই দেখা যাচ্ছে। আজ শীত কম বলে ছিটকিনি দেওয়া নেই, এক-তৃতীয়াংশ খোলা। অর্থাৎ ওটাকে ঠেলে আরেকটু ওপরে তুলে দিতে পারলেই ঘরে ঢোকাটা তুচ্ছ। (ইংরিজি সিনেমায় দেখা বিদেশী জানলাগুলি পাঠকদের স্মর্তব্য ঃ কুত্রাপি গ্রিল-গরাদের ঝামেলা থাকে না।)

পাইপের বদলে মই পেলুম টাক ডুমাডুম ডুম।

পরম উৎসাহে গিন্নি বললেন কত্তাকে—'তবে আর ভাবনা কিসের? তুমিই উঠে পড়ো'—হাজার হোক গিন্নি এটুকু জানেন যে ভদ্রসমাজে পুরুষকেই প্রথমে 'পুরুষের ভূমিকায়' একটা চান্স দিতে হয়। এবং মই বেয়ে ওঠাটা ঠিক নতুন বউয়ের যোগ্য রোল নয়। সঙ্গে সঙ্গে সপ্রতিভ সুরে কত্তা বলেন, 'সে তো উঠতেই পারি! এ আর কে না পারে? ফুঃ!' তারপর নিজের ঝাঁকড়াচুলে একটু বিলি কেটে নিয়ে ফের বলেন—'নো প্রবলেম! সহজপন্থা তো সামনেই। যে-কেউ উঠে পড়লেই হলো।' কিন্তু কার্যত মই স্পর্শ করার কোনোই লক্ষণ দেখালেন না। অধৈর্য গিন্নি এবার তাড়া লাগালেন—'কই?' বংশবদভাবে কত্তা বললেন—'এই উঠছি।' বলে গম্ভীরভাবে একবার বাঁদিক থেকে, আরেকবার

ডানদিক থেকে সিঁড়িটাকে খুব যত্নসহকারে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায় পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। ধীর, সুস্থির, বিলম্বিত লয়ে পায়চারিপূর্বক। যেন বাঘের খাঁচার ব্যাঘ্র।

সরু আঠারো ইঞ্চি চওড়া লোহার শিকের তৈরি মই। বিপজ্জনকভাবে সিধে উঠে গেছে স্বর্গের সিঁড়ির মতো। ঠিক কত্তাগিন্নির জানলা পর্যন্ত। হাতল-টাতলের বালাই নেই। দেয়াল থেকেও ফুটখানেক দূরে। এবং মাটি থেকে প্রায় একতলা উঁচুতে নেমে এসে হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে। এর নাম 'ফায়ার এসকেপ'। বাড়িতে আগুন লাগলে এই মই বেয়ে বাইরে পালিয়ে আসতে হয়। শুধু নামবার জন্যেই এই মই, ওঠবার জন্য নয়। বাড়িতে আগুন লাগলে, এই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে শেষ ধাপ থেকে ওরাংওটাংয়ের মতো দুই হাতে ঝুলে পড়লে, পা মাটি থেকে খুব বেশি ওপরে থাকে না। তখন দুগ্‌গা বলে ঝুপ্ করে লাফালেই হলো। কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে ঐ সিঁড়িতে নাগাল পাবার কোনো উপায় সাধারণ মানুষের নেই। নতুবা চোরেরা যে রেগুলারলি ওঠা-নামা করবে! মার্কিন দেশে প্রত্যেক বাড়িতে এই লোহার সিঁড়ি আইনত অপরিহার্য। এবং ধনীবাড়ির গিন্নির মতোই ধনীবাড়ির ফায়ার এসকেপের বেশ নধর, পুষ্ট, রেলিং-টেলিংওয়ালা দোহারা চেহারা হয়, আর গরীববাড়ির ফায়ার এস্‌কেপার হয় রোগা, সরু, চিমসে। যেমন এইটে। এটার জন্ম হয়েছে যেন আইনের দৌলতে—নাম-কা-ওয়াস্তে। কাম-কা-ওয়াস্তে নয়।

কত্তার দ্বিধান্বিত দুশ্চিন্তিত পায়চারি দেখে গিন্নি ভাবলেন কত্তা নিশ্চয় ভাবছেন 'অত ওপরে মইটা ফুরিয়েছে—এখন উঠি কী করে?' বুনোগিন্নির মাথায় চমৎকার দুর্বুদ্ধির বৈদ্যুতিক উদ্ভাস এসে গেল। তাঁর শরীরে তো ঘেন্নাবৃত্তি নেই! তিনি বললেন—'এসো আমরা একটা গারবেজ ক্যানের ময়লা আরেকটাতে ঢেলে নিয়ে খালি পাত্রটি উপুড় করে মইয়ের তলায় পাতি। তারপরে ওটার ওপরে চড়লে তুমি ঠিকই হাত পেয়ে যাবে মইতে। তুমি যা লম্বা!' বলে কত্তার পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যটিকে সপ্রশংস নয়নে বন্দনা করেন। আহা কী চেহারা—যেন শালপ্রাংশু। মহাভুজও কি নন? কত্তা তাতে ধন্য বোধ করলেও ডাম্সবিনে চড়বার কাজে খুব একটা উৎসাহ পেলেন বলে মনে হলো না। কিন্তু অধীর আগ্রহে প্রবলা সেই গিন্নিকে দমায় কে? অনতিবিলম্বেই একটা ময়লা ফেলার ড্রাম খালি করে ফেলে সেটা মইয়ের তলায় উল্টিয়ে পাতা হয়ে গেল। মঞ্চ প্রস্তুত—এবার কত্তার তাতে উঠে পড়ারই অপেক্ষা।

হেনকালে গিন্নির অত্যুৎসুক আঁখিপল্লব এড়িয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে নিরুপায় কত্তা আমতা আমতা করে বলেই ফেলেন—'শোনো, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি।' গিন্নির মুখটি শুকিয়ে গেল। বলা হয়নি এমন কথা এখনও আছে? এই পাক্‌কা সাড়ে সাতমাস পরেও? অর্থাৎ তিরিশ ইনটু সাত দু-শো দশ প্লাস

পনেরো রাত্রি একাদিক্রমে গুঞ্জনের পরেও ?

কত্তা অপরাধীর মতো মাটিমুখো হয়ে যা থাকে-কপালে-সুরে বলে ফেললেন, —'আমার ভার্টিগো আছে।' বিমর্ষ গিন্নি এবার আঁতকে উঠলেন। "অ্যা···?' গিন্নি অকাতরে কাত্‌রে ওঠেন—যেন সিফিলিস—'সে কি গো ? সেতো একটা ভয়ংকর হিংস্র মনের রোগ, যা খুনীদের থাকে। শুনেছি হিচককের 'ভার্টিগো' নামে একটা ছবিতে এক স্বামীস্ত্রী···'কত্তাটি এবার হাঁ হাঁ করেন ওঠেন—'ওরে নারে, খুন-টুনের ব্যাপারই নয়, ভার্টিগো একটা তুচ্ছ অসুখ—অতি তুচ্ছ, অত্যন্ত সাধারণ, আ মোস্ট কমন প্রবলেম—যাতে ওপর থেকে নিচের দিকে তাকানো যায় না। দেশের বাড়িতে দ্যাখোনি, দেয়ালঘড়িতে বাবা দম দিতেন, ঠাকুর দম দিত, এমনকী মালীও দম দিত, অথচ আমি কদাচ দিতাম না ? আমি যে মইতে চড়তে পারি না। চড়লেই মাথা ঘোরে। বুক ধড়ফড় করে, বমি পায়, মনে হয় পড়ে যাব, অথবা লাফিয়ে পড়ি! এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে কুতুবমিনারে কিছুতেই চড়লুম না।" —'উঃ, কি সর্বনাশ! মনে হয় লাফিয়ে পড়ি।' গিন্নিই লাফিয়ে ওঠেন। কিন্তু গলা শুনে মনে হয় না সর্বনাশের গন্ধ পাচ্ছেন। লাফিয়ে গিন্নি একেবারে গারবেজ ক্যানের ওপরেই উঠে পড়েন। উঠে সোল্লাসে বলেন—'খবর্দার তোমার মইতে চড়ে কাজ নেই। আটু হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কি! এতো আমার ডালভাত। এ আমি ইজিলি চড়তে পারি!' গিন্নির গলায় স্পষ্ট রিলিফ। বিয়ের পরেই দল বেঁধে সবাই কুতুবমিনারে গিয়ে গিন্নির সত্যি বড্ড মনে কষ্ট হয়েছিল। জেদ করে কত্তা নিচে দাঁড়িয়ে রইলেন। একা-একাই। কিন্তু ওদিকে যে একটা ভীষণ সাজগোজ করা পাঞ্জাবী মেয়েও নিচে দাঁড়িয়েছিল! গিন্নি তাই মিনারে চড়ে মোটেও শান্তি পাননি। আজ বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। এ-ই ব্যাপার ছিল তাহলে ?

'সেই ব্যাপার নয় ? তা—রা! জয় মা তারা (গিন্নি হঠাৎ মনে মনে তাঁর পিতৃদেবের মতো হুংকার দিয়ে ওঠেন) তারা ব্রহ্মময়ী মাগো। বাঁচা গেল।'

দেড়মাস আগেই কত্তাগিন্নির বিবাহের অর্ধবর্ষপূর্তি জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেছে বটে কিন্তু দেখা যাচ্ছে "এখনও গেল না আঁধার"—এখনও কত কি জানা বাকি। পরস্পরকে ভালো করে চেনাই হয়নি। এই সংকটমুহূর্তে গিন্নি প্রথম জানলেন তাঁর সর্বশক্তিমান কত্তা একটা জিনিস পারেন না—আর কত্তা অবগত হলেন যে গিন্নি সেইটে তো পারেনই, পরন্তু আরেকটা জিনিসও পারেন। গিন্নি জানলেন তাঁর কত্তা মইতে চড়তে অপারগ—এবং কত্তাও এই প্রথম জানলেন যে গিন্নিটি রেইনওয়াটার পাইপ বাইতে ওস্তাদ, দুজনে দেখা হলো, মধুযামিনী রে।

৯

হলে কি হবে, গিন্নির আঙুলের ডগাটুকুও পেঁীছোলো না মইয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত। পায়ের তো প্রশ্নই নেই। তখন পুরুষজাতির সম্মানরক্ষার্থে কত্তাও উঠে পড়লেন উলটোনো আবর্জনা-পাত্রের পৃষ্ঠদেশে। কত্তাকে দেখে উদ্বিগ্ন গিন্নির মনে একটি ছবি ভেসে এলো—'আচ্ছা, একটু একটু কিষ্কিন্ধার রাজার মতো দেখাচ্ছে না তো গো আমাদের?' কিন্তু কত্তা কেজো-মানুষ। ওসব নান্দনিক অপভাবনার তাঁর সময় নেই।

'—দূর! যত্ত উটকো ভাবনা।' বলে কত্তা ততক্ষণে গিন্নিকে দুহাতে শক্ত করে শূন্যে তুলে ধরেছেন এবং টারজানের মতোই অবলীলাক্রমে গিন্নির শাঁখা-নোওয়া পরা হাতদুটি মই ধরে ঝুলে পড়েছে। তারপর কত্তার স্বেচ্ছা-নিবেদিত স্কন্ধদেশে পদস্থাপনপূর্বক নববধূ মইতে পা তোলেন—অনেকটা প্যারালাল বারের কায়দায়। বীরপুরুষ কত্তামশাইয়ের মুখ ফসকে এই সময় একটি মৃদু অস্ফুট আর্তনাদ নিষ্ক্রান্ত হলো। গিন্নি তাড়াতাড়ি জিব কাটলেন —'এই-যাঃ, লাগলো তো? পায়ে চটি যে!'

এমন সময়ে একটি ঝন্ঝন্ শব্দ শুনে কত্তাগিন্নির চোখ চলে যায় সামনের জানলার দিকে। একতলায় বুড়িমার রান্নাঘরের জানালার পর্দা সরানো। সিঙ্কের সামনে বৃদ্ধাটি অবশ দাঁড়িয়ে—একহাতে বাসনমাজার বুরুশ, অন্যহাতের প্লেটটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেলো। পুরু লেন্সের তলা দিয়ে তাঁর চোখ যায় না, কিন্তু খুলে যাওয়া ফোকলামুখের গোল হাঁটি কাত্লা মাছের খাবি খাওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই বিশ্বের বিস্ময় স্তম্ভিত।

গিন্নি এবারে একটু লজ্জা পান। সৌজন্যসূচক হাসি একটু করে ছুঁড়ে দিয়েই তিনি মই বেয়ে রাজমিস্ত্রির মতো স্বচ্ছন্দে উঠে যান—তারপর বুড়ির স্তব্ধ দৃষ্টির সামনে দুপাটি জরির চটি শূন্য থেকে পুষ্পবৃষ্টির মতো খসে পড়ে। কত্তা ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসেন একটু। পরমুহূর্তেই পুনরায় ঊর্ধ্বমুখে, দুই কোমরে দুই হাত, গিন্নির সশরীরে স্বর্গারোহণের পুণ্যদৃশ্য ধ্যানস্থচিত্তে নিরীক্ষণ করেন। গারবেজক্যানের ওপর থেকে নামবার কথাটা তাঁর মনেও পড়ে না। চেয়ে চেয়ে দেখেন, আর মনে মনে তারিফ করেন। —বাঃ! গিন্নি তো দিব্যি উঠছেন! পায়ে পায়ে তো মন্দ প্রগ্রেস হচ্ছে না। খাশা! ওকি! হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? গিন্নির হলো কী? কত্তার ভুরু কুঁচকে যায়।

ওদিকে গিন্নির এই হলো। মই দিয়ে দিব্যি চড়ছিলেন উদবেড়ালের মতো তর-তরিয়ে, সহসা সামনে পড়লো পর্দাসরানো দোতলার জানলা। ঘরে আলো জ্বলছে। বেঁটে স্টীভি চেয়ারে বসে নীচু হয়ে পা থেকে মোজা খুলছে, পরনে কেবল আন্ডারওয়্যার। কাঁধে তোয়ালে। অবশ্যই স্নানে যাচ্ছে। এবং জানালার দিকে পিছন ফিরে সদ্যোস্নাত দৈত্যটি আয়নার সামনে বাহুমূলে সবেগে পাউডার মাখছে, পরনে কেবল জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দু গজ ছ ইঞ্চি অম্লান শাদাচামড়া। এমন সময়ে আয়নায় কিছু দেখে ভূত দেখবার মতো শিহরিত হলো সে, হাত কেঁপে উঠে পাউডারের পাফ পড়ে গেলো—মুখ থেকে শব্দও নির্গত হয়ে থাকবে, কেননা স্টীভি মুখ তুলে চাইল, দৃষ্টি বিস্ফারিত, ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত, যেন দুজনকেই ভূতে পেয়েছে। তারা দেখলো দোতলার বাতায়নপথে নিষ্প্রত্র মেপল গাছের উঁচু ডগার ফাঁকে ধূপছায়া রঙ সন্ধ্যামেঘের গায়ে হেলান দিয়ে মহাশূন্যে উদিত হয়েছে তিনতলার গিন্নির সহাস্য বেগুনী বদনচন্দ্রিমা। একজন দেখলো সেটা আয়নায়, থালার জলে সূর্যগ্রহণ দেখার মতো, আর একজন দেখলো সোজাসুজি এবং একেই কবির ভাষায় বলা হয়েছে 'বিপথি বিস্ময়' দৈত্যাকৃতি কিশোরটি লজ্জায় হঠাৎ বসে পড়লো। এইভাবে যে দোতলার জানলায় উঁকি দিয়ে কেউ কদাচ তাদের নির্জনতা ভঙ্গ করতে পারে—এ তাদের—বন্যতম কিশোর—কল্পনারও বাইরে।

অথচ গিন্নি বেচারী কী আর করবেন? এ তো আর ইচ্ছে করে নয়! তিনিই বা কেমন করে জানবেন যে এই নচ্ছার ছেলেরা অমন ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হবার মতো তক্ষুনি চান করে বেরোবে! বিপন্নতার ঘোর কাটতে না কাটতে ছেলেদুটি দেখলো শাড়ির পাড়ে-ঘেরা দুটি মোজাপরা শ্রীচরণ তরতর করে তাদেরই জানলার বাইরে দিয়ে অনন্ত ঊর্ধ্বলোকের দিকে উঠে গেলো।

যতক্ষণে তারা সামলে-সুমলে আশ্বস্থ হয়ে জানলায় এসে কাঁচ তুলে চেঁচামেচি জুড়লো, 'হে, হোয়াটস্ দা ম্যাটার,' ততক্ষণে তিনতলার জানলা দয়া করে দ্বিধা হয়েছেন এবং গিন্নিও তাতে প্রবেশ করে ফেলেছেন। কেবল তখনও আনমন-মুগ্ধনেত্রে গারবেজক্যানের বেদীতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন কর্তামশায়। ওদের প্রশ্নের উত্তর, তিনি আপন পটভূমি বিস্মৃত হয়ে, স্বভাবসুলভ সম্ভ্রান্ত গলায় দেন—'নাথিং রিয়্যালি, উই আর জাস্ট লক্‌ড আউট।' শুনে বালকদ্বয় বিস্ময়-সূচক আওয়াজ করল—'জী-ঙ্গ-ঙ্গ-ঙ্গ-ঙ্গ। কিন্তু আপনি গারবেজক্যানটার ওপরে দাঁড়িয়ে কেন? ওটা যে ভেঙে যাবে!' সহসা সচেতন হয়ে কর্তা তাড়াতাড়ি নেমে পড়েন, মুখে লাজুক হাসি। জো পেয়ে লম্বা ছেলেটা ধমকে ওঠে—

—'লক্‌ড আউট তো সকলেরই হয়, তাই বলে ঘরে ঢোকার প্রকৃষ্টতম পন্থা কি এইটে? হা ঈশ্বর! আপনি নিজেই বা ওঠেননি কেন? মেয়েদের কি একাজে পাঠানো ঠিক?'

বাঁটকুল স্টীভি অমনি ফোড়ন কাটে—

—'আপনার স্ত্রী যদি পড়ে যেতেন? অত লং ড্রেস পরে কেউ কখনও মই বেয়ে ওঠে? গুডনেস গ্রেশাস।'

কত্তা প্রাণপণে ভদ্রতার কানা আঁকড়ে চুপ করে আছেন। মার্কিনী জ্ঞান বিতরণ আর শেষ হয় না। কে আর স্নান করে বেরিয়েই অরক্ষিত অবস্থায় সন্ধের আবছায়ায় দোতলার খোলা জানালায় শূন্যে উড়ন্ত নারীমূর্তি দেখলে খুশি হয়? স্টীভি বলে—'এর চেয়ে আপনারা একটা ডুপ্লিকেট চাবি নিচের-তলায় বৃদ্ধা মহিলার কাছে জমা রাখেন না কেন? জগতে আর-সবাই যা করে? আমরাও যা করেছি?'

কত্তা কোনো উত্তর ভাববার আগেই ঠং-করে একটা চাবি শূন্য থেকে এসে পড়ল গারবেজক্যানের মাথায়। তারপরেই ছিটকে গিয়ে মাটিতে। কত্তা চটপট কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরেন।

'জী-ঈ-ঈ-ঈ'!! আবার বিস্ময়ে হতচকিত হয় বালকবৃন্দ। এবং লম্বুটা আরেক প্রস্থ ধমক লাগায়—

—'আচ্ছা, এটার কোনো প্রয়োজন ছিল কি? যদি ওপাশের ওই গারবেজ ক্যানটার মধ্যে গিয়ে পড়তো চাবিটা? তখন চাবি উদ্ধার করতে আপনারা টিন-সুদ্ধ ময়লা ঘাঁটতে বসে যেতেন কি? হুমম্? তার চেয়ে আপনি টুকটুক করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেই পারতেন? গিয়ে দোরে টোকা মারতেন, আপনার গিন্নি তো ভেতর থেকে দোর খুলে দিতেন? উড নট দ্যাট বি বেটার?'

কত্তাটি জাতে মাস্টার, সাহেবপুত্তুরদের জ্ঞান দেওয়াই তাঁর স্বধর্ম—তাছাড়া ছাত্রবয়সে দুর্ধর্ষ ডিবেটারও ছিলেন,—কিন্তু আজকে কী যে হয়েছে তাঁর? এই অর্বাচীন অপোগণ্ড ষণ্ডামার্কা বোকা-পাকা দুটো পুঁচকে ক্রুকাটকুলো আকাট-মুখ্যু আনডার-গ্রাজুয়েটের বোম্‌ বক্তিয়ারির উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না অমন দুর্দমনীয় উঁঠতি-পণ্ডিত কত্তামশাই। মনে মনে গাল দিতে থাকলেন, কিন্তু মুখে শব্দ যোগালো না—ওদেরই পক্ষে অকাট্য যুক্তি। কত্তা অযৌক্তিক এঁড়ে-তক্কো করতে পারবেন না একদম—সেটাতে গিন্নিরই মোনোপলি। কত্তা অগত্যা দুই পকেটে দু-হাত গুঁজে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটা সাবানকাচা হাসি হেসে উর্ধ্বমুখে তাকিয়ে বললেন: —'তাই তো!' আর ভাবলেন, সিগারেট কই, সিগারেট?

ইতিমধ্যে ওপরের জানলার ফাঁকে গিলোটিনের আসামীর মতো করে মুখটি বাড়িয়ে ব্যাপার-স্যাপার সযত্নে শ্রবণ-পর্যবেক্ষণ করছিলেন গিন্নি। তাঁর ভালো-

মানুষ কত্তাটিকে বাগে পেয়ে এই দুটো ত্যাঁদড় ছোকরা যা-নয় তাই বকুনি দিচ্ছে ? এ কি গিন্নি সইতে পারেন ? সায়েব-গুন্ডা বলেই পার পেয়ে যাবে ? কক্ষনো নয়। তৎক্ষণাৎ গনগনে লাভার মতো অগ্ন্যুৎপাতের মতো, অথবা রাগী ভগবান জেহোভার দৈববাণীর মতো—গিন্নি ওপর থেকে গরম-গরম শব্দবৃষ্টি করতে থাকেন ঃ

—'অযাচিত উপদেশের জন্য অনেক ধন্যবাদ— এবার থেকে নিশ্চয়ই শখ করে ফায়ার এসকেপ বেয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকবো না আমরা—তবে চাবিটা কেন নিচে ফেলা হলো জানতে চাইলে, এই বলছি শুনে রাখো—যাতে উনি একতলার বৃদ্ধা মহিলার হাতে একেবারে চাবি জমা দিয়েই তবে ওপরে ওঠেন। জীবনে যাতে এরকম ভুল দ্বিতীয়বার না ঘটে। বুঝলে বাছারা ? ও কে, কিডস ? আরয়ু স্যাটিসফায়েড ?—'

দোতলার জানলা থেকে ডবল গিলোটিনের মতো দুই মুন্ডু বাড়িয়ে থাকা দুই ছেলে বাক্যসুধা শুনলো। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরের দিকে চাইতে সাহস করলো না। সেই মুখ! সেই আলো-আঁধারিতে মুক্ত বাতায়নপথে দীর্ঘ মেপল গাছের নিষ্পত্র শাখার ফাঁকে সন্ধ্যা-মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে মহাশূন্যে অভ্যুদিত সেই অলৌকিক বাদাম-রঙা মুখচ্ছবি—সেকি আরো একবার দেখা সম্ভব ? (তারা তো আর রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, প্রিয়ার ছায়াও যে আকাশে এক-একদিন ভাসে, তাদের সে তত্ত্ব জানা নেই।) ও বাবা! এতদ্‌শ্রুত্বা ছেলেরা নিচের দিক চেয়ে চেয়ে ধরিত্রীর বুকে পীসফুলি অধিষ্ঠিত কত্তাকেই বলল ঃ

—'তাই বলুন! ওয়েল, দ্যাট মেক্‌স সেন্স। গুডনাইট।' এবং চটপট ঘরের মধ্যে মুন্ডু টেনে নিয়ে জানলা নামিয়ে ফেললো। কী জানি আবার যদি মই বেয়ে নেমে আসে ?

১১

বৃদ্ধার হাতে চাবিটি জমা দিয়ে, প্লেট-ভাঙার জন্য যারপরনাই দুঃখ জ্ঞাপন করে, অবশেষে নিজের ঘরে ঢুকে দু'ডলারের আরামকেদারায় গা এলিয়ে, পঞ্চাশ সেন্টের মাটির মগে করে গরম গরম কফি খেতে খেতে কত্তা ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়লেন ঃ

—'হ্যাঁগো, রমেশদের একটু ফোন করি ? একটু আসতে বলি ? বড্ড হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করছে। স্ট্রেনটা তো বড়ো কম গেলো না।' চোখ পাকিয়ে অদম্য-স্পর্ধা গিন্নি বললেন—'স্ট্রেনটা কার বেশি গেছে শুনি ? আমি মই বেয়ে তিনতলা উঠলাম, আর হুইস্কি খাবে তুমি ?' তারপর মিষ্টি হেসে কৃপাবর্ষণ

করেন—'ঠিক আছে, ফোন করে দিচ্ছি।—বেশি রাত করা চলবে না কিন্তু আজকে, কাল ভোরবেলা ক্লাস আছে!'

প্রশ্রয় পেয়ে আহ্লাদে গদগদ কর্ত্তা কৃতজ্ঞচিত্তে দু হাত তুলে গিন্নির মইতে চড়ার কৃতিত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে থাকেন। এক সময়ে তারই ফাঁকে টুক্ করে বলে ফেললেন ঃ

—'আচ্ছা, তুমি চাবিটা সত্যি সত্যি বুড়িকে জমা দেবার জন্যেই নিচে ফেলেছিলে?'

এতক্ষণে নিজের প্রশংসা শুনে খুশিবিগলিত গিন্নি খলবলিয়ে উঠলেন— 'আরে দূর! তুমিও যেমন? ছোকরাগুলোর চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শুনে মাথা-গরম হয়ে গেলো, তাই ওরকম বলে দিলুম। আসলে আমার মোটে মনেই ছিলো না যে এসব ইয়েল লক্, ভেতর-বাইরে দুদিক থেকেই খোলে। আমি ভেবেছি তালাবন্ধ ঘরে আটকে পড়েছি—বাইরে থেকে না খুললে বুঝি—তাইতো তোমাকে চাবিটা ফেলে দিলুম—'

হঠাৎ একটু ঘনিয়ে এসে, গিন্নির ডাঁশা গোলাপজামের মতো চিবুকটি ছুঁয়ে গলাটা বিরাট খাদে নামিয়ে কর্ত্তা বললেন ঃ

—'যাতে আমি গিয়ে আমার বন্দিনী কন্যেটিকে উদ্ধার করি?'

কর্ত্তার গলায় কী যে ছিল, অমন গেছোগিন্নির মুখখানি হঠাৎ নিচু হয়ে যায়—অমন বাক্যবাগীশ জিভে কেবল একটিই শব্দ যোগায় ঃ

—'য্যাঃ!'

এক মিনিটের স্তব্ধতা।

তারপরেই গিন্নি টরটরিয়ে ওঠেন—

—'ওই বেল বাজলো বলে, এক্ষুনি রমেশরা এসে পড়বে কিন্তু, হ্যাঁ।'

চক্রবর্তী রাজশেখর,

H.O.D.H.S.

আর আধঘণ্টা বাদেই শেষ হবে পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা একমনে কলম ছোটাচ্ছে, রেসের মাঠে লাস্ট লেগ-এর দৌড়। আমি পাহারা দেবার নামে মাঝে মাঝে ঘুরে আসছি আর বাকি সময়টা বসে পরদিনের লেকচার তৈরী করছি। হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। দীর্ঘ, সৌম্যমূর্তি, নুনমরিচ-রঙ ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এবং ছাইরঙের সুটপরা এক বয়স্ক ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকলেন হলের মধ্যে। আমি ঠিক চিনতে পারছি না—কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তিনি ঢুকেই—"বয়েজ অ্যান্ড গার্লস! টাইম ইজ আপ! গিভ আপ ইওর পেপারস—" বলেই একজনের খাতায় হ্যাঁচকা টান মারলেন। আমি ছুটে যাই, "হাঁ হাঁ করেন কি, করেন কি, ওদের লিখতে দিন। এখন তো মোটে তিনটে!"

ছেলেরা প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। লেখা বন্ধ। চোখ বিস্ফারিত।

—"তিনটে? অর সাড়ে তিনটে?" তিনি হুংকার দেন।

—"তিনটে স্যার।" কোরাসে জবাব এল।

—"ও. কে. দেন। ক্যারি অন।" বলেই ভদ্রলোক একগাল হাসেন।

ছেলেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খাতাতে চোখ নামায়। কেউ কেউ আবারও মুখ তুললো তারপরে। এবার ভুরু কুঁচকে। লোকটা কে? বিভাগের কেউ নয়। তবে কি এ-ই 'কনট্রোলার অব এগজামিনেশনস্' নামক অদৃষ্টপূর্ব প্রাণী? ছেলেরা তাঁকে দেখতে পায় না।

আমি এবার যুদ্ধে নামি।

—"চলুন, বাইরে চলুন। এটা পরীক্ষার হল।"

উনি চোখ মটকে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। ছোট ছেলেরা দুষ্টুমী করলে যেমনটা করে। ফিসফিসিয়ে বললেন—"আপনিই নবনীতা তো?" গলার সুরে ষড়যন্ত্র।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ—" একটুও যে ঘাবড়ে যাইনি, তা নয়, তবুও জোরসে বলি—"বাইরে গিয়ে কথা হবে—এখানে পরীক্ষা হচ্ছে—" আমি দরজা খুলে ধরি। উনি না নড়ে বলেন—"আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। অনেকক্ষণ বাইরে পায়চারি করতে করতে বোর হয়ে গেলাম। তারপর ঐ বুদ্ধিটা করে ঢুকে পড়েছি।" তিনি নিঃশব্দে মিষ্টি করে হাসলেন, ছেলেরা উচ্চৈঃস্বরে।

যারপরনাই রেগে গিয়ে আমি বলি—"একটা পরীক্ষা চলছে এখানে। দয়া

করে সীন করবেন না। বাইরে চলুন। এখানে আপনার প্রবেশাধিকার নেই।"

—"কে বললে নেই ? আমিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রীতিমতো সই করে মাইনে নিই। হুঃ।" বলতে বলতে উনি বেরিয়ে আসেন। পেছু পেছু বেরিয়ে এসে আমি বলি—"তবে তো আরো ভালো করেই জানেন যে পরীক্ষার হল-এ ঢোকা নিষিদ্ধ। ছেলেমেয়েরা কীরকম শক্‌ড হলো বলুন তো ?"

হো হো করে হেসে উঠে উনি বললেন, "নাঃ মশাই, আপনি নেহাৎ বালখিল্য আছেন এই লাইনে। ছেলেমেয়েরা কি শক্‌ড হয় ? নো। নেভার। আপনি যাই করুন, ওরা তাতে শক্ পাবে না। ছাত্ররা হচ্ছে শক্-প্রুফ মেটিরিয়াল।"

—"আপনি কেন এসেছেন ? কোনো প্রয়োজন আছে কি ?"

—"খুবই জরুরি প্রয়োজন। সেলিমাকে চেনেন ?"

—"বাঃ! চিনি না ? আমার খুব বন্ধু।"

—"সেলিমা মৃত্যুশয্যায়। জানেন ?"

—"অ্যাঁ।"

—"হ্যাঁঃ ?"

—"সেকি ? কী হয়েছে ওর ?"

—"সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।"

—"আপনি দয়া করে আমার ঘরে একটু বসুন। আমি ডিউটি শেষ করে আসছি। আপনি চা খাবেন ? আমি আসছি। ভবানী! একটু চা করে দেবে এই ভদ্রলোককে ? উনি আমার ঘরে বসছেন।"

—"চা হইব না।" ভবানীর সাফ কথা। "আমার সময় নাই। খাতা সিলাই আছে না ? কফি হইতাছে। দিতে পারি।"

—"দ্যাটস ফাইন, থ্যাংকিউ!" বলে ভদ্রলোক আমার ঘরে ঢুকে যান। হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা সত্যিই শক্-প্রুফ। তারা দিব্যি মন দিয়ে, মাথা গুঁজে লিখে যাচ্ছে। কিন্তু খাতা জমা দিয়েই হৈচৈ করে হেসে উঠলো ঘরসুদ্ধ সবাই—"উনি কে, দিদি ? উনি কে ?"

—"আমিও ওঁকে চিনি না।"

—"নির্ঘাৎ পাগল!"

—"হতেই পারে।"

পরীক্ষার খাতাপত্তর অফিসে জমা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি ব্ল্যাকবোর্ডে এক জটিল গ্রাফ আঁকা হয়েছে। ভদ্রলোকের একহাতে খড়ি অন্য হাতে ঝাড়ন। তাঁর সামনে আমার দুই ছাত্রী ভীরু কপোতীর মতো ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে

আছে। এবং জ্বলজ্বল্ করে চেয়ে রয়েছে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। উনি চার্টটির ব্যাখ্যায় রত আছেন বলে মনে হলো। আমাকে দেখে মৃদুহাস্যে নড্ করে আমারই ঘরে ঢুকতে আমাকে অনুমতি দিলেন। বক্তৃতা অবশ্য বন্ধ হলো না। মেয়েরা কাতর নয়নে এবার আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কী জানি কী উপায়ে এদের গ্রেপ্তার করেছেন ভদ্রলোক! সুদর্শন, সুন্দর উচ্চারণ, চমৎকার কণ্ঠস্বর, সম্ভ্রান্ত বেশভূষা, সব মিলিয়ে ব্যক্তিত্বটি রীতিমতো আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। মেয়েদুটিকে মোহিত করতে সময় লাগেনি প্রাথমিকভাবে। তারপরেই হয়েছে গোলমাল, আর ছাড়ান নেই!

—"একসকিউজ মি, এদের সঙ্গে আমার একটু কাজ ছিলো। সেটা সেরে নিই?"

—"অফ কোর্স, অফ কোর্স। আপনার এই ইয়ং লেডিদের আমি একটু এন্টারটেইন করছি মাত্র। তবে এদের খুব একটা ইন্টারেস্ট দেখছি না। নন্-অ্যানালিটিকাল মাইন্ডের এটাই দোষ। স্লাইটলি ডাল কিনা? সায়েন্সে এই ব্রেন চলতো না।" ভদ্রলোক ডাস্টারটি অল্প অল্প ঠোকেন। অল্প অল্প ধুলোর কুয়াশা ছড়ায়। আমি যারপরনাই বিব্রত। মেয়েগুলি চটে গেছে। নাকের ডগা লাল হয়েছে তাদের। টিউটোরিয়াল নিতে এসে এ কী বিপত্তি! যাবার সময়ে ভদ্রলোকের দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেলো দুজনেই। হাসতে হাসতে ভদ্রলোক বললেন—"কী রকম চটেছে দেখলেন তো? ওঃ! কী এক একখানা কটাক্ষ ছেড়ে গেলো সব! ওই যে, ডাল্ বলেছি কিনা? অন্ধকে অন্ধ বলা দোষ, খোঁড়াকে খোঁড়া বলা দোষ, কিন্তু ডাল্‌কে ডাল্ বলাটা হলো মহাপাপ। দি আলটিমেট ইনসালট। সকলেই ব্রিলিয়ান্ট কিনা? সকলেই নিউটন-কোপারনিকাস। নিদেনপক্ষে বুদ্ধিজীবী।"

ততক্ষণে আমি জড়িয়ে গেছি ব্ল্যাকবোর্ডের প্যাঁচে। বিরাট জটিল এক গ্রাফ এঁকেছেন ভদ্রলোক! তার নিচে বাংলায় লেখা "হায়! ভূমণ্ডল!" ভুরু কুঁচকে গ্রাফের জট ছাড়াচ্ছি। ভদ্রলোক চুপচাপ নিরীক্ষণ করছেন।

—"বুঝলেন কিছু? মেকস্ সেন্স টু ইউ?"

—"বুদ্ধি বাড়াকমার হিসেব। বয়স অনুপাতে বুদ্ধির বৃদ্ধি।"

—"আজ্ঞে," ঠিক তাই। এটা কিন্তু আই. কিউ-র ব্যাপার নয়—সেটা জানেন তো? এ আমার নিজস্ব চার্ট। ইন্টেলিজেন্স ক্যোশেন্ট-এর সঙ্গে এর যোগ নেই কোনো।"

—"জানি জানি। কিন্তু এর মানে কী? এটা এঁকেছেন কী করতে?"

—"একটা কথা বোঝাবো বলে। টু ইলাস্ট্রেট আ ফ্যাক্ট।"

—"কাকে বোঝাবেন বলে? স্বাতী-সুদক্ষিণাকে? না আমাকে?"

—"যে বুঝতে চায়, তাকে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ

নিয়ে যিনি চিন্তা করেন, তাঁকে। জীবনের গতিবিধি নিয়ে যাঁর চিত্তে দার্শনিক উদ্বেগের উৎপত্তি হয়, তাঁকে। এই গ্রাফ হলো সর্ববিদ্যার মূল। দাঁড়িপাল্লা। এই চার্ট দিয়েই আপনি জীবন ও জগতের প্রত্যেকটি কার্যকারণ মেপে ফেলতে পারবেন। এবং তার ফলেই, বুঝেও ফেলতে পারবেন। এবং বুঝে, ক্ষমাও করতে পারবেন। সো, এভরিথিং উইল ফল ইনটু প্লেস। দিস ডিলস্ উইথ দা বেসিক্স্।''

—"আচ্ছাঃ ?"

—"বিশ্বাস হলো না ?"

—"না না, মানে, ব্যাপারটা ঠিক—"

—"অনুধাবন, করতে পারছেন না ? স্টাডি করুন, স্টাডি করুন। একটু মন দিয়ে স্টাডি করুন, নিজেই ধরতে পারবেন। ইটস্ ভেরি সিম্পল, রিঅ্যালি!" ভদ্রলোক চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি যৎপরোনাস্তি অস্বস্তিভোগ করতে লাগলুম। টের পেলুম ক্লাসে যখন কোনো প্রশ্ন করে ছেলেমেয়েদের বলি—"চেষ্টা করো, নিজেরাই পারবে—" তখন তাদের কেমন লাগে। বুঝি, না-বুঝি মরিয়া হয়ে বলে দিই—"সিম্পল তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এর সিগনিফিক্যান্সটা কী ?"

—"গুড। দেখুন চার্টটাতে কী আছে। ও কী ? চোখ পিটপিট করছেন কেন ? ইমপেশেন্ট হবেন না, অধীর স্বভাব ভালো নয়। আপনার বয়েস কতো ?"

—"আজ্ঞে ?"

—"বলছি, আপনার বয়েস কতো হলো ? যদিও জানি মেয়েদের বয়েস হয় না, এবং মেয়েদের বয়েস জিজ্ঞেস করতেও হয় না। কিন্তু চার্টটা যে বয়সানুপাতিক। তাই ওটা অ্যাবসলুটলি এসেনশিয়াল। বেয়াদপি মাপ করবেন।"

—"ওই যে, আপনার চার নম্বরের কলামে দেখুন।"

—"ঠিক যা ভেবেছি তাই। আমার কত বলুন তো ?"

—"আপনারও ওই চারের কলাম। থার্টি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ।"

—"আজ্ঞে না। আমি সিক্সটি। হাঃ। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট ?"

এবার সত্যিই অবাক হই। ভদ্রলোককে ষাট ভাবা শক্ত।

—"এ ভেরি ইয়াং অব সিক্সটি, ইয়েস। আই নো ইট।" ভদ্রলোক একটু হাসেন। যে হাসিতে যৌবন উঁকি দিয়ে যায়। "বাট উইথ অল দা উইসডাম অফ মাই সিক্সটি ইয়ার্স। ইয়েস ম্যাডাম। ব্যাক টু দা চার্ট।"

আমার টেবিল থেকে ছাত্রীদের দেওয়া টিউটোরিয়াল খাতা তুলে নিয়ে রোল করে সেটা দিয়ে উনি ব্ল্যাকবোর্ডে পয়েন্ট করে ডেমনস্ট্রেশন শুরু করে দেন। ছাত্রী বলতে আমি একা।

—"এক নম্বর ঘর। এক থেকে বারো। লার্নিং পিরিয়ড। বারো বছর বয়েস পর্যন্ত মানুষ প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু শিখছে। বুদ্ধি কেবলই বাড়ছে। রাইজিং কার্ভ। ও. কে. ?"

—"ও. কে.।"

—"দু নম্বর ঘর। বারো থেকে বিশ। এটাও লার্নিং পিরিয়ড। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এই সময়ে উচ্চতম শিখরে পৌঁছোয়—পীক লার্নিং পিরিয়ড। অর্থাৎ এ জীবনে আপনার বুদ্ধি যতটুকু বাড়বার তা ওই বয়েসেই বেড়ে গেছে। যেমন বডি হাইট। বুঝলেন ? একুশের পরে মানুষ যেমন লম্বায় বাড়ে না, বুদ্ধিতেও বাড়ে না। ফুলস্টপ। আঠারোতেই অবশ্য সাধারণত বুদ্ধির বাড় বন্ধ হয়ে যায়। এও রাইজিং কার্ভ।"

—"আই সী !" মনটা অন্ধকার হয়ে গেলো। হায়, কতো বছর হয়ে গেছে, আমার বুদ্ধি বাড়েনি। এদিকে আমার মেয়েদের বুদ্ধি তরতরিয়ে বাড়ছে। দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়লো।

—"দেখুন, দেখুন, প্রাণভরে দেখুন, পেট ভরে দর্শন করুন। বাট ইউ ক্যানন্ট চেঞ্জ ইট। ইহাই জীবজগতে মনুষ্য নামধেয় প্রাণীটির শারীরিক কানুন। মগজের কোষগুলো বিশ বছরের পরে আরও বেশি কর্মতৎপর হয় না। যেমন ছিল তেমনিই থাকে। স্টেটাস কুও অবস্থায়। বুদ্ধি আর বাড়ে না বটে কিন্তু বুদ্ধি পাকে। অভিজ্ঞতার আগুনে পরিপক্ক হতে থাকে। ওভারকুক্‌ড হবার ভয় নেই কোনো।"

—"বুঝেছি। এবার তিন নম্বরে চলুন।"

—"আঠারো-বিশ টু তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হচ্ছে থার্ড কলম। ওই যে বললাম স্টেটাস কুও। বুদ্ধি বাড়ছেও না, কমছেও না। ক্রেডিট ডেবিট কিছুই নেই।"

—"তার মানে আঠারোতে আর পঁয়ত্রিশে তফাৎ নেই ? তার মানে পঞ্চান্নতেও নেই। সবার বুদ্ধি সমান ?"

—"আহা, সমান কে বলল ? বুদ্ধি না বাড়ুক, বোধ তো বাড়ছে ? মূল্য-বোধ তো বদলাচ্ছে ? দৃষ্ঠিকোণ পালটে যাচ্ছে। জীবনবোধ আকৃতি নিচ্ছে। বুদ্ধির মাপটা সমান, তার ব্যবহারটা তো সমান থাকছে না ?"

—"হ্যাঁ জাজমেন্ট আসে, মেচিউরিটি আসে, ভ্যালুজ তৈরি হয়—তা বলে বুদ্ধি বাড়ে না ?"

—"নো ম্যাডাম। অ্যায়াম সরি। ভবানী আছে ? এক পেয়ালা চা—"

—"চা দেয়নি ?"

—"কফি দিয়েছিল কিন্তু।"

—"ভবানী খাতা জমা দিতে গেছে। চা তো এখন…"

—"থাক থাক, ওতেই হবে। থার্ড আর ফোর্থ কলামে একই ব্যাপার।"

ভদ্রলোকের এক কথা। "বুদ্ধি কমেও না, বাড়েও না। কিন্তু গোলমালটা বাধে ফিফ্‌থ স্টেজে। মগজের মধ্যে ফিফ্‌থ-কলামনিস্টদের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। মগজের কোষগুলো ক্ষয় পেতে থাকে, ভোঁতা হতে থাকে। পিটি, তাই নয় কি? বুদ্ধিই যদি কমে গেলো, মানুষের আর তবে রইল কী?"

—"তা যা বলেছেন। তবে বুদ্ধিটা কি একেবারে হুড়হুড় করে চৌবাচ্চার জল বেরুনোর মতন কমে যায়? না আস্তে ধীরে—"

—"আস্তে-আস্তে। এ আবার বলবার কী আছে? এজিং ইজ আ লিঙ্গারিং প্রসেস। ইট টেক্স ইটস ঔন টাইম। আপনারও হবে। তখন আপনি টের পাবেন না অবশ্য। প্রথম স্টেজ কিনা কনফিউশন। আলটিমেট স্টেজ সেনিলিটি।"

—"কিছু মনে করবেন না, আপনি বললেন আপনি ষাট। অর্থাৎ ঐ ফিফ্‌থ কলামেই পড়েন। আপনিও কি ওই স্টেজটা, মানে কনফিউশনটা টের পান?"

—"অ্যায়াম আ ভেরি ইয়াং অব সিক্সটি। আমি তো আগেই বলেছি আপনাকে?"

—"আমি ম্যাট্রিকে প্রথম হয়েছিলাম। পরাধীন ভারতে ম্যাট্রিকে প্রথম হওয়াটা মুড়ি-মিশ্রী ছিল না। আমার মনের এজিং প্রসেস উইল টেক টাইম।"

—"তা বটে। হতেই পারে।"

—"পড়েননি, সম্প্রতি সালভাদর দালি কী বলেছেন? বলেছেন—'যেহেতু আমি একটি জিনিয়াস সেহেতু আমার মৃত্যু নেই।' আমিও একটি জিনিয়াস। দালির মতো নাই-বা হলাম। তাই আমিও চট করে জরাগ্রস্ত হবো না। আই'ল রেজিস্ট ইট উইথ অল মাই স্ট্রেংথ ফর শুয়্যার।" ভদ্রলোক জানালা দিয়ে বাইরে চাঁপাগাছটার দিকে তাকান।—"আমি দালি নই। মরতে আমাকে হবেই।" মুখ খুব বিষণ্ণ, চিবুক বুক ছুঁয়েছে। ঠুকঠুক করে উনি ডাস্টারটা ঠুকছেন।

আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘুরোই—"আচ্ছা ওই স্তম্ভগুলোর নিচে ঘিঞ্জিমতো কথাগুলো কি? ব্যাখ্যা তো ওইগুলোকেই করতে বলছিলুম।"

—"ও হো, ওটাও তো সিম্পল। আপটু টুয়েল্‌ভ ওনলি লার্নিং প্রসেস! শিক্ষাগ্রহণ। বারো টু আঠারো-বিশ লার্নিং প্রসেস বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে চ্যালেঞ্জিং এভরিথিং ইউ হ্যাভ লার্নট্। রেবেলিং আগেনস্ট ইওর ঔন লার্নিং। এভাবে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানকে ভেরিফাই করে নিয়ে তবেই না মডার্ন ম্যান জীবনে কনফিডেন্স পায়? ইট্‌স হেলদি টু বি আ রেবেল। বুঝেছেন?"

—"বুঝেচি।"

—"ঠাট্টা করলেন? ভেংচি কাটলেন?"

—"আজ্ঞে আমিও ঘটি।"

—খানিক নৈঃশব্দ্য।

তারপর বললেন—"পরের কলামটাতেই জীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন;

সংঘর্ষের, সংঘাতের শুরু। রিঅ্যাল কনফ্লিক্ট—"

—"কোথায়? লিখেছেন তো কম্প্রোমাইজ।"

—"সেই তো। অ্যাম্বিশান এবং কম্প্রোমাইজ। কম্প্রোমাইজ মানে কী?" হঠাৎ ভুরু পেঁচিয়ে ভদ্রলোক নিবিড়ভাবে আমার দিকে তাকালেন। আমি চুপ! উনিও চুপ। তারপর হঠাৎ মুখখানা নামিয়ে আমার কানের কাছে এনে বোমা-ফাটার মতো চেঁচিয়ে উঠলেন—"কম্প্রোমাইজ মানে ডি-ফি-ট!"

আমি বেচারী চমকে, শিউরে, কেঁপে-টেপে একাক্কার। তিনি খুশি হলেন। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দুই পকেটে দু হাত পুরে হাসি হাসি মুখে বললেন—"আর ডিফিট মানে? পুনরায় স্ট্রাগল! অতএব বুঝে নিন, বিশ থেকে পঁয়ত্রিশেই মানুষ ঈভিলের কাছে হার মানতে এবং তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে শিখে নেয়। বুঝলেন? যার অ্যাম্বিশান আছে, কম্প্রোমাইজ তাকে করতেই হবে। হবেই—"

—"কিন্তু চতুর্থ কলামেই তো পরিস্থিতিটা বিশ্রীতম মনে হচ্ছে। লোভ, কৃত্রিমতা, অত্যাচার—এ সব—"

—"আপনার বয়েসটা এখন কতো বললেন?"

—"ওই তো ওইখানেই—"

"থার্টি-থার্টি ফাইভ টু ফিফটি-ফিফ্‌টি ফাইভ তো? ইয়েস, ওয়ার্স্ট অ্যাফেকটেড পিরিয়ড ওটা—অ্যাম্বিশান থেকে লোভ, লোভ থেকে কম্প্রোমাইজ, কম্প্রোমাইজের অবশ্যম্ভাবী ফল হিপোক্রিসি এবং তার পরিণতি টিরানিতে। মানুষ এই বয়েসেই সবচেয়ে দ্রুত অধঃপাতে যায়। সব মূল্যবোধ হারিয়ে ফ্যালে। নীতিবোধ পুটপুট করে ভেঙে পড়তে থাকে ঝ্যাঁটার কাঠির মতন। আমার স্ত্রীও এখন এই কলামেই রয়েছেন। দি মোস্ট ডেনজারাস ইয়ারস। লুক অ্যাট দি অনেস্টি কার্ভ, ওই যে সবুজ রেখাটা -"

—"আরে সবুজ চক পেলেন কোথায়?"

—"রাখতে হয়, বুঝলেন না? ভেরি ইউজফুল। সর্বদা সঙ্গে রাখতে হয়। বলতে বলতে উনি বিলিতি টুইডের জ্যাকেটের পকেটে হাত পুরে একমুঠো রঙিন চকখড়ি বের করে আনলেন।

—"এই তো আমি আপনার ছাত্রীদের প্রথমে এনার্জিনিয়ারিংয়ের একটা ছোট্ট ব্যাপার বোঝাচ্ছিলাম। এনার্জিনিয়ারিংও নয় কোয়ান্টাম মেকানিক্‌স্‌। এটা সবারই জানা উচিত—কিন্তু ওরা একদমই বুঝতে পারছিল না। তখন ওটা মুছে এটা এঁকে দিলাম। এটার জন্য কোনো মেন্টাল ট্রেনিং লাগে না। তারপর যা বলছিলাম—"

—"আমাকে এবার যেতে হবে। সাড়ে চারটে বেজে গেছে—একটা কাজ আছে গড়িয়াহাটে—"

—"হবে, হবে সব হবে। আগে অনেস্টি-কার্ভটা বুঝবেন না? সেটাই তো

আসল ! দেখুন, দেখুন, মানুষ কীভাবে নষ্ট হয়। জীবন কীভাবে পচে যায়—"

—"বেশ তো, একটু যদি চটপট করেন—"

"এই তো—ঐ যেটা আঁকা রয়েছে সেটা সাধারণ মানুষের অনেস্টি-কার্ভ। সাধারণ মানুষ আঠারো-বিষবছর বয়েস অবধি মোটামুটি সৎ থাকে। তারপরে পড়ে যায় উচ্চাশার ফাঁদে। আর শুরু করে নষ্ট হতে। পচন ধরে জীবনে। এই দেখছেন সততা রেখার অধঃপতন ? তিরিশ থেকে পঞ্চান্নোয় ম্যাকসিমাম। তারপর থেকে ঐ একই থেকে যায়। এইবার দেখুন অন্যদের বেলায় কী হয়।" উনি আরেকটা রঙিন চক তুলে নিলেন। এবং যত্ন করে হিসেব করে আরেকটি রেখা আঁকলেন চার্টে।

—"এই হচ্ছে অনেস্টি-কার্ভ নাম্বার টু—সততা রেখা দুই নং—ব্যবসায়ী আর বুদ্ধিজীবীদের হিসেবটা দেখুন এবার। এদের নৈতিক অধঃপাত ঢের দ্রুত-বেগে ঘটে এবং ঢের বেশিদিন ধরে চলতে থাকে। পঞ্চাশের কোঠায় থামে না, সত্তর-পঁচাত্তর পর্যন্ত অবারিত থাকতে পারে। এবং এরা সমাজের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা রাখে। রাখে কিনা বলুন? বিজনেসমেন অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল্স।"

—"ঠিক কথা। অ্যাঁ? কী বললেন? ব্যবসায়ী আর?"

—"বুদ্ধিজীবী। ইন্টেলেকচুয়াল্স। মানে এই যে আপনি-আমি। সত্যজিৎ রায়। সুকুমার সেন। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? উই আর হার্মফুল পিপ্ল। এবার দেখুন সততা রেখা তিন, শেষ কার্ভ। এটাই সমাজে যারা সবচেয়ে শক্তিমান লোক তাদের হিসেব অর্থাৎ পোলিটিশিয়ান এবং জার্নালিস্ট। সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদদের অধঃপতন অন্তহীন। কখনো থামে না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ এবং ততদিনই বাঁশ।" বলতে বলতে আরেকটি নতুন রেখা যত্ন করে আঁকছিলেন, যার দেখলুম অনন্ত অধোগতি। চার্ট থেকে বেরিয়ে লাইন বোর্ডের ফ্রেমে উঠে গেলো।—

—"এরাই সব্বার চেয়ে ভয়াবহ। আন্স্ক্রুপুলাস্। নীতিবোধের ধার ধারে না। বিবেক পর্যন্ত নেই। কী? এগ্রি করছেন না?"

—"আমার এগ্রি করা না-করায় কী এলো-গেলো? আমি তো ওই এক নম্বর কার্ভের অন্তর্গত। যাদের কোনো ভালোমন্দের ক্ষমতা নেই। অল্পস্বল্প লোভ আছে।"

—"আজ্ঞে না। মাস্টার হওয়া অত সোজা নয়। সব শালা মাস্টার ইন্টেলেকচুয়াল মনে করে নিজেকে এবং যথেষ্ট ক্ষতি করার শক্তি রাখে। বললুম না এক্ষুণি উই আর হার্মফুল পিপ্ল? এক নয়, সততা রেখা দু'নম্বরে পড়েন আপনি।" একটু থেমে সান্ত্বনার সুরে বললেন—"আমি অবশ্য আরো ডেন-

জারাস। আপনার চেয়ে ঢের বেশি কেপেবল অব হার্ম—ওয়ার্স্ট অব দ্য লট—বুঝলেন, শুধু তো মাস্টারই নই, আমি আবার একজন জার্নালিস্ট এবং পলিটিক্সও করি।"

—"তাই নাকি? কী রকম? কী রকম?"

—"হিউম্যান সায়েন্স ক্রনিকল বলে আমি একটা ইন্টারন্যাশন্যাল বুলেটিন বের করি। একসঙ্গে দিল্লি, নাইরোবি, ক্যানবেরা, অটোয়া, ডাবলিন থেকে বেরোয়। প্রত্যেক কন্টিনেন্টে অফিস আছে। আমিই চীফ এডিটর। আগে ওয়াশিংটন থেকেও বেরোতো। রেগন বন্ধ করে দিয়েছে। আমি তো ওকে কনটেস্ট করেছিলাম গত প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশনে ইনডিপেনডেন্ট ক্যানডিডেট হিসেবে। হেরে গেছি বটে কিন্তু আবার দাঁড়াচ্ছি। এবারে আমার জোর ঢের বেশি।" ভদ্রলোক বিনয়ী হেসে সাহেবী কায়দায় নিচু হয়ে 'বাও' করেন।

আমার যেন মাথায় কেউ হাতুড়ির ঘা মেরেছে। এক ঝটকায় যেন ঘুম ভেঙে গেলো। মগজের মধ্যে জোর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সতর্ক হয়ে নড়েচড়ে বসি। ঘড়ি দেখি। বইপত্তর গোছাতে শুরু করি।

—"প্রেসিডেন্ট রেগন জীবজগতের পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর বস্তুপিণ্ড—আই মাস্ট ডেলিভার দি ওয়ার্লড ফ্রম হিজ ঈভিল গ্রিপস্—বুঝলেন না?"

—"ঠিক কথা। কিন্তু আপনার অনেক দেরি হয়ে গেলো। আমাকেও এবার বেরুতেই হবে।"

—"নানা আমার দেরি কিসের? আমি তো এখন ভেকেশনে—আমার ফিরতে দেরি আছে।"

—"আপনি কোথায় থাকেন?"

—"এই যে, ঠিকানাটা রেখে দিন, প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।" আমি বাধা দেবার আগেই সেই টিউটোরিয়াল খাতা থেকে চড়্‌চড়্ করে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিলেন। এবং নিজের পকেট থেকে দামী কলম বের করে লিখতে শুরু করে দিলেন। গোটা গোটা হরফে ইংরিজিতে লেখা হলো : ডক্টর চক্রবর্তী রাজশেখর, H. O. D. H. S.। রাঁচি মহাবিদ্যালয়, কাঁকে, বিহার, ইন্ডিয়া, এশিয়া। মৃদু হেসে কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন,—"বিহার বড়ো ভালো জায়গা বুঝলেন? বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে। শ্রীহরির বসন্ত বিহারের স্থান কিনা, তাই নাম হয়েছে বিহার। এ থেকেই বুঝে নিন জয়দেব বাঙালীও নয়, ওড়িয়াও নয়, বিহারী। একবার চলে আসুন না কাঁকেতে—জয়দেবের দেশ, ফাইন কান্ট্রি-সাইড।"

—"আচ্ছা H. O. D. H. S. মানে কী?"

—"আশ্চর্য তো? H. O. D. জানেন না? হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট। আর সাহিত্য পড়ান H. S. জানেন না? অবাক করলেন, সত্যি!"

লজ্জা পেয়ে বলি,—"H S. মানে কি হায়ার স্টাডিজ ?"

—"আজ্ঞে না। আপনার মাথা।"

—"হেল্থ সার্ভিসেস ?"

—"আপনার মুণ্ডু।"

—"তবে কী ?"

—"হিউম্যান সায়েন্সেস। হিউম্যান সায়েন্সেস জানেন না ? অবিচারটা দেখুন একবার ? ফিজিকাল সায়েন্স আছে, বায়ো-সায়েন্স আছে, সোশ্যাল-সায়েন্স আছে, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স পর্যন্ত আছে, অথচ যার জন্যে এত সব সেই হিউম্যান সায়েন্সই নেই ? নৃতত্ত্ব, অ্যানথ্রোপলজি মানে অবশ্য তাই, কিন্তু তার ব্যবহারটা হচ্ছে স্পেসিফিক অর্থে—জেনেরিক হেড নয় কোনো। বলুন দিকি লিটারেচার, ল্যাঙ্গুয়েজেস, ইয়োগা, মেডিটেশন, জ্যোতিষ, হিপনোটিজম, প্যারাসাইকোলজি এসব যাবে কোন্ হেড-এর তলায় ? এই জন্যেই তো ইউ. জি. সি. এদের টাকা-পয়সা দিতে পারে না। বুঝছেন ব্যাপারটা ?"

—"বুঝলুম।" উঠে পড়েছি। ঝোলা কাঁধে।

—"আগে অবিশ্যি পড়াতাম ইলেকট্রিক্যাল, কোলিগ ছিলাম আপনাদেরই। একটু প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেন্টের পর থেকে রাঁচিতেই পোস্টেড। হিউম্যান সায়েন্সেস পড়াচ্ছি। আর এইসব রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত আছি। যেমন এই চার্ট-টা। আমার নতুন বইটা পেঙ্গুইন নিয়েছে।" কথা কইতে-কইতে ভদ্রলোক হাতের চকগুলো ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো করছিলেন। এবার ডাস্টারের পিঠ দিয়ে সেগুলো টেবিলের ওপর বাটনা বেটে পিষে ধুলো-ধুলো করতে লাগলেন। তারপর কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলো। পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে ঝুঁকে পড়ে মুঠো-মুঠো খড়ির গুঁড়ো তুলে নিয়ে তিনি টেবিবিলময় লেপতে শুরু করে দিলেন। টেবিল ধূসর হয়ে গেলো। তাঁর জ্যাকেট খড়ির গুঁড়োয় মাখামাখি হয়ে যেতে লাগলো। আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে নিবিষ্টচিত্তে উনি টেবিলে চক মাখাতে থাকেন···চকের গুঁড়ো উড়তে থাকে হাওয়ায় চিতাভস্মের মতো, বাতাস ছেয়ে যেতে থাকে, দেখতে দেখতে ওঁর নাকে-মুখে-চুলে-চশমায়-গোঁফেতে-দাড়িতে-ভুরুতে চকের প্রলেপ পড়ে যেতে থাকে—ধুলোয় আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, ওঁর দৃষ্টি স্পষ্টতই উদ্‌ভ্রান্ত—চকের গুঁড়ো দিয়েই উনি যেন জগতের সব অশুভ মুছে দেবার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর—আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—"পাঁচটা বেজে গেছে। আমি যাচ্ছি।"

মুহূর্তেই নিজেকে ফিরে পেলেন রাজশেখর চক্রবর্তী। হাতজোড় করে বললেন—"নমস্কার। আমিও চলি।"

বুঝতেই পারছি বলে লাভ নেই তবু মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—"সেলিমার

খবরটা ?" হো হো করে অট্টহেসে উঠলেন ডঃ চক্রবর্তী। "হাউ গুড অফ ইউ টু রিমেম্বার ম্যাডাম। আপনাকে অযথা উদ্বিগ্ন করেছি বলে মাপ চাইছি। সেলিমা দিব্যি ভালো আছে। মোপেড কিনেছে। রোজ মোপেড চালিয়ে আপিসে যাচ্ছে।"

—"তবে যে বললেন—"

—"গল্প। গল্প দিলাম। ওটা তো আপনাকে টেস্ট করবার জন্যে।

—"মানে ?"

—"মানে আপনি কী মেটিরিয়্যাল সেটা আগে জানতে হবে না ? খাঁটি না মেকি ?"

—"অর্থাৎ ?"

—"অর্থাৎ ছেলেবেলার বন্ধুকে যার মনে থাকে না, তার ভালোমন্দে যার কিছু এসে যায় না তেমন লোকের সঙ্গে আমি সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলাম না। তাই পরীক্ষা করে নিলাম।"

—"আই সী।" রাগে গা জ্বালা করছে।

—"যাক্ পাস করে গেছেন। থ্যাংকিউ"—বললেন রাজশেখর, "আজকালকার দিনে কে আর কার কথা ভাবছে বলুন ? কেই বা কাকে মনে রাখছে ? হিউম্যান সায়েন্সেস সবচেয়ে নেগলেকটেড ডিসিপ্লিন নয় কি ? থিংস ফল অ্যাপার্ট, দি সেন্টার ক্যান নট হোল্ড—"

দীর্ঘ পা ফেলে সর্বাঙ্গে খড়ির গুঁড়োমাখা এক ধূলিধূসর প্রেতের শরীর আমার অফিস থেকে বেরিয়ে যায়।

চোর-ধরা

ইতুকে আপনি চেনেন। রেডিওতে তার গলা শুনতে পেলেই আপনার হাতের গ্লাস হাতেই থেকে যায়, একপায়ে জুতো পরে আপনি ভুলে অন্য পায়ে চটি গলিয়ে ফ্যালেন। আমার বোন ইতু এমনই গুণের মেয়ে। কিন্তু আমার বোনাইকে আপনারা চেনেন না। তিনিও অনেক গুণের আধার। তাঁর নিজের বিশাল একটা আইন কোম্পানি আছে, যার তিনি ডিরেক্টর। অনবরত প্লেনে চড়ে হিল্লি-দিল্লী—ট্রম্বে-বম্বে চর্কি ঘুরছেন। খুব রাশভারী, দিব্যি ধীর-স্থির দেখতে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অস্থির, অধৈর্য, আর একটু রাগী। তবে হ্যাঁ, মনটা উদার। বেশ দিলখোলা, দরাজহস্ত। লোকটা খারাপ নয়। সব্বাই চাঁদা দেন, চাইলেই বিজ্ঞাপন দেন, এমনকি বিনা পয়সায় ইতুর রেকর্ড পর্যন্ত বিলিয়ে দেন ভক্তদের মধ্যে। শুধু কি তাই? নিজের সলিসিটরস্ ফার্ম অথচ বিনা পয়সায় যে কোনো লোককেই আইনের মারপ্যাঁচ বাৎলে দেন, আর চেনা বেরুলে তো কথাই নেই। কেস পর্যন্ত লড়ে দেবেন ফ্রী-তে। ইতুই তাঁর জীবনসর্বস্ব, নয়নমণি। উঠতে ইতু, বসতে ইতু, খেতে ইতু, শুতে ইতু। মানুষটি ইতুসর্বস্ব। এই জাঁদরেল ব্যারিস্টারকে কোমরে গুঁজে রেখে অনায়াসে ইতু সংসার করে, ছেলেপুলে সামলায়, ছাত্রছাত্রী সামলায় এবং নিজের গানকে দিনকে-দিন উন্নত করে। কিন্তু একা স্বামীটিকে নিয়ে তার যত ঝামেলা; পনেরোজন বেসুরো ছাত্র, তিনজন অবাধ্য কাজের লোক, কোয়ার্টার ডজন অপোগণ্ড সন্তান নিয়েও তার আক্কেল গোলমাল নেই। ইতু দশভূজার মতো ছুটে ছুটে সবদিক সামলায়।

আমি দিদি বটে, মুগ্ধ নয়নে ছোটোর করিৎকর্ম দেখি, আর অবাক হই। সেদিন রোববার। সকালবেলা ইতুর বাড়ি গেছি। রোববার দিন সকালে গানের ক্লাস থাকে সব গাইয়ের, কেবল ইতুরই থাকে না। তার আরো দশটা সংসারের কাজ থাকে। সোমদেবের ছুটি, ছেলেমেয়েদের ছুটি। সেদিন সকালে গিয়ে দেখি বাড়িতে ভীষণ অবস্থা। বসার ঘরের একদিকে ডাঁই-করা কেবল কুশনের স্তূপ। চেয়ার, সোফা, কৌচ সব পালিশ হচ্ছে। নেপথ্যে ইতুর "পারবো না", "হবে না", "এখন থাক" এইসব শুনতে পাচ্ছি। খাবার টেবিলে ইতু বসে আছে, হাতে ধোবার খাতা। ধোবার পাওনা মেলাচ্ছে। ওহো, আজ যে দোসরা। মেঝেয় ধোবার পুঁটলি রয়েছে, নীটলি বাঁধা। ধোবাও খুব নীটলি বসে আছে। উবু হয়ে। মেঝেয় আরো একজন লুঙ্গিপরা লোক থলে হাতে বসে আছে। উবু হয়ে। ইতুই এলো-মেলো চুলে হাউস-কোট চড়িয়ে, ভুরু কুঁচকে, আঙুলের কর

গ্নছে। ভাবলাম, যাই রান্নাঘরে বরং একটু চায়ের খোঁজ করিগে যাই। গিয়ে দেখি ঝটিকার বেগে রান্না হচ্ছে—সুখদা (যাকে সোমদেব আবার 'শুকতারা' বলে ডাকে) হঠাৎ ভয়ানক ব্যস্তভাবে নড়াচড়া করছে। সাধারণত সুখদা অত্যন্ত ধীরগতি। সুধীরা নামই তাকে ভালো মানাতো।

—"কী ব্যাপার, সুখদা? এত তাড়া কিসের?"

—"ঝাবুনি? এক্ষুনি আমাকে ঝেতি হবে—টেরেনের টাইম হয়ো গেল-"

—"কোথায় যাচ্ছ?"

—"ঘরে গো ঘরে। লাতিটার ভাত লয়? বড় লাতি বলে কথা! পাঁচ পাঁচটা মেইয়্যার পরে এই ছেল্যে। উপোর তৈরি বালা নিইচি, ছোড়দিদি গইড়ে দেছে। আজ ঝাবো, তা ঝামাইবাবু এখনো বেরুলোনি—আমারো দেরি—"

—"আজকে সোমদেব কোথায় বেরুবে? আজ তো রবিবার।"

—"কি জানি ডিল্লি না ম্যাড্ডাস কোথায় ঝ্যানু ঝাবে। মক্কেলের নোক গাড়ি নে এস্যে বস্যে আছে, সোঙ্গে নে ঝাবে। ঝামাইবাবু ছোড়দির ওপর চোটপাট কত্তিচে বাক্স গুইচে দেয়নি বলে, ইদিগে একটুকু আগে আগে বললে তবে তো গুইচে আকবে?"

—"তোমরা চা খেয়েছো, সুখদা?"

—"দিচ্ছি, দিচ্ছি। ঝেক্ষুনি আন্নাঘরে এয়েচো, তেক্ষুণি বুজিচি, চা! হাতটোক্ খালি হলিই দেবো। ধৈর্য ধরো বড়দিদি!"

এই সুখদাকে আমার মাই ইতুর সঙ্গে দিয়েছেন। বিয়ের দিন থেকে আছে। আমাদের কুটুম বলে গেরাহ্যি করে না। —হঠাৎ ইতুর ঝাঁঝালো গলা এলো— "তুমি এখনো বসে আছো? বলছি আজকে কাগজ বিক্রি করা হবে না! তবু যাচ্ছো না? কী আশ্চর্য! বলছি আমার আজ সময় নেই? না, খগেনেরও সময় নেই। না, না, না, সুখদারও একদম সময় নেই। আচ্ছা জ্বালালে তো?"

আর যাবে কোথায়? খুন্তি হাতে করে সুখদা তেড়ে বেরুলো—"ঝাও, ঝাও, বেশি ঝামালি কোরনি, কে তোমাকে ঢুকোলে ঘরের মদ্যি? খগেন! খগেন ছোঁড়ার কাণ্ড দ্যাকো!"

লোকটি সুখদাকেই যে ইতুর চেয়ে বেশি মান্য করে, সেটা স্পষ্ট বোঝা গেলো —থলে-টলে সুদ্ধু এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালো, এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্রস্থান করলো লুঙ্গিপরা ব্যক্তিটি। ধোবাও উঠে পড়েছে। ধোবা তার পোঁটলা-পুঁটলি সামলে নিয়ে বেরুতে না বেরুতে এসে পড়ল গয়লা। এসব তেড্যাঙ্গা দশতলা বাড়িতে চাঁদার অত্যাচার নেই, ভিকিরির অত্যাচার নেই, সেল্স গার্লের অত্যাচারও ঢের কম। কিন্তু গয়লা, ধোবা, কাগজওলা—এরা তো আসবেই। কষ্ট করে এরা সারা মাস আসছে, এদের ন্যায্য পাওনা মেটাতে মাসে একটা সকাল এদের না দিলে চলবে কেন? ইতু মন দিয়ে যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করতে

লাগলো—"দিদি, এসেছিস ? আয় ভাই—তোর গেছোদাদা ভগ্নিপতির বাক্সটা গুছিয়ে দে না—"

—"ও বাবা, ও তুই করগে যা। আমি বরং তোর গয়লার হিসেবটা করে দিচ্ছি। দে, খাতা দে।"

—"ইতু! ইতু! ইতু! ইতু!"

—"ওই দ্যাখো! ষাঁড়ের মতো গর্জন শুরু হয়ে গেছে।"

—"এ বাক্সটা নয়, এ বাক্সটা নয়, অন্যটা! হলদেটা দাও! যাতে বাক্স ডেলিভারি নেবার জন্যে একঘণ্টা এয়ারপোর্টে আটকে থাকতে না হয়। হলদেটা ছোটো আছে, সঙ্গে নেয়া যাবে প্লেনের কামরায়।" পাজামা-পাঞ্জাবি ও একগাল ফেনা-সমেত সোমদেব এসে দাঁড়ালো চটি ঘষতে ঘষতে। হাতে দাড়ি কামানোর ক্ষুর। কাঁধে তোয়ালে।

—"আচ্ছা, তুমি চানটা সেরে নাও না। আমার এক্ষুণি হয়ে যাচ্ছে।" সোমদেব গয়লার ওপর চোখ পাকায় এবার।

—"কৌন হ্যায় তুম? গয়লা? আভি নেহী। আভি ভাগো। বাদমে আও। দুপহরমে। তিন বাজে আও।"

—"না! না! তিন বাজে খবরদার আসবে না। আমি তখন একটু শোবো। এই তো হয়ে গেলো। দাঁড়াও। পয়সা লে-কে যাও। এই, এই—যেও না —রামদেব। ও রামদেব—" ইতু চেঁচায়।

—"সবুজ স্লিপিংস্যুটটা দিয়ে দিও। আর সুতির ড্রেসিংগাউনটা। শীত কমে গেছে।" সোমদেব চলে যায়।

—"আচ্ছা বাবা আচ্ছা। দিচ্ছি, দিচ্ছি। দুধের হিসেবটা আগে করে নিই—" রামদেব ফিরে এসেছে লাজুক পায়ে।

—"দিদি, ছোড়দি, এই লাও চা। আমারটা এবারে বুজিয়ে-সুজিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাই—"

—"বাঃ! সুখদা সত্যিই সুখদা। চা হয়ে গেলো?"

—"একটু সবুর করো। তোমার হিসেব রেডি হয়েই আছে—" চায়ে চুমুক দিতে দিতে গয়লার হিসেব শেষ, সে যেই টাকাপয়সা নিয়ে চলে গেলো, ইতু সুখদাকে ডাকলো। সঙ্গে সঙ্গে তুতু-মিতুর আবির্ভাব।

—"মা! মা! আমরা দক্ষিণী-তে চললুম—"

—"আরে? খেয়ে যা।"

সজোরে ঘাড় নেড়ে ওরা বলে ঃ

"খাওয়া হয়ে গেছে।"

—"কী খেলি? কখন খেলি?"

জুতো পরতে পরতে মেয়েরা কোরাসে উত্তর দেয়—

—"দুধ। আর জেমস্। অনেকক্ষণ।"

—"জেমস্? জেমস্ মানে ঐ গুলিগুলি চকলেট? ওটা একটা খাবার?

—"কী করবো? সুখুদিদি খাবার দেয়নি তো।"

—"সুখীদিদির রান্না শেষ হয়নি যে।"

এবার মাসি হিসেবে আমি ফিল্ডে নামি।—"তাই বলে তোমাদের খাবার দেবে না! সুখদা!"—

ইতু কিন্তু সুখদাকে দোষ দেয় না—মেয়েদেরই বকে—

—"নিজে নিজে রুটি মাখন চীজ নিয়ে নিতে পারো না? এক-একদিন যদি অসুবিধে থাকেই! ফ্রিজে তো সবই আছে—নিজে হাতে বের করেও নিতে পারো না? এতো কুঁড়ে?" ইতু কথা বলতে বলতেই খাবারদাবার বের করে ফেলেছে, প্লেটও লাগিয়ে ফেলেছে, মেয়েরাও ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রুটিতে মাখন লাগাতে শুরু করেছে। এবার ইতু ছুটলো শোবার ঘরে। বাক্স গুছোতে হবে।

আমি দেখছি, আর মুগ্ধ হচ্ছি। এই সেই ইতু? মা ঠিক এই ভাষাতেই বকতেন আমাদের। আমরাও খাবার না খেয়ে, দুধ খেয়েই খেলতে পালাতুম। হিস্ট্রি রিপিট্স ইটসেলফ্।

বাক্স গুছোতে ইতুর বেশি সময় লাগলো না। বন্ধছন্দ করে বাইরে এনে রাখলো। সোমদেব যাবার সময়ে নিয়ে যাবে। অনবরতই তো সে বাইরে যাচ্ছে, ইতুর মুখস্থ হয়ে গেছে কী কী দিতে হবে। অটোমেটিক প্যাকিং সিস্টেম।

সবুজ স্লিপিংসুট ভিজে। লালটা দেয়া হলো।

—"সোমদেব ঠিক রেগে যাবে। যাকগে। স্লিপিংসুট নিয়ে কি কেউ মাথা ঘামায়? যত পাগলের কাণ্ড! দেখছিস্ দিদি?"

ইতিমধ্যে সুখদা দেখি ফর্সা ধুতিটি পরে বগলে চাদরটি নিয়ে এসে হাজির। ইতু এবার সুখদাকে নিয়ে পড়লো। দুই মেয়ে দক্ষিণীতে বেরিয়ে গেছে। ছেলে যায়নি, সে বারান্দায় বন্ধুদের সঙ্গে চেঁচিয়ে আড্ডা মারছে। গলা শুনতে পাচ্ছি। এটা ভালো লক্ষণ। আজকাল তো ছেলেরা যে যার দোর বন্ধ করে উচ্চগ্রামে বিলিতি মিউজিক চালিয়ে কী জানি কী গুজগুজ করে। ফুটবল খেলা নিয়ে তুমুল তর্ক, সিনেমা নিয়ে ফাটাফাটি ঝগড়া, এসব তো আজকাল দেখিই না। শুভটা এদিক থেকে ভালো। খেলাধুলো, চেঁচামেচি, সবই করে। ইতু সুখদাকে বোঝাচ্ছে—"এই যে ধরো তোমার নাতির রুপোর বালা, দু'গাছা, বুঝলে? এই যে, এই কাগজটা যত্ন করে তুলে রাখবে, ছেলেকে দিয়েও দিতে পারো— বুঝলে? এতেই সব হিসেব লেখা আছে—ওজন কতো, মজুরী কতো, কতটা রুপো আছে, সব। সবকিছু মিলিয়ে পড়েছে দেড়শো টাকা। আমার কাছে তোমার পাওনা ছিলো পাঁচশো। দেড়শো বাদ গেলে বাকি রইলো সাড়ে তিনশো।

সাড়ে তিনশো এই ধরো। তিনটে একশো টাকার নোট এক্ষুনি তুলে রাখো। ট্যাঁকে অতোটা গুঁজো না একসঙ্গে। যদি হারিয়ে যায়?" ইতুর হিসেবে বোর্‌ড হয়ে গিয়ে আমি একবার শুভর কাছ থেকে বারান্দায় ঘুরে এসে দেখি সুখদা রান্নাঘরে চলে গেছে। পিছু পিছু ইতুও ছুটেছে—এবং তার বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে—

—"কাগজটা সেই ট্যাঁকেই রাখলে? বালার সঙ্গে মুড়ে ওটাও তোমার ঝোলাতে রাখা উচিত ছিলো। আর এই আলাদা খুচরোটা রাখো বাসভাড়ার জন্যে, এটা ট্রেনভাড়ার জন্যে। অতো টাকা যেন বের করবে না—"

উঃ—সুখদাকে নিয়ে ইতু যেন মেতে উঠেছে। কার যে নাতির ভাত, বোঝা দায় হয়েছে। সুখদা এবার বললে—"হয়েচে, হয়েচে। সব বুজ্জিচি, এই কি আমি পেরথম ঘরে যাচ্চি ছোড়দি? তুমি যেন আমাকে ছোটোছেলে ঠাউরেচো।"

—"কিন্তু তোমার সঙ্গে কেউ নেই, অতগুলো টাকা, পায়ে বাতের ব্যথা—আমার ভাবনা হবে না? সুখদা, দেখো ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো বাপু সামনের রোববার। দেখছো তো আমার কী অবস্থা—"

—"সে আসবুনি? নিচ্চয় আসবো।"

ইতিমধ্যে একফাঁকে সোমদেব এ ঘরে এসে হাত নেড়ে টা-টা করে চলে গেছে। তার মক্কেলের তরফে যে লোকটি নিতে এসেছিলো, সেও এলো সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক চামচার মতো। পেছু পেছু এলো। আবার পেছু পেছু গেলো।

এবার ঠাকুর নমস্কার করে, রান্নাঘর বন্ধ করে, খগেনের কাছে বিদায় নিয়ে, শুভকে বলে-টলে, সুখদা খাবার ঘরে এসেই চীৎকার করে উঠলো।—

—"অ খগেন, আমার পোঁটলাটা কী করলি?"

—"তোমার পোঁটলা? তোমার পোঁটলা আমি কী করবো? সেই তো সক্কাল থেকেই এইখানে পড়ে আছে। বুড়ো হয়েচো বলেই এতো ভুলো হতে হয়? নিজের জিনিস নিজে খেয়াল করবে না—" বলে গজগজ করতে করতে খগেন ঘরে এসে টেবিলের ওপাশে গিয়েই অবাক!

—"আরে? নেই তো? গেলো কোথায় সুখুদিদির পোঁটলাটা?"

সবাই হতবাক্। সত্যিই তো? সুখদা মাথা চাপড়ে কেঁদে উঠলো।—"হায়, হায়, হায়। কে লিয়ে পালালে গো আমার পোঁটলা।"

—"বুঝিচি! বুঝিচি! ওই খবরের কাগজওলাটার কাণ্ড! লিচ্চয় ওর থলেতে পুরে নিয়ে চলে গেছে। ওইখানেই তো বসেছিলো লোকটা।"

খগেন চেঁচিয়ে ওঠে···"সত্যি। লোকটা ঠিক ওইখানেই বসেছিলো। আর চুপচাপ বসেছিলো অনেকক্ষণ। ঐ জন্যেই। তাক্ খুঁজছিলো আর কি।"

ইতু একবার ধোবাকে নিয়ে ব্যস্ত, একবার গয়লাকে নিয়ে ব্যস্ত, কেউ তো ওকে মোটে দেখছিলোই না। নির্ঘাৎ ওই কেটে পড়েছে সুখদার পোঁটলা নিয়ে। পালিশমিস্ত্রি চুপচাপ কাজ করছিলো, এবার সেও যোগ দিলো—

"কিন্তুক ও তো থলে খোলেইনিকো মোটে! মা, ধোপাটাই হয়তো ভুল করেছে। ওর দু'চারটে ছোটো ছোটো পোঁটলা ছিল তো ওখানে, অন্য অন্য ঘরের কাপড়ের বান্ডিল,—হয়তো বা তাদেরই সঙ্গে—"

—"না, না, সে কী করে হবে?" হাত পা নেড়ে নিজেই সুখদা বললে—"আমার তো পেলাস্টিকে রপোঁটলা—হলদে রঙের। ঝিপ্ লাগানো। কাঁধে ঝুলোনোর দড়ি-দেওয়া 'বেগ'। ধোপা আমার বেগ লেবে কী ঝন্যি?"

চেঁচামেচিতে উৎসাহিত হয়ে শুভ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

বললে—"হলদে? হলদে ব্যাগ? এইমাত্র দেখলাম একটা হলদে ব্যাগ বাবা ঐ কালো গাড়িতে তুলে দিলো।"

—"সেটা তো তোর বাবার নিজেরই ফ্লাইট ব্যাগ রে!"

—"দাদাবাবুর ব্যাগ? সে তো আমি কখনই ওদের গাড়িতে দিয়ে এসেছি আপনি যেক্ষুনি বের করে দিয়েছেন"—খগেন জানালো।

—"আমি স্বচক্ষে দেখলাম, বাবা নিজের হাতে এক্ষুনি একটা হলদে ব্যাগ—"

"সর্বনাশ! তাহলে তোর বাবাই নিয়ে গ্যাছে রে সুখদার পোঁটলা—শুভ, ছোট্ ছোট্—আমাদের ড্রাইভারকে ধর—এয়ারপোর্টেই চলে যা—এতক্ষণে হয়তো দিল্লিই চলে গেলো সুখদার নাতির বালা—অনেকক্ষণ তো বেরিয়ে গেছে ও—"

—"কে বললে অনেকক্ষণ? এতক্ষণ তো বাবা লাইব্রেরিতে ছিলো। এইমাত্র গাড়িতে উঠলো, আমরা দেখলাম!"

—"তবে যা খগেন, মোড়ের পানের দোকানে ছুটে যা—নিশ্চয় ওখানেই পাবি—কোথায় বেরুলেই আগে গাড়ি থেকে নেমে ওখানে পান কেনে—বেশ কিছু পান নিয়ে যাবে নিশ্চয় প্লেনের জন্যে—দৌড়ে যা—"

—"কিন্তু লিফ্‌টটা নেমে গেছে যে এক্ষুনি—আর তো আসবে না—"

—"যাগ্‌গে, তুই হেঁটেই যা বাবা খগেন—ও লিফ্‌ট ফেরৎ আসার জন্যে দাঁড়াসনি—সুখদার নাতির বালাটা—"খগেন তবু গাঁইগুঁই করছে দেখে ততক্ষণে শুভ ছুটেছে সিঁড়ি বেয়ে—সাততলা দৌড়ে নেমে পানের দোকানে যাবে বাবাকে ধরতে। সঙ্গে সঙ্গে দুড়দাড় করে ছুটলো তার সাঙ্গপাঙ্গরা। মুহূর্তের মধ্যেই বাড়ি ফাঁকা। নিস্তব্ধ। কেবল দেয়ালঘড়িটা উদ্বেগে টিকটিক করে যাচ্ছে।

সুখদা তারই মধ্যে মৃদু মৃদু নাকিসুরে কেঁদে চলেছে—"হায়, হায়, হায়! ঝামাইবাবু কিনা আমার পোঁটলা নে' ডিল্লি চলে গ্যালো গো—আমার আ—র

লাতিটার ভাতে ঝাওয়া হলনি !”

—“কে বলেছে দিল্লি যাচ্ছে তোমার ব্যাগ ?” ফোড়ন কাটে খগেন—“বাবু তো নিজের ব্যাগটাই প্লেনে হাতে নিয়ে উঠবেন, আর ঐ ব্যাগটা ও'র নয় বলে যেই বুঝতে পারবেন, কিছুতেই নেবেন না। মক্কেলের গাড়িতেই পড়ে থাকবে। ও ব্যাগসুদ্ধ সব মাল সুখুদিদির খোওয়া গেলো !”

খগেনের ভাষা শুনে সুখদার শোক আরও উথলে ওঠে।—“আমি তো ট্যাঁকেই নিইছিলুম বালা আর টাকা সবই—ছোড়দিদি আমাকে ঝোর কইরে পোঁটলাতে আখালে। আমি আখতে চাইনি—ওরে আমার অতগুলো ট্যাকা ! আমার লাতির উপোর বালা দুখান !—হায় ভগবান ! হায় কপাল !”

ইতু খুবই লজ্জিত। আমি এক ধমক দিই—

—“গেলে গ্যাছে। আবার হবে। জিনিসপত্তর কি যায় না ? তোমার জামাইবাবুকে বোলো। রুপোর বালা গড়িয়ে দেবে, তিনশো টাকাও দিয়ে দেবে —এখন চুপ করো দিকি ?”

ইতু তো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। উদ্‌গ্রীব। সাততলা দৌড়ে দৌড়ে নামা তো সোজা নয়, শুভর দল যতোই জোরে নামুক। তারা আর পথে বেরুচ্ছে না ! একটা কালো গাড়ি মোড়ের পানের দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে বটে—কিন্তু ওটাই ওর মক্কেলের গাড়ি কিনা কে জানে ? নিজেদের গাড়ি তো নয়। ঈশ ! গেলো সুখদার সর্বস্ব ! কী জানি আরও কতো কিছু সম্পত্তি শখ করে জমিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো ওতে ! বেচারী ! মনিব নিজেই পুঁটলি নিয়ে ভেগেছে ! এমন দুর্ভাগ্য ক'জনের হয় ?

এমন সময় একটা প্রচণ্ড হুংকার কানে এলো। ঐ যে—শুভর দলবল রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। এবং সমস্বরে চেঁচাচ্ছে—“চিন্তামণিদা, গাড়িটা আটকাও।” চিন্তামণি পানওয়ালার নাম। চিন্তামণির সাদা মুণ্ডু পানের দোকান থেকে উঁকি মারলো। এবং পানের দোকানের ওপাশ থেকে হেঁটে এলো সোমদেব। এতক্ষণে ছেলেগুলো এমিল জ্যাটোপেকের মতো দৌড়ুচ্ছে। সাত-তলার ওপার থেকে আমরা দেখলাম ঃ গাড়ির সামনে জটলা হচ্ছে। সোমদেব হাত পা নেড়ে ছেলেদের ওপর রাগারাগি করছে। মক্কেলের চর বেরুলো। বুট খুললো। শুভ ছোঁ মেরে বুট থেকে সুখদার ব্যাগ তুলে নিলো। এবং তার-পরেও কিছু কথাবার্তা হলো। অতঃপর ড্রাইভার উঠলো, সোমদেব উঠলো, মক্কেলের চর উঠলো—সবাই উঠে পড়লো, গাড়ি চলে গেলো। সুখদার পোঁটলা-কাঁধে বিজয়-মিছিল করে শুভর দলবল বাড়ির দিকে আসতে লাগলো হেসে গড়াতে গড়াতে। তাদের সেই আহ্লাদে এবং অহংকারে রাস্তাটাই আনন্দে ঝলমল করে উঠলো—সরস্বতী পুজোতে রঙীন আলোর সারির মতনই সেই হাসির চমকানি।

বীরগর্বে ঝোলাটি এগিয়ে দিয়ে শুভ বললো—

—"এই নাও সুখুদিদি ! হলো তো তোমার পোঁটলা উদ্ধার ? হুঃ হুঃ বাবা, সোজা চোরের প্যাল্লায় পড়েছিলে ? একেবারে দিল্লী পাচার করে দেবার তালে ছিলো—"

সুখদা লজ্জা লজ্জা হেসে শুভর গালটা টিপে দিয়ে (শুভকে প্রচণ্ড লজ্জা পাইয়ে দিয়ে) বললে—"ভাগ্যে আমার দাদাভাই ঘরেই ছেল ? লইলে আমার লাতির ভাতে যাউয়াই হতুনি !" বাধা দিয়ে বেরসিক খগেন বললে—"চলো চলো, আর দেরি কোরো না। টেরেন পাবে না এর পরে।"

ওরা বেরুতে, নিশ্চিন্ত হয়ে আরেকবার চায়ের জল চাপিয়ে খাটে উঠে পা গুটিয়ে আরামসে বসে ইতু বলল, "বাবাঃ বাঁচা গেলো, কী কাণ্ড হতো বলো তো, না-পেলে ? শুভ, তোর বাবা কী বললো রে তোদের দেখে ?"

—"প্রথমেই রেগে গেলো। 'আবার কী চাই ? ব্যাপার কী ? তোমায় মা পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই ?' যেই বলেছি—'সুখুদিদি পাঠিয়েছে, তার পোঁটলা নিয়ে তুমি দিল্লি চলে যাচ্ছো,' বাবা তো ক্ষেপেই লাল—'আর ইউ কিডিং ? ইয়ার্কি হচ্ছে ? আমি আনবো সুখদার পোঁটলা ? কেন ? অ্যাম আই ক্রেজী ? নাকি আমি ক্লেপটোমেনিয়াক ? আমি কি চোর, না পাগল ? কী ভাবিস তোরা আমাকে ? অনেস্টলি ! সুখদার ভিমরতি ধরেছে—' আমি তাও ইন্‌সিস্ট করলাম, তখন রেগেমেগে ড্রাইভারকে বললো, 'বুট খুল' তো।' তখন ব্যাগও বেরুলো।"

—"তারপরে ? তারপর কী বললে তোর বাবা ?" ইতু উদ্‌গ্রীব। আমিও।

—"ব্যাগ দেখে তো বাবা একদম অবাক ! কেবল বলে—'আরে ? এটা আবার কোত্থেকে এলো ? ধ্যাৎ, আমি কক্ষনো তুলে আনিনি—হাউ স্ট্রেঞ্জ !' শেষকালে মিনমিন করে বললে—'ঐ হলদে রঙটা দেখেই হয়তো,'······বাবা খুব লজ্জা পেয়েছে মনে হয়—"

—এবার ইতুর গর্জে ওঠার পালা—"লজ্জা পেয়েছে না হাতি ! হলদে রঙটা দেখেই হয়তো ? অ্যাঁ ? একটা ধর্মতলার ফুটপাতের মাল, আরেকটা খোদ স্যাম্‌-সোনাইটের ফ্লাইট ব্যাগ—দুটো এক হলো ? এই বুদ্ধি নিয়ে যাচ্ছে মামলা লড়তে ? আসুক তোর বাবা ফিরে···" কে বলবে এই গলাই আপনি রেডিওতে শুনে মূর্ছা যান ?

মহানায়ক সুরজিৎদা

"শ্রীমতী কোথায়? শ্রীমতী পাপীয়সী দেবী? হাই! ডার্লিং?" "—জ্বালাবে না বলছি, বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই শুরু হয়ে গেল? উঃ! ছেলেমেয়ের কী শিক্ষাই যে হচ্ছে—"

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে দোর খুলে দেন পাপিয়াবৌদি।

সুরজিৎদার নাইট ডিউটি ছিল কাল। হাতের ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপরে ফেলে দিয়ে একটা জুতো পা ছুঁড়ে দরজার সামনে, অন্যটা পা থেকে ঝেড়ে খাটের কাছে কোনোরকমে খুলে ফেলেই চিৎপটাং হয়ে খাটের ওপরে শুয়ে পড়ে···"আ-আ-আহ্···" বলে একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, তারপর সুরজিৎদা চোখের কোণ দিয়ে বৌদিকে মিটির মিটির দেখতে থাকেন।

এ-ভাবে জুতো খোলা বৌদির একদম পছন্দ নয়। তিনি খেপে যাবেন বলেই সুরজিৎদার এইগুলো করতে ভালো লাগে। পাপিয়াবৌদির সঙ্গে সুরজিৎদার খুনসুটি দেখলে কারুর বিশ্বাস হবে না সুরজিৎদার বেশ বড়সড় দুটো ইস্কুলে পড়া ছেলেমেয়ে আছে।

ঘুমঘুম চোখে পাপিয়াবৌদি কিন্তু রাগ করেন না। জুতো দুটি গুছিয়ে বলেন—"শুয়ো না, ওঠো, আগে মুখে চোখে জল দিয়ে পোশাকটা বদলে ফ্যালো, আরাম পাবে—ইস, কাল থেকে এই জামাকাপড় পরে আছ!"

"হবে, হবে, পরে হবে। আগে দু'কাপ চা করে ফ্যালো দিকি?" বলতে বলতে শয্যাশায়ী সুরজিৎদা একহাত বাড়িয়ে বৌদির কোমর ধরে হ্যাঁচকা টান দেবার চেষ্টা করেন।

বৌদিও কায়দা করে একপাক ঘুরে নাগাল এড়িয়ে হাসতে হাসতে রান্নাঘরে পালিয়ে যান—"ইস্, ন্যাকা, মুখ ধোয় না, নোংরা, আবার বাসিমুখে বউকে আদর করা চাই—হুঃ, বয়েই গ্যাছে—!"

জল চড়িয়ে দিয়েই সাবিত্রী বেরিয়েছিল। সুরজিৎদার ফেরার টাইম তার হিসেব করা। ট্রেতে বিস্কুট আর চা নিয়ে বৌদি ঘরে ঢুকতেই একটি কাপ তুলে নিয়ে সুরজিৎদা হঠাৎ উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েন। ভারী বেডকভারটি তুলে খাটের তলায় উঁকি মেরে বলেন—"এই যে মিস্টার মিত্তির! গুড মরনিং! এবারে বেরিয়ে আসুন, এই যে আপনার মরনিং টী রেডি হয়ে গেছে। আর লুকিয়ে থেকে কী করবেন, লেট যখন করে ফেলেছেন। থ্যাংকিউ ফর লুকিং আফটার মাই ওয়াইফ! কী? কী হলো? বেরুচ্ছেন না কেন? ডাক্তার ডাকতে

হবে নাকি ?"

"যাঃ, কী হচ্ছেটা কী? অসভ্য কোথাকার। আসেও বাবা মাথায়। কুবুদ্ধির ঢিপি! অন্য কাপ চা-টা হাতে করে হাসতে হাসতে খাটের ওপরে বসে পড়েন বৌদি—"বেশ হয় যদি মিত্তিরমশাই এসে পড়েন সত্যি সত্যি"—বলতে বলতেই দরজায় বেল বেজে উঠলো।

সুরজিৎদা তখনও মাটিতে উপুড়। চমকে গিয়ে মেঝে থেকে ঝটপট ভরাভর্তি চায়ের পেয়ালা সমেত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে, মেঝেয় এবং শার্টে চা ছলকে ফেললেন। বৌদি দোর খুলে দিলেন, ঘরে ঢুকলো সাবিত্রী। হাতে দুধের বোতল।

"যাক বাবা, বাঁচালে! আমি ভাবছি বুঝি সত্যি সত্যিই—" গা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সুরজিৎদা বলেন, "ওফ !"

"ওফ কী? বেশ হতো, বেশ হতো যদি সত্যি সত্যিই মিত্তিরমশাই আসতেন। এই যে তোমার বদ রসিকতা ওঁকে নিয়ে, বেচারা ঘুণাক্ষরেও যদি টের পেতেন, ক—বেই আমাদের তাড়িয়ে দিতেন—এত খারাপ কথা তুমি বল—"

"খারাপ কথা মানে? আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। ওঁর ক্ষেত্রে আমি থাকলে যা করতাম, আমি তাই বলি। উনি যে রাত্তিবিরেতে চলে আসেন না, এটা তো ওঁরই বুদ্ধির দোষ—এমন সুন্দরী মেয়ে একা থাকলে—"

"একটা কাজ করো না? নাইট ডিউটিতে বেরুবার আগেই বলে কয়ে যেচে সেধে ছাপানো নেমন্তন্ন পত্তর দিয়ে ওঁকে ডেকে এনে এঘরে মোতায়েন করে গেলেই পারো। তুমিও নিশ্চিন্ত, আমি নিশ্চিন্ত—"

"ওভাবে বলে কয়ে কী আর রোমান্স হয়? আয়্যাম সরি পাপীয়সী দেবী কিন্তু ব্যাচেলর বুড়োরা বেজায় ভীতু হয় আমি দেখেছি। রোমান্সের কোনো সেন্সই থাকে না ওদের। আমি তো বাবা ঠিকই করে রেখেছি যখন নিজের বাড়ি বানাবো, ভাড়াটের সঙ্গে চুক্তিই থাকবে, খোলাখুলি লীগ্যাল এগ্রিমেন্ট যে ভাড়াটের বউয়ের সঙ্গে আমরণ প্রেম করার পূর্ণ অধিকার আমার থাকা চাই। এই রাইট না পেলে বাড়িভাড়া দেব না! ব্যস।"

"হ্যাঁ, ওই শর্তে রাজি হয়ে যে তোমার বাড়ি ভাড়া নেবে তার বউও দেখবে তেমনি হিড়িম্বা রাক্ষসী হবে!"

"হিড়িম্বা? হিড়িম্বা পেলে তো বর্তে যাবো গো? ওরা সব ট্রাইবাল বিউটি, ওদের মোটেই ফ্যালনা ভেবো না! পরমাসুন্দরী না হলে রাজার ছেলেকে ভোলাতে পারে?"

"কেন? হিড়িম্বা চাই কেন? আমাকে আর মনে ধরছে না?"

"আঃ—হাঃ! কী যে বলো? দ্রৌপদী কি সুন্দর ছিলেন না? পড়েছ তাঁর বর্ণনা? অমন পদ্মগন্ধা রূপসী ঘরে থাকতেও অর্জুনের কি উলূপী, চিত্রাঙ্গদা,

'সুভদ্রা, টু নেম আ ফিউ—,'

"ও, তুমি অর্জুন বুঝি? কবে থেকে অর্জুন হলে?"

"তবে কি আমি যুধিষ্ঠির? তুমিই বা কবে থেকে আমাকে যুধিষ্ঠির ঠাওরালে? ওঃ, এতবড়ো কম্প্লিমেন্ট ওয়ার্ল্ডে কেউ কারুর বউয়ের কাছে পায়নি, আয়্যাম সিওর—"

"যাও, তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পারবে না—"

"আমি বাবা চিরকেলে রোমান্টিক হিরো! একটু-আধটু সুইট রোমান্স না হলে আমার দিনই চলে না। যতই সুন্দরী হও, নিজের বউকে নিয়ে তো আর রোমান্স হয় না। হয় কি? তুমিই বলো ডার্লিং? একটু রস না হলে জীবন চলে?"

"অ! আবার রসও চাই? রোমান্সও চাই? এই যে সারা গায়ে চা পড়ে চিটচিট করছে, তাতে তো বেশ একটা রসালো রোমান্সই হলো। হলো না?"

"সাবিত্রী! সাবিত্রী! বোঝো ঠ্যালা! তোমার বৌদির মিষ্টিকথার চোটে আমার জামাকাপড় রসে চিটচিট করছে, মেঝেতেও পিঁপড়ে থিকথিক করলো বলে! শিগগির ন্যাতা নিয়ে এসো দিকিনি—"

সুরজিৎদা এইরকমই। যতক্ষণ যেখানে থাকেন, চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখেন। আর বেরিয়ে গেলেই বাড়ি নিঃঝুম। নিশুত পুরী। করিৎকর্মা মানুষ না হয়েও সুরজিৎদা রেজাল্টের জোরে ইংরিজি কাগজে চাকরিটা যোগাড় করে ফেলেছিলেন এবং পাপিয়াবৌদিকেও। সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকুরিয়াতে তখন সদ্য বানানো এই বাড়ির দোতলা। এখানেই তাঁর দুটি ছেলে-মেয়ে জন্মেছে, বড় হচ্ছে। বাড়িওলা মানিক মিত্তির ব্যাচলর মানুষ। বৃদ্ধা মাকে নিয়ে নিচে থাকেন। নিতান্ত ভদ্রলোক। বয়েসও হয়েছে। নানা সমাজকল্যাণ সংঘের সঙ্গে জড়িত। সময় পেলেই সুরজিৎদার সঙ্গে এসে আড্ডা মারার চেষ্টা করেন। আর সুরজিৎদার চুলদাড়ি পঞ্চাশ ছুঁলেও স্বভাব পঁচিশের কোঠা ছাড়ায়নি। হাতে ফাঁক পেলেই বউয়ের সঙ্গে খুনসুটি করে সময় কাটাতে চান, বউ পাত্তা না দিলে ছেলেমেয়েদের পেছনে লাগেন। মানিক মিত্তিরের সঙ্গে গল্পে তাঁর মন নেই। কিন্তু মিত্তিরমশাই সরল মানুষ, তিনি অতশত বোঝেন না। একা একা থাকেন, সুরজিৎদা ফিরেছেন টের পেলেই সময় নেই অসময় নেই, সুড়সুড় করে উনিও চলে আসেন সঙ্গ পাবার আশায়। পাপিয়াবৌদির বেশ মায়াই পড়ে গেছে এই ভালোমানুষ ভাসুর টাইপের ভদ্রলোকের প্রতি। কিন্তু সুরজিৎদা বিরক্ত। 'ব্যাটা বোর'! বলে আড়ালে গজগজ করেন।

সেদিনও গরম চায়ের পেয়ালাটি, খবরের কাগজটি, তাজা টাটকা সকালটি এবং পাপিয়াবৌদির হাসিমুখ যেই সুরজিৎদার কপালে একত্রে জুটেছে, তক্ষুণি মানিক

মিত্তিরের গলাখাঁকারি শোনা গেল দরজার কাছে। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকেই তিনি বললেন—"এই যে সুরজিৎবাবু, আছেন তাহলে? বাঁচালেন মশাই!"

সুরজিৎদার মুখ সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ হয়ে পড়লো। বৌদি তাড়াতাড়ি মুখে হাসি এনে বলেন, "চা এনে দিই, মিত্তিরমশাই?"

"না, না, বউমা, এক্ষুণি চা খেয়ে এলুম। আজ আমি বড্ড বিপদে পড়ে এয়েচি বউমা, মালগোবিন্দপুরে, মানে ঐ চম্পাহাটির ওদিকে আর কি, একটা ক্লাবের বার্ষিক উৎসব, মানে অ্যানুয়াল ফাংশান আছে এই রোববার। সভাপতি না হয় ওই ক্লাবের প্রেসিডেন্টই হবেন, কিন্তু প্রধান অতিথিই যে পাওয়া যাচ্ছে না! আমাদের সুরজিৎবাবু তো সাংবাদিকতায় বেশ নাম করেছেন, কী বলো? টি. ভি.-তেও মাঝেমাঝেই সাক্ষাৎকার নেন কত সব বিখ্যাত লোকদের, সেই সুত্রে ওঁর নামটাও লোকে জেনে গেছে—ইংরিজি কাগজের রিপোর্টার হওয়াটা গাঁয়ে একটা বিরাট ব্যাপার—ভাবছি ওঁকেই ধরে নিয়ে যাবো। হাতের পাঁচ বলে কথা। না বলো না বউমা, উপরোধে লোকে তো ঢেঁকিও গেলে। এ তো কেবল প্রধান অতিথি হওয়া! তুমিই সুরজিৎবাবুকে রাজি করাও!"

প্রস্তাব শ্রবণে পাপিয়াবৌদির মুখ হাঁ। বাক্‌রহিত।

"আপনাদের সভায়? ওঁকে? প্র-প্র-মানে চীফ গেস্ট?"

"হ্যাঁগো, হ্যাঁ, আর যে কাউকে পাচ্চিনি, আপত্তি আছে নাকি তোমাদের? এই উব্‌গারটুকু করো বউমা!"

আপত্তি? এই প্রস্তাবে সুরজিৎদার সদাই স্মার্ট মুখেও হঠাৎ কেমন যেন বিব্রত ভাব এসে পড়েছে, খানিকটা 'কিন্তু-কিন্তু' আর খানিকটা অভাবিত খুশির কক্‌টেল।

"না না। আপত্তির কী আছে? কিন্তু, আমি তো কখনো—মানে, জীবনে কখনো এসব প্রধান অতিথি-টতিথি তো—এসব ফরম্যাল অনুষ্ঠানে আমাকে কেন,. আর কারুকে বরং—আবার বক্তৃতাও দিতে হবে নাকি রে বাবা?"

খুশির চোটে অজস্র বাক্য অসম্পূর্ণ রেখেও কোনোরকমে একটি বাক্য সম্পূর্ণ করতে পেরে সুরজিৎদা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বৌদি হাসি চাপতে অন্যদিকে মুখ ফেরান।

"থ্যাংকিউ, থ্যাংকিউ! আপনাকে ধরিচি কি আর সাধে?" মিত্তিরমশাই সুরজিৎদাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বৌদির দিকে ফিরলেন। নেবা বিড়িটা আরেকবার ধরিয়ে নিয়ে বললেন—"সুরজিৎবাবু ছাড়া হাতে আর কেউই নেই বলে! আর বলো কেন? এক্সপিরিয়েন্সড্ চীফ গেস্টরা কেউ কি এমন হুট্ করে আসবে? তাদের একটা প্রেস্টিজ আছে না?"

"তাহলে আপনাদের আগে থেকেই কাউকে ঠিক করা উচিত ছিল।" বৌদি একটু অপমানিত গলায় বলেন।

"করিনি কে বললে? কবি হেরম্ব চৌধুরীকে তো ঠিক করা হয়েছিল। ওদিকে ভুল করিনি বাবা! চীফ গেস্ট ফিক্স করে তারপরে তো অন্য প্রোগ্রাম! কিন্তু এমনই কপাল। কবি হেরম্ব চৌধুরীই যে বসিয়ে দিলেন, লাস্ট মোমেন্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দিলেন। রোববার ফাংশন, আর কাল বেস্পতি-বারে বললেন 'যেতে পারবো না'! ভেবে দ্যাখো কাণ্ডটা? আজ শুক্রুরবার। পরশুদিনের জন্যে কোনো ক্লাসওয়ান প্রধান অতিথিকে অ্যাপ্রোচই করা যাবে না। দেয়ার ইজ নো টাইম! মান্যগণ্য অতিথিদের তো একটা মানসম্ভ্রম আছে? আগে থেকে দিনক্ষণ ঠিক করে ওঁদের এনগেজ করতে হয়। কত ব্যস্ত মানুষ সব!"

"হেরম্ব চৌধুরী কেন গেলেন না?" বৌদির ভুরু-পেঁচানো প্রশ্ন।

"প্রিন্সিপল-এর প্রশ্নে। উনি ভেবেছিলেন কেবল রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হচ্ছে, আসলে তো উৎসবটা হচ্ছে চারটে আইটেম একসঙ্গে জড়িয়ে। যেই বলেছি চারটে সাবজেক্ট নিয়েই একটু একটু বলা চাই, অমনি উনি ক্যানসেল করে দিলেন।"

"চা-রটে আইটেম?" সুরজিৎদাই মুখ খুললেন এবার, "কী কী আইটেম শুনতে পারি?"

"ও কিছু না! খুব সিম্পল! ঐ তো—রবীন্দ্র-সপ্তাহ, মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ দিবস, মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মজয়ন্তী আর ব্যায়ামাগারের প্রয়োজনীয়তা। দু'কথা বলা, এই তো ব্যাপার। ওঃ, আরও একটা বিষয় আছে। ভারতবর্ষে হোমোপ্যাথি চিকিৎসার দেড়শো বছর নিয়েও কিছু বলতে হবে ভাই—"

"ওরে ব্বাবা"—সুরজিৎদা পাপিয়াবৌদির কণ্ঠে যুগলবন্দী বিস্ময়রাগিণী বেজে ওঠে।

"ওরে ব্বাবা মানে? হেরম্ব চৌধুরী না হয় কবি, তিনি এতসব নিয়ে বলতে না চাইতেই পারেন। কিন্তু সুরজিৎবাবু, আপনি তো সাংবাদিক, আপনাকে তো ভাই এর প্রত্যেকটাই কভার করতে হয়। অন গ্রাউন্ডস্ অব প্রিন্সিপল আপনার কোনোই ওজর আপত্তি থাকা উচিত নয়। বলো বউমা, উচিত কি?"

"কিন্তু—কিন্তু এতগুলো বিষয় একসঙ্গে উদ্‌যাপন না করলেই কি চলতো না? এগুলো একসূত্রে গাঁথা—"

"কী করে আলাদা উদ্‌যাপন করলে চলে, বলো বউমা? চাঁদা উঠবে কেন? যদি এটাকে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ দিবস না বলি, গাঁ-গঞ্জের জনসাধারণ চাঁদা দেবে কেন? তারা রবীন্দ্রনাথ কী-বা বোঝে? আবার বৈশাখ-শ্রাবণ বাদ দিয়ে রবীন্দ্র-সপ্তাহটা গতবছর থেকে শীতকালেই করা ঠিক হয়েছে, ঐ গ্রীষ্মে কেউ গ্রামে আসতে চায় না, ফ্যান-ট্যান নেই তো! হোমিওপ্যাথির ব্যাপারটা রাখতে হলো আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ডক্টর ব্যানার্জির জন্যে। উনি গ্রামে প্রচুর গরিব-

লোককে বিনামূল্যেও চিকিৎসা করেন তো! দারুণ পয়সার জমেছে ভদ্রলোকের—বড় ছেলেকেও এখন প্র্যাক্‌টিসে নামাচ্ছেন। ওটা রাখতেই হবে, সময়ে-অসময়ে মোটা চাঁদা দিয়ে উনিই রক্ষে করেন ক্লাবকে—আর কী? আর তো শুধু ব্যায়ামাগারটা? একটু বলতেই হবে তো ক্লাবটার চরিত্র বিষয়ে? এক এক করে বেশি হয়ে গেছে।

"উত্তমকুমার এলেন কেমন করে?"

"ও বাবা, মহানায়ক উত্তমকুমারের নামেই তো সভাতে অডিয়েন্স হবে? লোকে আসবে কেন সভায়?"

"মল্লিকপুরে যেতে হয় কেমন করে? কদ্দুর ওটা এখান থেকে?"

"মল্লিক নয় বউমা, মালগোবিন্দপুর। চম্পাহাটি স্টেশনে নেমে ক'মাইল ইন্টিরিয়ারে—ওসব নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না, বউমা। ছেলেমেয়েরাও যায় যেন। আমি তো যাবোই, কোনো অসুবিধাই হবে না। আমি ওদের গত দশবছর ধরে ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড কিনা!"

"তবু মানে—" পাপিয়াবৌদির মনের খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছে না।

"ইয়েস্‌ বলে দাও বউমা, তাহলেই সুরজিৎবাবু যাবেন—ইয়েস্‌ তো? থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ—কাল তবে ছেলেরা এসে নেমন্তন্ন পত্র দিয়ে যাবে। পরশুই মিটিং, মনে থাকে যেন। সকাল দশটায়। ঘণ্টা দুই হাতে নিয়ে বেরুনোই ভালো। ট্রেনের কথা কিছু বলা যায় না।"

পরদিন তিনটি ছেলে এলো। চোঙাপ্যান্ট, চক্রাবক্রা বুশশার্ট, হাতকাটা সোয়েটার, একগাল হাসি।

"জয়মাকালী বডি বিল্ডারস থেকে আসছি। সুরজিৎবাবু আছেন? কাল সোকালে গাড়ি নিয়ে আসবো আমরা। ঠিক আটটার সোমায় তৌরি থাকবেন কিন্তু বৌদি। বাড়িসুদ্ধ সব্বাই যাবেন কিন্তু, সব্বার নেম্‌তন্নো, হ্যাঁ। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসবেন, ছেলেদেরই তো ব্যাপার।"

সুরজিৎদার পঞ্চাশ বছরের জীবনে এই প্রথমবার প্রধান আতিথ্য গ্রহণ। হোক না সেই ক্লাবের নাম 'জয়মাকালী বডি বিল্ডারস অ্যাসোসিয়েশন', তবু তো তারা ওঁকেই ডেকেছে? ছেলেমেয়েরও প্রচুর উৎসাহ—গ্রামে আউটিং হবে। রোববার যারা কিছুতেই বিছানা ছাড়তে চায় না, আজ, ভোরে উঠে তারা রেডি। বৌদির আগ্রহও মোটেই কম নয়। চুল বেঁধে লিপস্টিক মেখে রেশমী শাড়ি পরে ৮টার ঢের আগে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে প্রাতরাশ খাইয়ে তিনিও রেডি। যে সুরজিৎদাকে ছুটির দিনে বেলা দুটোর সময়েও স্নানপর্বে পাঠানো যায় না আজ তাঁর স্নান, দাড়ি-কামানো সব সারা, আধহাত মুগার ধাক্কা দেওয়া শাড়ি-মার্কা ভাইফোঁটায় প্রাপ্ত ধুতি আর র' সিল্কের পাঞ্জাবি পরে বিয়ের শাল কাঁধে নিয়ে পামশু পায়ে

তিনি বসে বসে একমনে একখানা খুদে টুকরো কাগজ পড়ছেন, রবিবারের খবরের কাগজ নয়। ঐ কাগজে তাঁর ভাবী বক্তৃতার পয়েন্টগুলি তিনি লিখেছেন। পাপিয়াবৌদি সাবিত্রীকে বারংবার লাস্ট মোমেন্ট ইন্সট্রাকশন দিচ্ছেন। বিকেলে ফিরবেন। দুপুরে বাড়িতে খাওয়া বন্ধ। রাঁধতে হবে না ভেবেই যেন বৌদির উৎসাহটা বেশি। ৮টা অনেকক্ষণই বেজে গেছে। ছেলেদের দেখা নেই। তবে কি? সুরজিৎদার উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। এমন সময়ে—"গাড়ি এসে গেছে স্যার, রেডি তো, বৌদি? চলুন, চলুন, বাচ্চারা কই?" বলতে বলতে দুটি ছেলে এসে পড়লো। মিত্তিরমশাইও বললেন—"চলুন, গাড়ি রেডি!"

রাস্তায় এসে দেখা গেল তিনটি সাইকেল রিকশা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেদুটো একটায় উঠলো। সুরজিৎদাকে নিয়ে মিত্তিরমশাই একটাতে, অন্যটাতে পাপিয়াবৌদি ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে উঠে পড়লেন। রিকশা চললো ঢাকুরিয়া স্টেশনে।

স্টেশনে নেমে রিকশাভাড়া মিটিয়ে দিল ছেলেরা। সুরজিৎদা খুবই আরাম বোধ করলেন। রিকশাওলাদের সঙ্গে তক্কাতক্কি না করেই সপরিবারে রিকশা চড়ে এই স্টেশনে আসা, জীবনে প্রথমবার এতবড়ো আরাম পেলেন। বৌদিকে একবার দেখে নিলেন। ভারি সুন্দরী বউ তাঁর সত্যি। ছেলেমেয়ে দুটোও হয়েছে তেমনি। কুমোরটুলিতে অর্ডার দেওয়া প্রতিমার মতো মুখ। ছেলেটা ছোট, এখনো মেয়েলি দেখতে। নাঃ, বেশ প্রাউড হবার মতোই ফ্যামিলি তাঁর —প্রধান অতিথির যোগ্য ফ্যামিলি। কোমরে হাত বুলিয়ে একবার ওপর থেকেই দেখে নিলেন, ধুতির ওপরে পাপিয়া যে শক্ত করে একটা সায়ার দড়ি বেঁধে দিয়েছিল সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা। উনি বেল্ট বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন তাতে নাকি অনেক রিস্ক। আর যাই হোক, প্রধান অতিথির তো ধুতি খুলে গেলে চলবে না।

ক্লাবের ছেলেরা গেছে টিকিট কাটতে। মিত্তিরমশাই বকে যাচ্ছেন। সুরজিৎদা অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। ট্রেনে করে অবশ্য প্রায়ই তাঁকে যাতায়াত করতে হয়। কখনো বালিগঞ্জে কখনো শেয়ালদা, কখনো ক্যানিং, কখনো বারুইপুর। কিন্তু টিকিটঘরের দিকে কোনোদিন দৃষ্টিপাত করেননি। ছেলেগুলি টিকিট কেটে এনে সবিনয়ে বললে—"চলুন স্যার—আর দেরি নেই, ট্রেন এল বলে।"

সুরজিৎ ভাবলেন—জীবনে এই ফার্স্ট টাইম টিকিট কেটে এ লাইনে ট্রেনে চড়ছি! নাঃ, আজকে সত্যিই একটা ভেরি স্পেশাল ডে। অনেকগুলো 'জীবনে প্রথমবার' এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে।

ট্রেনে অবিশ্যি সেই একই ভিড়—তবে বসবার সীট পেতে কিছুমাত্র অসুবিধে হলো না। চোঙাপ্যান্ট ছেলেগুলি হালুম হুলুম করে লোকজন সব হটিয়ে তাঁদের পাঁচজনকেই বসবার জায়গা তো করে দিলেই, নিজেরাও হাঁটু ফাক করে

করে যথাসাধ্য জায়গা নিয়ে বসে পড়লো। ট্রেন চলছে, থামছে। বান্টি-বুলটু খুবই উত্তেজিত, জানলা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—কী সুন্দর সুন্দর নাম সব গ্রামের, মল্লিকপুর, রাজপুর, কালিকাপুর, পিয়ালী—কত সবুজ গাছপালা, পুকুর, কলাবাগান, ধানক্ষেত, কুঁড়েঘর। বৌদিও মুগ্ধ। চম্পাহাটি না আসতেই উঠে পড়লো ছেলেরা। ট্রেন থামতে-না-থামতেই কায়দা করে ছেলেমেয়েদের সোজাসুজি কোলে তুলে, আর পাপিয়াবৌদিকে প্রায় কোলে করে এবং সুরজিৎদা-মানিকবাবুকে আলতো গোত্তা মেরে টেন থেকে ঝেড়ে প্ল্যাটফর্মে ঠিকঠাক নামিয়ে ফেললে। প্ল্যাটফর্মে আবার রিকশা।

ঝোপঝাড়, ধানক্ষেত, কলাবাগান, এঁদোপুকুর, কলসী কাঁখে অবাক বধূ, ঘুনসিপরা বাচ্চারা, পশ্চাদ্দেশ-উন্মুক্ত জঙ্গলে উপবিষ্ট নিঃসঙ্কোচ কৌতুহলী গম্ভীর ভদ্রলোক, অনেকের মুগ্ধ দৃষ্টি সার্থক করতে করতে রিকশার কনভয় চললো। চম্পাহাটি তো নয়, মালগোবিন্দপুর। আরো ক'মাইল দূরে। বেশ রোদটা চড়া হয়ে উঠেছে মাথার ওপরে। "আপনাদের সব্বার নেমতোন্ন" বলেছিল ছেলেগুলো। দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়, দশটায় মিটিং যখন। কী কী খাওয়াবে, সুরজিৎদা ভাবতে ভাবতে যান। কত কথাই মানিক মিত্তির বলে যাচ্ছেন, ওই ব্যায়ামাগার ক্লাবের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল ফিলসফি। খরায়-বন্যায়-আর্তত্রাণে-নির্বাচনে-দাঙ্গায় এই ছেলেদের স্বতঃস্ফূর্ত জনসেবামূলক বিবিধ কর্মকৃতির ফিরিস্তি। আগে আগে কারা এসেছেন। কী অসামান্য যোগব্যায়ামের ক্লাস হয় এখানে। এই সেদিনও এসেছিলেন যোগ প্রয়োগে রোগারোগ্যের স্বামী শংকরানন্দ। শ্রদ্ধেয় বিষ্টু ঘোষমশাই, বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়, এঁরা তো বারবার এসেছেন, ক্লাবের কত রমরমা ছিল একসময়ে, কবিশেখর কালিদাস রায় এসে খাতায় তারিখ সমেত সই করে গেছেন।

এখানে নস্করদের জমিজমা ছিল প্রচুর। তাঁরাই কলেজ ইস্কুল তৈরি করে দিয়েছেন পাশের গ্রামে। কীভাবে একবার এক নস্কর মন্ত্রীমশাই ধুতিটিকে শাড়ির মতন করে পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বিধবা সেজে খুনীদের এড়িয়ে পালিয়েছিলেন, প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। তাকে কীভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল গাঁয়ের মেয়েরা, সেই গল্প সাতখানা গ্রামের লোক এখনো করে—এই সব শুনতে শুনতে মাঠটা শেষ পর্যন্ত এসেই পড়ল। একটা চৌকোমতন স্টেজ বাঁধা হয়েছে। সামনে খটখটে রোদের মধ্যে ধূলিমলিন শতরঞ্চি পাতা। তাতে কিছু লোক বসে আছে, বালক-বালিকারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলা করছে। সুরজিৎদার মনে হলো গাঁসুদ্ধই যেন রিকশার পেছু পেছু ছুটছে। বাচ্চারা ছুটছে, নেড়ীকুকুর ছুটছে—বেশ একটা জরুরি আবহাওয়া। রিকশার কনভয় দেখতে পাওয়া মাত্রই অন্তরীক্ষে তীব্র সিটি বেজে উঠলো। বেজে উঠলো বিউগিল, ড্রাম এবং বাঁশিও। মঞ্চের ওপাশ থেকে লাইন বেঁধে মাঠে বেরিয়ে এলো ড্রাম

বাজাতে বাজাতে সাদা শার্ট আর খাকী হাফপ্যান্ট পরা ছেলের দল। একজনের হাতে ক্লাবের নাম লেখা সবুজ সাটিনের পতাকা। ক্লাবের ব্যান্ডপার্টি এসে বাজনা বাজিয়ে সসম্মানে প্রধান অতিথির পার্টিকে রিকশা থেকে রিসিভ করলে। বাল্টি বুলটুকে ফিসফিস করে বললে, "কী গান বাজাচ্ছে বুঝেছিস?" বুলটু বললে—"যিসকি বিবি মোটি। কিন্তু মা তো মোটেই মোটা নয়?" পাপিয়া-বৌদি মুগ্ধ। একদিন নিজেদের জীবনেও যে এমনটা হবে, কে ভেবেছিল? একটা বাচ্চামেয়ে এসে সুরজিৎদার কপালে চন্দন তিলক পরিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, সবাই চেঁচাতে লাগল—"ওকেও লাগিয়ে দে, ওকেও, ওকেও"—তখন সে মানিকবাবুকেও একটা চন্দনের টিপ লাগিয়ে দিলে।

"আহা-হা, ওকে নয়, ওকে নয়, উনি তো আমাদেরই নিজের লোক। ওই ম্যাডামকে লাগা—যাচ্ছেতাই একেবারে—তখনই বলেছিলাম ববিতাকে দিসনি—" মেয়েটা বৌদির কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগাতে এসেছিল, এবারে ভাঁ করে কেঁদে দিয়ে পালিয়ে গেল। বৌদিও বেশ ইন্দিরা গান্ধী স্টাইলে নিচু হয়েছিলেন বাচ্চার হাতের টিপটা গ্রহণ করবার জন্যে, এবার সোজা হলেন। বাল্টি-বুলটু হেসে দিল। সেই হাসির ভাষা—"হলো না তো? যাঃ, ফসকে গেল!"

বৌদি খুব অপমানিত হয়ে ওদের দিকে অগ্নিগর্ভ এক দৃষ্টি হানলেন। যেটা দেখে তাদের কেন, স্বয়ং সুরজিৎদারও সব হাসি মুহূর্তে উবে যায়। সদলবলে সুরজিৎদাদের নিয়ে গিয়ে প্রথমে বসানো হলো ক্লাবরুমে। টিনের ছাদওলা মাটির ঘরে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা আছে। আর একধারে নানারকমের মুগুর বারবেল ডাম্বেল জড়ো করা। যত্ন করে বেঞ্চিতে বসিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে নোংরা মতন কিন্তু ধোওয়া চায়ের পিরিচে দুটো করে ঠাণ্ডা, রোগা, ফ্যাকাসে, অ্যানিমিক চেহারার চিমড়ে সিঙাড়া, আর দুটো ময়লা ময়লা রসগোল্লা, আর দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট এনে দেওয়া হলো। তার সঙ্গে কাচের গেলাসে করে চা। সুরজিৎদা মহা আহ্লাদে খেতে লাগলেন। পাপিয়াবৌদি প্রবল দুঃখের সঙ্গে দেখলেন তাঁর দুই ছেলেমেয়ে যারা এমনিতে কিছুতেই কিছুই খেতে চায় না, তারা, এমনকি সেই থিন অ্যারারুট বিস্কুট যা তাদের দুচক্ষের বিষ, সেগুলো পর্যন্ত সোনামুখ করে চেটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে। বৌদির মনে হলো—"ইস, কী লোভী দ্যাখো! বাপের তো ঐ ঠাণ্ডা সিঙাড়া খেলেই অম্বল হবে। আর ছেলেমেয়েদের আরো ভয়ের ব্যাপার হলো, ঐ বাসি রসগোল্লার রসে নির্ঘাৎ টাইফয়েডের জার্ম না থেকেই পারে না।"

বৌদি কিছুই ছুঁলেন না। শুধু চা। গরম চায়ে কোনো দোষ হয় না। গেলাসগুলো মোটামুটি পরিষ্কারই। চা শেষ হতেই তাঁদের সযত্নে স্টেজে নিয়ে যাওয়া হলো। দুটি চেয়ারে মানিক মিত্তির আর সুরজিৎদা, তৃতীয় চেয়ারে সেই ডাঃ ব্যানার্জি হোমিওপ্যাথ-কাম-ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। বৌদিকে আর বাচ্চাদের

স্টেজের সামনে পাতা খানকুড়ি চেয়ারে গাঁয়ের জমায়েৎ হওয়া গণ্যমান্য অতিথিদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সসম্মানে বসানো হলো। শতরঞ্চিতে বাচ্চারা বসে চেঁচামেচি করছে। শতরঞ্চির পিছনদিকে কিছু মেয়ে, বউ, গিন্নিরাও বসেছে এসে। একপাশে কয়েকটি বাচ্চা মাটিতে ছক কেটে এক্কাদোক্কা খেলছে। তাদের হুল্লোড়ে বান্টি-বুলটুর কেবলই ওদিকেই মন চোখ চলে যাচ্ছে। চেয়ার থেকে গম্ভীরভাবে উঠে গিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক কোণার দিকে হিসি করতে লাগলেন, মঞ্চেরই দেওয়ালের গায়ে। আহা, বুড়োমানুষ, আরো বেশিদূরে যাবার ধৈর্য ছিল না। অন্য কোনো আড়ালও নেই মাঠে। সুরজিৎদা মঞ্চ থেকে দেখেই সহানুভূতি সহকারে ভাবলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখলেন, পাপিয়াবৌদি ভুরু কুঁচকে খুব ডিস্অ্যাপ্রুভিং দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাচ্ছেন, আর বান্টি-বুলটু গা ঠেলাঠেলি করে হাসছে।

প্রথমেই সভাপতি, প্রধান অতিথি বরণ। এবার একটি কিশোরী মেয়ে এসে দুটি গাঁদাফুলের মালা পরিয়ে গেল সুরজিৎদা আর ডক্টর ব্যানার্জিকে। সঙ্গে সঙ্গে মালা খুলে সামনের চাদর ঢাকা দেওয়া টেবিলে রেখে দিলেন ডক্টর ব্যানার্জি এবং সুরজিৎদা। এটাই নিয়ম। মেয়েটা আরেকটু ছোট হলে তাকেই পরিয়ে দেওয়া যেত। শাড়িপরা মেয়ের বেলায় সেটা হয় না। দু'তিনটি মেয়ে এসে এবার টেবিলের পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়ালো। একটি ভদ্রলোক টেবিলের ওপর একটা হারমোনিয়াম এনে রাখলেন। তারপর সমবেত সঙ্গীত শুরু হলো—"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী—"

অনেকদিন পরে গানটা শুনে ভালোই লাগলো সুরজিৎদার। গানের পরেই পুরস্কার বিতরণ—গত বছরের স্পোর্টসের। প্রধানত ব্যায়ামাগার, তাই বেশির ভাগ পুরস্কারই ব্যায়াম সম্পৃক্ত। যাঁরা পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের স্বাস্থ্য দেখলে মনে হয় না দেশে ব্যায়াম বলে কিছু আছে। প্রত্যেকেরই জীর্ণশীর্ণ দীনপ্রাণ মূর্তি দেখে সুরজিৎদার খুব মনে দুঃখু হতে থাকে। পুরস্কার বিতরণান্তে সেক্রেটারির লিখিত রিপোর্ট পেশ করা হলো। তারপর প্রধান অতিথির ভাষণ। সুরজিৎদা পকেট হাতড়ালেন। সেই নোট লেখা কাগজটা চাই। এ পকেট, ও পকেট, নাঃ—পাঞ্জাবির দুটোই মাত্র পকেট। কোনোটাতেই ওটা নেই। টেবিলেই ফেলে এসেছেন নির্ঘাৎ, সকালে যখন প্র্যাকটিস করেছিলেন স্পীচটা। খুব ঘাবড়ে গেলেও, ব্যাপারটা তো বেশ কয়েকবার ভাবা হয়ে গেছে। স্মার্ট সুরজিৎদা নিজেই নিজেকে বললেন—"ঘাবড়াও মাৎ সুরজিৎ, ঠিকই উৎরে দেবে। ভুলো না, তুমি প্রায় পঁচিশ বছর সাংবাদিকতার লাইনে রয়েছ। যে কোনো সাবজেক্টেই আধঘণ্টার মধ্যে একটা চলনসই ছাপার যোগ্য 'কপি' নামিয়ে দিতে পারো। আর এ তো সবই জানাশোনা বিষয়। আগে থেকে ভাবাও আছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী, মহানায়ক উত্তমকুমার, ব্যায়ামাগারের উপকারিতা

—এই তো? আর, আর, আরেকটা যেন কী? চতুর্থটা?"

সুরজিৎদার এই শীতকালেও অল্প অল্পে ঘাম হতে থাকে—চতুর্থ আইটেমটা কী? যাকগে, শুরু করে না দিলেই নয় এবার। ঘোষণা হয়ে গেছে— সবাই উৎকর্ণ। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে, "নমস্কার"-টা বলে নিয়ে, সুরজিৎদা শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই। "আজ এই রবীন্দ্রজয়ন্তী সপ্তাহে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভালো, সুস্থ দেশ ও দশের পক্ষে উপকারী কবিতা কেবলমাত্র মস্তিষ্ক স্বাস্থ্যবান এবং হৃদয় তাজা থাকলেই লেখা সম্ভব। সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হতে পেরেছিলেন। কেননা তিনি কবি হলেও প্রত্যেকদিন ভোরবেলা ছাদে গিয়ে পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি প্র্যাকটিস করতেন, যোগব্যায়াম করতেন। দেহকে দুর্বল করে মনকে সবল করা যায় না। আর কি কোনো ভারতীয় কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন? পাননি, কেননা দেহচর্চা ও মননচর্চার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সবল শরীর সুস্থ মানসিকতার আধার, বলিষ্ঠ কল্পনার জনক। তাই দেশের ব্যায়ামাগারগুলি জাতীয় সম্পদ।" এই বিষয়ে বেশ কিছুক্ষণ বলার পরে হঠাৎ ডাঃ ব্যানার্জি, সভাপতি মশাই কাশলেন। আর তক্ষুণি ম্যাজিকের মতো সুরজিৎদার মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথি! তাই তো! সঙ্গে সঙ্গে কনফিডেন্সের প্রত্যাবর্তন—"রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলবার একাধিক কারণ ছিল। কবিগুরু কেবল কবিতাই লিখতেন না, দুঃখী, অসহায়, আর্ত মানুষের ত্রাণে তিনি চিকিৎসক হয়েও এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি স্বহস্তে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের হোমিওপ্যাথি এবং বায়োকেমিক ওষুধ দিতেন। এভাবে তিনি কত রোগীই যে আরোগ্য করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। অতএব আমরা দেখছি যুগে যুগে পণ্ডিতরাই হোমিওপ্যাথির প্রকৃতগুণাগুণ চিনেছেন। তাঁদের চিকিৎসায় নিশ্চয় জ্ঞান, বুদ্ধি বিশ্বাস, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জগৎকে আন্তর্জাতিক সংহতির পথ দেখিয়েছে। ইংলন্ডের লোক হলেও হানিম্যান (অডিয়েন্স থেকে পাপিয়াবৌদি চেঁচালেন—'জার্মানীর! জার্মানীর!') সাহেব জার্মানী থেকে—"

সুরজিৎদা একটু ঘাবড়ে গেলেন দেখে বৌদি প্রম্পট করলেন, "আমেরিকা থেকে, আমেরিকা!" অমনি সুরজিৎদা শুরু করলেনঃ "জার্মানীর হানিম্যান অ্যামেরিকা থেকে যে ওষুধের প্রচার করলেন; আজ প্রায় দেড়শো বৎসর ধরে ভারতবর্ষে তা নিরলসভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গরিব দেশের অর্থনীতি, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার, বিশ্বাস, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা, মানত-মানসিক, যোগবলে রোগবিয়োগের সঙ্গে হোমিওপ্যাথি সত্যি অতি চমৎকার ভাবেই খাপ খেয়ে গেছে।" এতদূর বলেই সুরজিৎদা ভাবলেন এবার মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের দিকে চলে যাওয়া উচিত।—"হোমিওপ্যাথি ওষুধের আরেকটা বিরাট গুণ, তার দাম

বেশি নয়। আজকের এই অর্থনৈতিক মহাসংকটের দিনে, জীবন মানেই যখন জীবনসংগ্রাম, রুইমাছের দর ত্রিশ টাকা, চিংড়ি চল্লিশ, ট্যাংরা পর্যন্ত পঁচিশ টাকা, মানুষ খাবেই বা কী, পরবেই বা কী ? বাঙালীজাতি ভাতে-মাছে মানুষ, মাছ তো ছোঁয়াই যায় না, ছুঁলেও তেলে ছাড়া অসম্ভব। তেলের দাম যে-রেটে বাড়ছে। বাড়ছে শাকসবজি, মশলাপাতি, সাবান, মাজন, নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর দাম, বাড়ছে জর্দা সিগারেট দেশলাই কেরোসিনের দাম, সারকারী দুধের পর্যন্ত দাম বেড়ে যাচ্ছে, আর শিশুর খাদ্য ! শিশুর টিনের দুধ বেবিফুড স্ক্যানডালের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। এই মূল্যবৃদ্ধি অহেতুক, এই মূল্যবৃদ্ধি রুখতে না পারলে কালোবাজারীদের কালো হাত রোখা যাবে না। এবং দেশের উন্নতির পথে চিরন্তন অন্তরায় সরানো যাবে না। আসুন আজ আমরা এই শুভদিনে সবাই মিলে শপথ গ্রহণ করি, যেমন করে পারি এই অহেতুক অগ্নিমূল্য রোধ করবই (এখানে চটাপট প্রচুর হাততালি পড়ল) ! এমনকি লাইফসেভিং ড্রাগসের পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি আর কালোবাজারী চলছে, হোমিওপ্যাথি সেদিক থেকেও রক্ষে, লাইফসেভিং ড্রাগ বলে আলাদা তার কোনো ওষুধ নেই, তাইজন্যই সেগুলি হঠাৎ হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয় না—"

এখানে সভাপতি হঠাৎ গলা খাঁকারি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরজিৎদাও সুর পালটে নিলেন—"এই যে প্রাত্যহিক নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েই চলেছে—অন্নবস্ত্র, জমিজমা, সিনেমার টিকিট, ট্রেন-ট্রাম-বাসের ভাড়া, বাড়িভাড়া, ওষুধের দাম (আই মীন অ্যালোপ্যাথিক), পাঠ্যপুস্তক, শারদীয় সংখ্যা, যা কিছু অপরিহার্য বাঁচার জন্যে স-ব।—এই অযৌক্তিক অপ্রাকৃত অন্যায় রোধ করার জন্য আজ যে ধরনের কঠিন মহৎ শক্তিধর মানুষদের থাকা দরকার ছিল, এদেশে আর তেমন কেউ নেই। দেশের বিরাট পুরুষরা আজ কোথায় ? কোথায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, কোথায় মহানায়ক উত্তমকুমার, কোথায় মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ ? (বিশাল হাততালি পড়ল)। আজ যদি মহানায়ক উত্তমকুমার বেঁচে থাকতেন তাহলে, তাহলে আজকের এই সভাতে হয়তো আমার বদলে আপনারা তাঁকেই দেখতে পেতেন। তিনি ছিলেন নিরভিমান নিছক ভালো-মানুষ, নিরহংকার, নিঃশব্দ দেশপ্রেমিক। কত মানুষকেই যে তিনি নিঃশব্দে নীরবে অর্থ সাহায্য করেছেন, ফিলম ইন্ডাস্ট্রি তা জানে। কত যে এই ধরনের ব্যায়ামাগারেও তাঁর অকৃপণ দান ছিল, ভবানীপুর পাড়া তা জানে। তিনি নিজেও নিয়মিত দেহচর্চা করতেন বেলভিউ ক্লিনিকে গিয়ে। যোগব্যায়াম করতেন। তাই তো তাঁর ওই মধুর মোহিনী হাসিটি, ওই চিরতারুণ্য বজায় ছিল ষাট বৎসর বয়সেও। কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর মৃত্যুর করাল গ্রাস তাঁকেও রেহাই দেয়নি ! সঙ্গে সঙ্গে মুছে নিয়ে গেছে আমাদের আশা-আনন্দ, চোখের আলো, হৃদয়ের জ্যোতি। 'তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো' বলে আমরা আজ কাঁদছি।"

(এখানেও প্রবল হাততালি)। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সুরজিৎদা নবোদ্যমে আবার শুরু করবেন, হঠাৎ দেখলেন মাঠে পাপিয়াবৌদি ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন, আর ঠোঁট গোল করে করে বলছেন—"চল্লিশ মি-নি-ট—" ফলে সুরজিৎদা পাকা বক্তৃতা-বাজদের মতোই বাক্য শুরু করলেন—"কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। আয়ু ফুরোলে আমরা কাউকে আটকাতে পারি না, কিন্তু জীবনকে দীর্ঘায়িত করতে পারি। ব্যায়াম চর্চা, আগেই বলেছি কেবলমাত্র পেশীকেই সবল করে না, দেয় সুস্থ মগজ, সবল মানসিকতা, তাজা হৃদয়বৃত্তিও। তাই তো বলি, জয়মাকালী বডি বিলডারস অ্যাসোসিয়েশন আজ যা করছেন, যেভাবে দেশের সেবা করছেন, তা তো কেবলমাত্র বডি বিলডিংই নয়, তাকে আমি বলবো নেশন বিলডিংয়ের কাজ। তাঁরা গড়ে তুলছেন সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ (এখানে প্রচণ্ড হাততালি) দেহ-মন-চরিত্র।"

এবার ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে. মহাকবি, মহাযোগী, মহানায়ক ও হ্যানিম্যান সাহেবকে প্রণতি জানিয়ে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার শপথ আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে নমস্কার করে বসে পড়লেন প্রধান অতিথি সুরজিৎদা। নেহাৎ মাঠ, তাই। "হল" হলে ফেটে যেত এমন হাততালি পড়ল। পাপিয়াবৌদির, বান্টি-বুল্টুর মুখ গৌরবে উদ্ভাসিত। গলার কাছে মেরুন কাজকরা সাদা পাঞ্জাবি পাজামা পরা একটি ছেলে এসে টেবিলের হারমোনিয়াম নিয়ে দাঁড়িয়ে একটা গান ধরল মহানায়ক উত্তমকুমারের মৃত্যুজয়ন্তীর উদ্দেশে—"ইস্ ধরতীপর ঘোর অন্ধেরা—" বলে। আরেকটি নীল পাঞ্জাবি সাদা পাজামা পরা তারই মতো ছেলে দাঁড়িয়ে তবলা বাজাল। বেশ গাইল বটে কিন্তু বেশি লোক ছিল না। শতরঞ্চি প্রায় খালি—রোদ চড়া হয়েছে। শুধু কয়েকটি উলঙ্গ বাচ্চা শতরঞ্চিতে এদিক ওদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। চেয়ারে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবৃন্দ অবিশ্যি সকলেই গম্ভীর মুখে তখনো স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। এই সম্ভ্রান্ত অনুষ্ঠানের সম্ভ্রম রক্ষায় তাঁরা বিলক্ষণ অভ্যস্ত। এবার ডক্টর ব্যানার্জি সভাপতির অভিভাষণ (লিখিত) পড়লেন। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। এবার তো সভা শেষ। খাওয়া-দাওয়াটা এবারেই হবে নিশ্চয়। ভাষণান্তে সমাপ্তি সঙ্গীত হলো, "জনগণ", তখন সকলের মুখে আন্তরিক আহ্লাদ। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী মুক্তি পেলে যেমনভাবে হাঁটে তেমনি পায়ে সুরজিৎদা মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। গাঁদাফুলের মালাটা আনতে ভুললেন না। তাঁর প্রথম প্রধান আতিথ্যের অমূল্য স্মৃতির সঞ্চয়। বৌদিও উঠে এসেছেন, বান্টি আর বুল্টুর মুখে আসন্ন বায়নাক্কার মেঘ জমতে শুরু করেছে—সকলেরই খিদে পেয়েছে খুব। ফাংশন দশটায় ছিল, আটটার আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রেডি ছিলেন সবাই, দেড়টা বেজে গেছে, প্রায় দুটো বাজে। ভাগ্যিস রসগোল্লা সিঙ্গাড়াগুলো সময়মতো পেটে পড়েছিল। এখন খাওন-দাওনটা কোনদিকে যে হবে—সুরজিৎদা

চারদিকে তাকিয়ে তেমন ধরনের কোনো লক্ষণই দেখতে পেলেন না। ধূ ধূ মাঠ। ভাত মাংস, কি মাছের ঝোলের গন্ধ হাওয়ায় নেই, শুধুই পাকা ধানের গন্ধ। শীতের শুকনো বাতাস।

পাপিয়াবৌদি এদিক ওদিকে তাকিয়ে অনিশ্চিত গলায় বলেই ফেললেন—

"তাহলে—মিত্তিরমশাই—বেলা দুটো বাজে যে?"

মানিক মিত্তির যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। হন্তদন্ত হয়ে তিনি সুরজিৎদার দিকে এগিয়ে এলেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—"চলুন স্যার, চলো বউমা, বড্ডই বেলা হয়ে গেল, ছেলেমেয়েগুলোর সত্যি খিদেয় মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে"—অমনি ব্যায়ামাগারের সব ছেলেরাও হাজির—"থ্যাংকিউ স্যার, থ্যাংকিউ, দারুণ বোলেছেন কিন্তু দাদা, ফাটিয়ে দিয়েছেন এক্কেবারে—চার চারটে আইটেমকে এমন ফাইনভাবে একসঙ্গে গেঁথেছেন না? এ কোনো কবি সাহিত্যিকের কম্মো ছিল না! এ কেবল জার্নালিস্টেই পারে—অনেক ধন্যবাদ দাদা, আবার ডাকলে আসবেন তো? এই জো এদিকে, বৌদি, আপনাদের চম্পাহাটি যাবার গাড়ি এসে গেছে।" শূন্য রিকশার কনভয় সামনে। দেখেই হঠাৎ সুরজিৎদার মাথায় একটা চকিত বুদ্ধি খেলে গেল। এরা তাহলে দুপুরে খাওয়াচ্ছে না, সন্দেহ নেই।—"তোমরা আবার কষ্ট করে সেই চম্পাহাটি যাবে কেন ভাই? তার চেয়ে এদের রিকশাভাড়াটা বরং এখানেই আগাম মিটিয়ে দাও, আর আমাকে রেলভাড়াটা আর ঢাকুরিয়ার রিকশাভাড়াটা দিয়ে দাও—আমি, মিত্তিরমশাই—আমরা নিজেরাই চলে যাব। এই দুপুরে আবার কলকাতা যাতায়াতে অনেক সময় যাবে, তোমাদেরও নাওয়াখাওয়ার প্রচুর দেরি হয়ে যাবে, তার চেয়ে—"

ছেলেরা একটুখানি পরামর্শ করে নিয়ে সুরজিৎদার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। "আপনি যদি কিছু না মনে করেন স্যার, তাহলে এই পনেরোটা টাকা রাখুন, রেলভাড়া, আর ওপারের রিকশাভাড়া, এদেরটা এখানেই দিয়ে দিচ্ছি আর এই মিষ্টিটুকুন নিয়ে যান বৌদি, গাড়িতে খাবেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে—" বলে একটা তেলতেলে কাগজের বাক্সও ধরিয়ে দিলে ওরা পাপিয়াবৌদিদের হাতে। এবারে একটা রিকশা কম নেওয়া হলো। একটাতে সুরজিৎদা আর মিত্তিরমশাই, অন্যটায় বৌদি, বাচ্চাদের নিয়ে। বাচ্চারা এক্ষুণি মিষ্টির বাক্স খুলতে চায়। ওপরে গনগনে রোদ্দুর। শীতকাল, তাই রক্ষে। এখন যে কোন হিসেবে রবীন্দ্র-সপ্তাহ হয় তা ঈশ্বরই জানেন। তবে হ্যাঁ, ছেলেগুলি ভালো। অযত্ন করেনি। বৌদি আর বাচ্চাদের শীতকালেও ডাবের জল খাবার ইচ্ছে হয়েছিল, অর্থাৎ তেষ্টা পেয়েছিল। ওখানের পুকুরের জমা জলে কতরকমের বীজাণু কে জানে? ডাব সর্বদাই বীজাণুমুক্ত পানীয়। বৌদি বুদ্ধি করে চাইতেই ছেলেরা তক্ষুণি ডাব এনে দিয়েছিল। বৌদির তেমন খারাপ লাগেনি ছেলেদের। কেবল ওই লাঞ্চের

ব্যাপারটাই যা এখন—দুপুরের খাওয়াটার ব্যবস্থা তো করে আসেননি বাড়িতে! বান্টি-বুলটু একটু হতাশ। আউটিং অথচ পিকনিকই হলো না, শুধুই বক্তৃতা হলো, এ আবার কী! তখন ও-রিকশায় মানিক মিত্তির বলছেন—"ছেলেরা দারুণ ইমপ্রেসড আপনার গভীর জ্ঞানের পরিধি দেখে। কত বিষয়েই যে আপনি জানেন। কত সহজেই যে লিংক-আপ করলেন এতগুলো বিচিত্র বিষয়, সত্যি মার্ভেলাস হয়েছে—কী উবগারটাই যে আপনি করলেন সত্যি সুরজিৎবাবু, বড্ড সামলে দিয়েছেন—"

আর সুরজিৎদা? সুরজিৎদার কোলে গাঁদাফুলের মালা, মুখে মৃদুহাস্য। মনে মনে তিনি ভাবছেন—"মন্দ কি? এই ক্যানিং-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে তো টিকিট কাটতে হয় না। সে খরচ নেই। ঢাকুরিয়া স্টেশনে নেবেই দশ বারো টাকার দিব্যি হিঙের কচুরি ভেজিটেবল চপ খেয়ে নেবো সবাই মিলে, দুটো রিকশার জন্যে তিন টাকা রেখে দিয়ে, নট ব্যাড! যথা লাভ! প্রধান অতিথি বলে কথা! কে জানে এটাই এক দীর্ঘ কেরিয়ায়ের শুরু কিনা?"

ভালোবাসা কারে কয়

জগতে যতই অপ্রেম বাড়ছে প্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ি ততই বাড়বাড়ন্ত। 'প্রেম' এখন খুবই টপিকাল বিষয়। প্রায় 'সতী' কিংবা 'বধূহত্যার' মতোই। হয়তো পরস্পরের মধ্যে যোগও থাকতে পারে। 'প্রেমসংখ্যা' বেরুচ্ছে পত্রপত্রিকায়। বিশ্বপ্রেম ছড়িয়ে পড়ছে পেরেস্ত্রয়িকায়। বোফর্স কেলেংকারি মেটাতে না পারুন রাজীব গান্ধী দিল্লি-বোম্বাইতে দু'জোড়া প্রেমে তাপ্পি লাগিয়ে দিয়েছেন। রাজারাজড়ার ছেলেমেয়েরাও গরিবগুর্বোদের মতোই ঝপাঝপ্ প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন, কাশ্মীরের সঙ্গে যেমন গোয়ালিয়র। "তরুণ বিপ্লবী মুখ্যমন্ত্রী" প্রেমের ম্যাজিকে "তরুণ সংসারী মুখ্যমন্ত্রী" হয়ে নাড়ু খাওয়াচ্ছেন নিমন্ত্রিতদের। যেদিকে তাকাই প্রেমের ছড়াছড়ি। খবরের কাগজে প্রেম, দূরদর্শনে প্রেম। চিত্রহারে প্রেম, চিত্রমালায় প্রেম। যাত্রা থিয়েটারে প্রেম, পানমশলায় প্রেম, বিড়ি সিগারেটে প্রেম, লোহার আলমারিতে প্রেম, মশার ধূপে প্রেম, এমন কি গেঞ্জি আন্ডারওয়্যারেও প্রেম। প্রেম বিনে বিজ্ঞাপন নেই। প্রেমের অথই বন্যায় ভাসতে ভাসতে আমরা মানিব্যাগ সামলাচ্ছি। এত প্রেম দশদিকে, অথচ যেই একজন সম্পাদক আমাকে একটি প্রেমবিষয়ক নিবন্ধ লিখতে আদেশ করলেন, আমার মনে হলো, জগৎ আলোবাতাস শূন্য হয়ে যাচ্ছে। প্রেম বিষয়টি সরল নয়, জটিল। প্রেম বিষয়টি খোলাখুলি ঢালাও আলোচনারও নয়, চুপচাপ, ফিস্‌ফাসেই তার শোভা। এখন যেন সবকিছুই কেমন খোলামেলা হয়ে যাচ্ছে। আদুড়-গা যেমন ফ্যাশন হচ্ছে, আদুড় মনপ্রাণও তেমনি যুগের ধর্ম হয়ে উঠছে। এরপর জগতে প্রেম বেচারী টিঁকবে কোথায়? সে বাঁচবে কেমন করে? তার একটু ছায়া চাই যে, একটু আড়াল চাই, একটু আঁধার, সে যে বিজন বিলাসী। প্রেমের নিবন্ধ? আমার তো মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। প্রেম বিষয়টিকে কাগজেকলমে আমি, যতদূর সাধ্য পরিহার করে চলি। প্রেমের মূলতত্ত্বই হলো, যা বালকেও বোঝে, শতং করো, মা বলো। আর বলাই বাহুল্য কদাচ মা লিখ। অথচ সম্পাদকরা ঠিক সেটাই করিয়ে নেন।

শেষটা আমার মনে হলো, চ্যালেঞ্জটা ছাড়বো কেন? নিয়েই নিই। প্রেম বিষয়ে তিন পুরুষের জ্ঞানসঞ্চয় করে ফেলতে হবে—সম্পাদক বলেছেন। তিন প্রজন্মে প্রেমের বিবর্তন নিয়ে প্রবন্ধ চাই। এও বলেছেন, ইচ্ছে করলে নিজেরই পরিবারের তিন প্রজন্মের প্রেমকথা লিখতে পারি। হ্যাঁ, বাবা-মায়ের প্রচণ্ড প্রেম-

বিবাহ হয়েছিল বটে সেকালে। সংবাদপত্রে দারুণ দামামা বেজেছিল। দাদু-দিদিমার, ঠাকুর্দা-ঠাকুমার প্রেমজ বিবাহ নয়, কিন্তু বিবাহজ প্রেমে শুনি দুই দম্পতিই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আমার নিজের বিবাহটাও অবিশ্যি বেশ ঘনঘটার "প্রেমের-বিয়েই" হয়েছিল, কিন্তু শেষ দৃশ্যে কিঞ্চিৎ লঘুক্রিয়া হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে আর ঢাক পেটানোর কিছু নেই। তবে আমার প্রজন্মের অন্য অনেকেরই অটুট, অমোঘ, অবিরল প্রেমের উদাহরণ আমার সামনে। হাতের ওপর হাত রেখে চলার অসহজ কর্মটি যাঁরা খুব সহজভাবেই করে চলেছেন। কিন্তু আমার পরের প্রজন্মটাই ঝামেলা করেছে। আমার মেয়েদের প্রেমজ বিবাহ বা বিবাহজ প্রেম কোনোটাই এখনও হয়নি, ফলে ওদের যুগচরিত্রটা ঠিকমতো আমার নজরে আসেনি এখনও। তাঁদের বাঁধবেন যাঁরা, তাঁদের কে যে এখন কোন্ গোকুলে বর্ধমান তা কি আমি জানি? না তাঁরাই জানেন?

কিন্তু আমেরিকা থেকে আমি একটা জরুরি কথা শিখে এসেছি: 'নো প্রবলেম'। কোনো সমস্যা নেই। সেইমতো কোমর বেঁধে নেমে পড়লুম ফিল্ডে। নো প্রবলেম। বাড়িতে যেই মেয়ের বন্ধুবান্ধব কেউ বেড়াতে আসবে, তক্কে তক্কে থেকে, কাঁক করে চেপে ধরলেই হলো। তাদের প্রজন্মের কথা তাদের মুখেই শোনা যাবে। এবং সেটাই হবে নির্ভরযোগ্য তথ্য।

আমার পূর্বপ্রজন্মের কাছে তথ্য সংগ্রহের আশায় 'বাংলার ব্রাউনিং দম্পতির' কপোত-কপোতীর অবশিষ্ট অঙ্গ, কপোতীকে, অর্থাৎ আমার গর্ভধারিণীকে ধরেছিলুম। মা বললেন—"প্রেম শুধুই দেয়। চায় না কিছুই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ। দুয়ের বেলাই এক। দিয়েই আনন্দ। প্রেমকে বিনষ্ট করতে হলে বিয়েটা করে ফেলা উচিত। সংসারের গরম বাতাসে রোমান্টিক প্রেমের সুকুমার তন্তুগুলি শুকিয়ে যায়। খসে পড়ে প্রেমের লজ্জাবস্ত্র। কেবল প্রেমহীন কর্তব্যের হিশেব-নিকেশ, সামাজিক চুক্তির দেনাপাওনার জাব্দা খাতা নিয়ে খাড়া থাকে বিবাহের দরোয়ান।—প্রেমকে যদি ধরে রাখতে চাও বিয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যেও না। একটু দূরত্ব ভালো। স্বার্থহীন না হলে প্রেম থাকে না। বিয়ে মানেই স্বার্থ। দুটো পরস্পর বিরোধী। রাধা কি শ্যামের বউ ছিলেন? ছিলেন না। থাকতে পারেন না।"

ও বাবা! এ তো ভীষণ মডার্ন! এর চেয়ে আর আলাদা কী বলবে পরবর্তী প্রজন্ম? তবু বড় মেয়েকে গিয়ে ধরলুম। কলেজে পড়ছে। তরুণ-তরুণীরা এ বাড়িতে স্রোতের মতো আসে-যায়। ও জানবে।

"ধ্যাৎ তেরি।" মেয়ে তেড়ে এলেন।—"পারোও বটে মা তোমরা! আচ্ছা একটা জেনারেশন বটে! উপন্যাসে, গল্পে, যাত্রায়, সিনেমায়, কবিতায়, গানে—এতদিন কেবলই প্রেম চলছিল। এবারে প্রবন্ধেও প্রেমের প্রবেশ? সর্বনাশ

করেছে। বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা ?" কচি মুখখানিকে সাধ্যমতো গোমড়া করে কন্যা বলেন—"জীবনে, জগতে, কতো কিছুই রোজ ঘটে চলেছে মা, যা প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি। সেইসব নিয়ে লিখলে পারো না ? আমার অন্য কাজকর্ম রয়েছে, আমি যাই। তুমি বসে বসে প্রেম নিয়ে ভাবো।" বকুনি খেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

যা বাবা। তাহলে এটাই এই জেনারেশনের অভিমত ? প্রেম তুচ্ছতাচ্ছিল্যের জিনিস ? ভাবনাচিন্তারও যুগ্যি নয় ? নাকি আরো অন্য মতামত, ভিন্নরুচির তরুণ-তরুণীও আছে ? পড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে, তরুণ-তরুণীদের সঙ্গেই আমার চব্বিশ ঘণ্টা ওঠাবসা। কিন্তু সে তো বাইরে থেকে চেনা। চোখে যা দেখি, তাতে তো হামেশাই তাদের হাবভাব, চাউনি, অনেকটা প্রেমের মতোই দেখায়। সেসব কি তাহলে আমার চোখের ভুল ? বা বোঝার ভুল ? সেসব কি তাহলে প্রেম নয়, অন্য কিছু ? সন্তোষকুমার ঘোষের সেই 'কবিতা' নয়, কিন্তু 'কবিতার প্রায়' যেমন, তেমনি এও কি ঠিক 'প্রেম' নয়। কিন্তু 'প্রেমের প্রায়' কোনো সম্পর্ক ? কিন্তু যাই হোক, খোলসা করে বলবে তো কেউ আমাকে ? একটা জিনিস বুঝেছি। আমাদের জেনারেশনেই স্ত্রী-পুরুষে 'বন্ধুত্ব' শুরু হয়েছিল। ছেলে-মেয়ে জুটি মানেই প্রেমিক-প্রেমিকা নয়। স্রেফ বন্ধু হতেই পারে। কিম্বা রাজনৈতিক সহকর্মী। কিম্বা ফোটোগ্রাফি ক্লাব। মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব। ফিল্ম সোসাইটি। কত রকমের 'কমন ইন্টারেস্টের' জন্য একসঙ্গে ঘোরে ছেলে-মেয়েরা। দেখে কি বোঝা যায় ?

এইরকম ভাবনাচিন্তা করছি, এই সময়ে হঠাৎ আমার এক প্রাচীন সহকর্মী উত্তেজিত হয়ে এসে জানালেন ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস নেবার সময়ে বাইরের করিডরে গীটার বাজিয়ে এমনই "জুলি আই লাভ ইউ" গান হতে লাগলো যে তাঁর সন্দেহ হলো ক্লাসেই হয়তো জুলি বলে কেউ থাকতে পারে। "জুলি বলে কেউ কি আছো ? তাহলে বাইরে গিয়ে কথাটা সেরে এসো"—বলতে, জুলিয়েট ডিসুজা বলে গোয়ার মেয়েটি কাঁদোকাঁদো মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি ওকে সত্যি সত্যি চিনি না স্যার ! আমি নতুন মেয়ে, সবে ভর্তি হয়েছি !" তখন মাস্টার-মশাই উঁকি মেরে ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলেন। চেনা ছেলে। স্বরূপ সরখেল। জিভ কেটে, "এই যে সার, গুড মর্নিং" বললে সে গীটার নামিয়ে, ডান হাতে সেলাম করে। পিছু পিছু বেরিয়ে এসে জুলিয়েট বললে—"আপনি কি আমাকে দাদার মতো ভালোবাসতে পারেন না ? আমার সত্যিই কোনো দাদা নেই—বাট আই ডু হ্যাভ্ আ বয়ফ্রেন্ড অ্যাট হোম।" স্বরূপ হাস্যবদনে বললে—"হোয়াট আ শেম ! কুছ পরোয়া নেই, সিস্টার ! এভরিথিং উইল বি অলরাইট !" তারপর পিড়িং পিড়িং করে বাজাতে বাজাতে অন্যদিকে চলে গেল। আমার সহ-কর্মী রীতিমতো বিচলিত। "এসব কী কাণ্ড বলুন তো ?" বাড়িতে এসে

মেয়েকে বললুম।—"এসব কী হচ্ছে তোদের ?"—"ওঃ স্বরূপ ? স্বরূপের কথা বাদ দাও। ও একটা পাগলা। সেদিন দেখলুম করিডরে চেঁচাচ্ছে ঃ 'ওরে ববি, ববি রে আমার, স্যান্সক্রিটের ঐ মেয়েটার নাম কী যেন ?'—'মন্দাক্রান্তা ?' ববি বলে দিল।—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি ডিফিকল্ট টু রিমেমবার—ওকে প্লীজ একটু প্রক্সি দিয়ে দে না ? আমি জিওলজির মেয়েটাকে একটু অ্যাটেন্ড করেই আসছি —ওকে বল্—' " —"কি আশ্চর্য !" আমি বাক্রুদ্ধ। "আশ্চর্য কিছুই নয়। স্বরূপের ছ'টা গার্লফ্রেন্ড। ওপ্ন সিক্রেট। সবাই হাসে। আর প্রশ্রয় দেয়। স্বরূপ ছ'জনকেই বাই টার্ন সিনেমা দেখায়, আইসক্রিম খাওয়ায়। এই তো ? আপত্তির কী আছে ? লুকিয়ে চুরিয়ে তো কিছু করেনি। সবাইকে জানিয়ে শুনিয়েই ডেটগুলো ফিক্স করে। হি মীন্স নো হার্ম। সবাই সেটা বোঝে।"

"তাহলে প্রেমটা করে কার সঙ্গে ?"

"প্রেম আবার কি ? মোটেই প্রেম নয়।"

"তাহলে বিয়ে ? বিয়েটা করবে কাকে ? ছ'টা মেয়ের মধ্যে ?"

"এরা কেউই স্বরূপ পাগ্লাকে বিয়ে করবে নাকি ? মেয়েগুলোর কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই ? দে আর হ্যাভিং ফান। ওর মোবাইকে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ছ'জনেই ছ'জনকে চেনে। নো ওয়ান কেয়ারস্ ফর হিম।"

"সে কি রে ? মেয়েগুলোও এমনি হয়েছে আজকাল ?"

"হবে না কেন ? তাদের কেরিয়ার নেই ? প্রেম করলেই চলবে ? স্বরূপ যদি ভালো পাত্র হতো তাহলে অবশ্য অন্য কথা। তাহলে হয়তো একটু প্রবলেম হতো, হয়তো কেউ কেউ সিরিয়াসলি ভবিষ্যতের কথা ভাবতো, কিন্তু অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স, স্বরূপও সিরিয়াস নয় ওরাও নয়। যে-যার মা-বাবার পছন্দ-করা বর-বউদেরই বিয়ে করবে বোধহয়। আমরা সবাই যে চালু পার্টি মা। আজকাল কেউ আর তোমাদের মতো বোকা নেই।" কেউ আর আমাদের মতো বোকা নেই শুনে তো আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী ? বেশির ভাগ জোড়া-কে দেখে তো মনে হয় প্রেমিক-প্রেমিকাই ? অবশ্য অনেক সময় যে উল্টোও হয় না, তাও নয়। দিব্যি হাবভাব দেখে এবং কথাবার্তা শুনে মনে হয় দুটি ভাইবোন, অথচ আসলে তারা কিন্তু ডিক্লেয়ার্ড, রেজিস্টার্ড প্রেমিক-প্রেমিকা। এমন জুটি অন্তত আধ ডজন তো ভালোভাবেই চিনি যারা বিয়েও করে ফেলেছে, আজও তুই তোকারি চালায়। আরও একজনকে জানি, যারা বিয়ে করেনি অথচ মনে হয়েছিল, করলো-বলে। অতএব এই প্রজন্ম বড়ই প্রহেলিকাময়। কে যে কার সঙ্গে কখন প্রেমের দ্বারা যুক্ত, তা হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত। বন্ধুদলের অন্তরঙ্গ সদস্যরাই একমাত্র জানে। দৃশ্যত সকলেই সমান। 'একত্রে ঘোরাঘুরি' ছাড়াও আমাদের সময়ে কিছু টেল্-টেল্ সাইন্স ছিল। 'তুই' বা 'আপনি' থেকে

'তুমি'-তে সরে আসা তার মধ্যে প্রধান লক্ষণ বলে পরিগণিত হতো। এখন ওটাও মুছে গেছে। 'আপনি' মানেই যেমন শ্রদ্ধা-সম্মান দেখানো নয়, 'তুমি'ও তেমনি অন্তরঙ্গতার পরকাষ্ঠা প্রমাণ করে না। আবার 'তুই' মানেই নয় ভাই-বোনের অনাবিল প্রীতি। আর প্রেম মানেই নয় বিবাহ। আমাদের সময়ে একটা কুকথা ছিল, "প্রেম করবো যেথা সেথায়, বিয়ে করবো বাপের কথায়।" কেবল বদ্ ছেলেরাই ঐ পন্থা অবলম্বন করে থাকে, এমনতর ধারণাও চালু ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে কি ছেলে কি মেয়ে এটা অনেকেরই স্বাভাবিক কর্মপন্থা, প্রেম করাটা মোটে 'প্রেম'ই নয়, একরকমের বিনোদন মাত্র। উত্তেজনায়, আনন্দে সময় কাটানোর সহজ উপায়। "হ্যাভিং ফান।" ইংরিজি ইশ্‌কুল, বাংলা ইশ্‌কুল, যে-কোনো পটভূমি থেকে এসেই কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে এই ব্যাপারটি শিখে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। প্রেমে-পড়া নয়। প্রেম-করা। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাব না। এদের এই প্রেম-করা মোটেই আমাদের সেই প্রেমে-পড়া নয়। এবং অবশ্যই নয় ইংরিজি 'লাভ-মেকিং'ও। একেবারে অন্য হালকাহালকা ব্যাপার। দিশি 'ফান'। মোটামুটি হার্মলেস। ইংরিজি ভাষাটা এই প্রেম-ভালোবাসার প্রসঙ্গে কিন্তু যারপরনাই দীনদরিদ্র। স্নেহমমতা, ভাব-ভালোবাসা, প্রেমকাম, সব এক। সব 'লাভ'। মা-বাবা, কুকুর-বেড়াল, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ঠাকুর-দেবতা সবার সঙ্গে সবার একটাই শব্দের সম্পর্ক। কী গরিব, কী গরিব ভাষা রে বাবা! আর ওরাই নাকি ডেভেলপ্‌ড নেশন?

সে যাই হোক, সাহেবদের দৈন্য সাহেবরা বুঝুক, আমি প্রেম বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের অধীর পিপাসায় কর্মযজ্ঞে অবতীর্ণ হই। হাতে-কলমে অবশ্য এখনই নয়। প্রথমে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আগ্রহ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, সাক্ষাৎকারভিত্তিক, পরিচ্ছন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়। তবে হ্যাঁ, এলেবেলে হলে চলবে না। 'বিজনেস-লাইক' হওয়া দরকার। এই প্রজন্মটার মধ্যেই কেমন একটা 'বিজনেস-লাইক' ভাব আছে। কাঠখোট্টা, হিসেবী (কেমন-যেন)! এদের হ্যান্ডল করতে হলে এদের মতনই হতে হবে আমাকে। কাঠখোট্টা তো আছিই, কেবল হিশেবের ব্যাপারটায় কাঁচা। প্রথমে চাই সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু।—প্রেম। তারপর প্রশ্নমালা। ওটা বরং একটু খোলামেলাই থাকুক। বাঁধাধরা লিখিত প্রশ্নমালা বড্ড বোরিং। এবার স্থানকালপাত্র ঠিক করে নিতে হবে।

স্থান, এই বাড়ি। কাল, যে-কোনো ছুটির দিন। পাত্র, আমার কন্যার বন্ধুর স্রোতের মধ্যে যে সামনে পড়বে সে-ই। ছুটির দিনে ডজনে ডজনে আসে তারা। তাদের খালি-করা চায়ের কাপে ঘরবাড়ি ছেয়ে যায়।

যেই না রবিবার আসা অমনি আমিও রেডি। ভোরে উঠে স্নান করে খাতা বগলে ঘাপটি মেরে কলিংবেলের অপেক্ষায় কান পেতে রই। দুরুদুরু বক্ষ। কৃষ্ণের বাঁশির জন্য শ্রীরাধিকার আকুল প্রতীক্ষাও এই আমার কাছে তুশ্চু! নিজেই

গোলমালটা স্বয়ং পাকিয়েছি। পিকোর পরীক্ষার জন্য ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করে বন্ধুদের মার্-মার্-কাট্-কাট্ শব্দে তাড়িয়েছি ক'দিন যাবৎ। বন্ধুর ফ্লো-টা তাই একটু কমে গেছে। আহা তখন কি ছাই জানতুম, যে...?

তবে আজ ছুটির দিন। আজ নিশ্চয়ই আসবে ওর রেজিমেন্ট। কিন্তু কই? বেল তো বাজছে না? এমন সময়ে...বাজিল কাহার বীণা?

অবশেষে বেল বেজে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে, "পিকো আছে?" শোনবামাত্র আমার অন্তরাত্মায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। এই তো সে! এসে গেছে। পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি! এক্ষুনি চেপে ধরতে হবে। যেন ফস্কে না যায়।

"কে? টুবলু? আয় বাবা আয়। হ্যাঁ, আছে পিকো। তা টুবলু তুই প্রেম নিয়ে ইদানীং কী ভাবছিস?"

টুবলুর গোলগাল নাদুসনুদুস নবর মুখখানি যেন এক মিনিটে শুকিয়ে গেল। খুবই চালাকচতুর চটপটে ছেলে সে, প্রাইজ পাওয়া ডিবেটর, সুন্দর বলিয়ে কইয়ে, ফুর্তিবাজ, আড্ডাবাজ, হাসিখুশি ছেলে। টুবলুর শুকনোমুখ কখনো দেখিনি। তাকে নিরুত্তরও দেখিনি কখনো। খানিক চুপ থাকার পরে শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে টুবলু বেশ আস্তে আস্তে কথা বলল। টুবলু বলল—"মানে, নবনীতাদি, আমি কিন্তু...পিকোর কাছে"...গলা বুজে এল তার। গলা ঝেড়ে নিয়ে টুবলু বলল—"আমি ঠিক পিকোর কাছে, সেভাবে...কোনোদিনই... মানে আপনি হয়তো ঠিক জানেন না আমাদের মধ্যে কিন্তু ঐসব, মানে একটুও কিন্তু,...ক্ষীইই আশ্চর্য!" টুবলু হঠাৎ চুপ করে গেল। যাকে বলে "চুপ মেরে যাওয়া" তাই। এবং টুবলুর উজ্জ্বল তরুণ মুখখানি বিষাদে স্পষ্টতই প্রাণশূন্য বিবর্ণ দেখালো। তারপর টুবলু আবার বললো—"প্লীজ! বিশ্বাস করুন, আমি কিন্তু কোনদিনই পিকোর কাছে এইসব উদ্দেশ্যে—আমি ভাবতেই পারিনি..." এতক্ষণে আমার কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। হাঁহাঁ করে শুধরে নিই নিজের ভুল। যদিও হাসি আটকাতে পারি না।

"ওরে, নারে, তোর সঙ্গে যে পিকোর প্রেম হয়নি তা তুইও যেমন জানিস আমিও তেমনি জানি—"

তুচ্ছ বাক্য! কিন্তু কী বৈপ্লবিক তার শক্তি। মুহূর্তের মধ্যে টুবলুর অন্য ব্যক্তিত্ব এসে গেল। রীতিমত চেঁচিয়ে উঠলো সাগ্রহে—"শুধু আমি কেন? কারুর সঙ্গেই হয়নি! হবে কী করে? যা দজ্জাল কন্যাটি আপনার! বাপ্‌রে!"

"আহা! সে কথাও হচ্ছে না। কে কার সঙ্গে প্রেম করছে-না-করছে সেসব পার্সোনাল ডিটেইলস্ আমি চাইছি না, আমি জানতে চাই প্রেম বিষয়ে তোর ধারণাটা কী? জেনারেলি? ইন থিওরি? অ্যাজ আ মেম্বার অব ইওর জেনারেশন?"

ইতিমধ্যে সিঁড়ির বাঁকে পিকো অবতীর্ণ হয়ে সস্নেহে টুবলুকে জানালো—

"মাকে প্রেম বিষয়ে আর্টিকেল না গল্প কী যেন লিখতে হবে অথচ সেই বিষয়ে মা কিছুই জানেন না। একবার দিম্মাকে, একবার আমাকে অসম্ভব বিরক্ত করছেন, ফর ইনফরমেশন, ফর ডেটা। তুই পারলে দু একটা পয়েন্ট দিয়েই দে না বেচারীকে।" এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে টুবলুর অট্টহাস্য।

"প্রেম নিয়ে আর্টিকেল? আপনি?" যেন এর চেয়ে আজগুবি আর আবোলতাবোল জগতে কিছু হতেই পারে না। যেন আমার ত্রিভুবনে প্রেম নিয়ে কোনো অন্বেষণ থাকা অসম্ভব। হায় রে। যদি জানতিস! প্রেম বিষয়ে না হয় তাত্ত্বিক জ্ঞানটাই আমার কমসম, তা বলে প্রযুক্তিগত বিদ্যা কতটা, তা তো তোরা কেউ জানিস না? না হয় প্রেমের গল্পই আমি লিখি না, তা বলে কি প্রেমের গল্পরা আমার জীবনে ঘটে না? কিন্তু এ-সব কথা পত্রিকায় ছেপে না বলাই ভালো। কে আবার কী বুঝবে?

অতএব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ছোটো করে গর্জে উঠি—"অত হেসে কাজ নেই। কাজের কথাটা বল্। প্রেম বিষয়ে তোর কী ধারণা?"

"ওহো, তাই তো, 'কাজের' কথাটা?" (টুবলু গলা খাঁকারি দেয়, আজকালকার ছেলেগুলো মহা শয়তান)—"ইয়ে, 'কাজের' কথাটাই তবে হয়ে যাক। অর্থাৎ প্রেম তো? প্রেম অতি ভয়ানক। অতীব ভয়াবহ বস্তু। বন্ধুবান্ধবরা প্রেম করা মানেই আমার ভয়ংকর খরচা বেড়ে যাওয়া। তাদের চা-অমলেটের জন্য সিনেমার টিকিটের জন্য ট্যাক্সিভাড়ায় জন্য কেবলই ধার দিতে হয় (যেহেতু তাদের টিউশনি করার সময় থাকে না। আমি টিউশনি করি।) সেসব ধার কদাচ শোধ হয় না। তাছাড়া পড়াশুনোরও ভীষণ ক্ষতি হয়। বন্ধুরা এসে এসে অনবরত প্রেমের প্রগ্রেস রিপোর্ট শোনায়। বন্ধুরা জড়ো হয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রেমের নোটস এক্সচেঞ্জ করে, রীতিমতো বুলেটিন বের করে, এবং আমার কাছে কেন জানি না, কেবলই উপদেশ চায়। সর্বদাই আর্জেন্ট পরামর্শ দরকার হয় তাদের। সবসময়েই একটা পিরিয়ড অফ এমার্জেন্সি চলে প্রেমে। আর আমার ভালো-লাগুক-না-লাগুক খুব ধৈর্য ধরে সহানুভূতি নিয়ে সেই সব কাহিনী শুনতেই হয়। না শুনলে হয় হার্টলেস, নইলে হিংসুটে ভাববে। সাকসেসফুল প্রেমে কেস ততটা খারাপ হয় না আনসাকসেসফুলে যতটা। 'ব্যর্থ-প্রেম' হলে আর রক্ষে নেই। রাতের পর রাত সেও ঘুমোবে না, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। জানালায় টোকা মেরে পায়ের বুড়ো আঙুল নেড়ে ঘুম তাড়িয়ে ঘরে ঢুকে এসে দুঃখের পাঁচালি শোনাবেই। সব বন্ধুই এক। আমার পড়াও শেষ। ঘুমও শেষ। পয়সা তো শেষ আগেই হয়েছিলো। বন্ধুরা প্রেম করল, আমি ফেল করলুম, এ তো কাজের কথা নয়? নাঃ নবনীতাদি, প্রেম ইজ ভেরি ডেনজারাস। ভেরি হার্মফুল টু সোসাইটি। আনপ্রডাকটিভ্—এক্সেপ্টেড্ ইন আ হার্মফুল বায়োলজি-ক্যাল ওয়ে। প্রেম বড়ই সর্বনেশে, বড়ই ভয়ানক। বন্ধুরা প্রেমে পড়লেই যদি

এই অবস্থা হয়, তবে নিজে যদি প্রেমে পড়ি ? তাহলে তো প্রাণেই মারা পড়বো ? ওরে বাবারে। কী ভয়ংকর জিনিস! আই উইশ টু হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইট। পরে হবে! পাশটাশ করে গিয়ে।" দুটো করে সিঁড়ি টপ্‌কে ওপরে ছুটলো টুবলু, "পিকো!" "পিকো!" হাঁক দিতে দিতে।

টুবলু ওপরে গেছে। আমি ঘরে এসে নোট নিচ্ছি এমন সময়ে ফের বেল বাজবামাত্র আমার প্রাণে কী আনন্দ! রে! রে! করে ছুটে গেছি।

"কে রে? পিকোর বন্ধু নাকি রে? আয় আয়—"

"নবনীতা দেবসেন আছেন?" দূর! ভুল লোক? অসম্ভব বিরক্ত গলায় বলি, "আছে। কেন?"

"একটু দরকার ছিল। একটা পত্রিকা থেকে এসেছি।" অগত্যা, "ওপরে আসুন।" একটি অল্পবয়সী ছেলে। পিকোর বয়সীই হবে। গ্রাম থেকে কবিতার লিটলম্যাগ বের করে। দিতে এসেছে। অভিমত চায়। কবিতাও চায়। উল্টেপাল্টে দেখলুম, অনেক প্রেমের কবিতা আছে।

"তুমি যে প্রেমের কবিতা লেখো, নিজে প্রেমে পড়েছো?"

"আজ্ঞে?"

"তোমারই তো নাম বললে অমুকচন্দ্র তমুক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এটা তোমার লেখা তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে তো তুমি প্রেমে বিশ্বাসী।"

"আজ্ঞে?"

"তুমি তো প্রেমে বিশ্বাস করো দেখছি। এসব প্রেমের কবিতা তো তুমিই লিখেছো বললে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! ভালো হয়েছে?"

"তোমার সঙ্গে প্রেম নিয়ে একটু কথা বলতে চাই।"

"আজ্ঞে কী বললেন?"

"বলছি, প্রেমে পড়েছো তো? প্রেমের অভিজ্ঞতা বিষয়ে আমি তোমার মতামতটা চাইছি। মন খুলে বলো দিকিনি?"

"প্রে··· প্রেমের···আমার মতামত? আজ্ঞে আমি ঠিক, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আঃ হা, এতে না-বোঝার কী আছে? আমি প্রেম বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করতে চাইছি। প্রেম বলতে তুমি কী বোঝো?"

"কী বুঝি? তার মানে?" ভয়ে তার মুখ শুকনো।

"তার মানেটাও বলে দিতে হবে? কবিতা তো দিব্যি লিখতে পেরেছো।

আর প্রেম কী বস্তু বোঝো না ? আমি তোমাকে বলে দেবো ?”

“প্রেম ? কী বস্তু ? আপনি বলে দেবেন ? আমাকে ?”

“আরে, নাঃ। আমি নয়। তুমি, তুমি। তুমি বলবে। আমাকে। আহাঃ, এতে এত লজ্জা করবার কী আছে ? আশ্চর্য ! তোমার বয়েস কত ?”

“আমার বয়েস কত ? য্যাঃ। আপনার চাইতে অনেক কমই হবে। দিদি যে কী বলেন ?” ছেলেটা কী বুঝলো কে জানে, লজ্জায় লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তক্ষুনি—“আমি বরং আজ উঠি, দিদি। কবিতাটা পরে বরং কখনো এসে—” কোনোরকমে, যেন প্রাণটা হাতে করে পালিয়ে বাঁচবার মতন দৌড়ে নিচে নেমে গেল চব্বিশ পরগণার গ্রাম থেকে আসা তরুণ কবি সম্পাদক। কি ভয়ানক শহুরে কবিনীর পাল্লাতেই না পড়েছিল সে আজ। এমন জানলে আসে কখনও ? রামোঃ !…এতক্ষণে সবটা সরল হলো। বেশ বুঝতে পারছি গ্রামে গিয়ে সে কী গল্প করবে।…

“প্রেমের আলোচনা করতে চাইছিল ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তবে কি আর বলছি ? আমার সঙ্গেই। রসিয়ে রসিয়ে। কিছুতেই ছাড়বে না। ডবল বয়সী ভদ্রমহিলার লজ্জাশরম বলে কিছু নেই। আবার আমাকে বলছে, ‘লজ্জা করবার কী আছে ?’ বলছে, ‘মন খুলে বলো, প্রেম কী বস্তু !’ এদিকে কেদারবদ্রী-কুম্ভমেলা লিখছে, পেটে পেটে এত ? আমাকে একা বাড়িতে পেয়েই,…বলে, ‘তোমার বয়েস কত ?’ মানুষ বড় আশ্চর্য হয়রে ভাই !”…বলে উদাস হয়ে যাবে। বলুকগে। তীর এখন বেরিয়ে গেছে। এর পরের বার থেকে সতর্ক হতে হবে। অমন খপাৎ করে ছেলেধরার মতন ধরলে, আর কাজের কথায় নেমে পড়লে চলবে না। ধীরে সুস্থে, রইয়ে সইয়ে। চা খাইয়ে। কবি-তরুণের দোষ নেই। দোষ আমারই।

আবার রিং। এবার অন্য স্ট্র্যাটেজি। সচেতন পদক্ষেপ।

“কে রে ? সুদীপ ? আয় আয়। বোস। কিরে, কাজকর্ম কেমন ? হ্যাঁ, আছে পিকো। একটু ব্যস্ত আছে। বরং দশ মিনিট পরে যাস ওপরে। একটু চা খেয়ে যা নিচেই। ততক্ষণে বরং আমার সঙ্গেই একটু গল্প কর। হ্যাঁরে সুদীপ, এই যে তোরা এত বইপত্তর পড়িস, ছবিটবি দেখিস, ফিল্ম তুলিস, জীবন সম্পর্কে, বিশেষভাবে এই প্রেম সম্পর্কে তুই কী মনে করিস রে ? মানে, ইন জেনারাল তোদের জেনারেশনটা কী ভাবছে ? একটু খুলে বল্ তো বাবা ? আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই।”

সুদীপ কলেজ শেষ করে ফেলেছে। এদের চেয়ে সামান্য বড়ো। ফিল্মটিল্ম তোলে। বিদেশী বইপত্তর পড়ে, ‘চট্ করে অবাক হই না’ টাইপ। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পার্থিব জগতে সে যথেষ্ট চালুপার্টি। ‘রাফ্-টাফ্-মাচো’ সুদীপ জামার বোতাম লাগায় নাভির কাছে, কলম গোঁজে হিপ পকেটে, মোটরবাইকে পাড়া কাঁপিয়ে বেড়ায়। যেন মোটেই ঘাবড়ায়নি, এমনভাবে সুদীপ একটা কাঠের

চেয়ারে বসে পড়ে। এবং টের্‌চা চাউনিতে আমার দিকে তাকাতে থাকে। একে বলে 'মাপ-নেওয়া,' আমি জানি। অর্থাৎ 'মেজার' করা হচ্ছে 'সিচুয়েশন'-টাকে। হিন্দি সিনেমাতে ভিলেনই হোক. হিরোই হোক এমনি একটা সময়ে নিজেই নিজের দু'গালে বাঁ-হাত বুলোতে থাকে। তারপর ডান হাতে হঠাৎ ঘুঁষি মারে। ('শাহেনশা'তে অবশ্য উলটো।)

সুদীপ ঘুঁষি মারবে না, জানি।

আমিও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। ভাবতে টাইম নিচ্ছে, ভালো। ভেবে-চিন্তে উত্তর দিক। আমিও তো তাই চাই। সুদীপ সিরিয়াস ছেলে। ভালো রোজগারপাতি করছে। পরিশ্রমী। বাইরে ভাবখানা যাই হোক, ছেলেটা আন্তরিক প্রকৃতির। রোজ নাকি বাড়ির বাজার করে দেয় মোটরবাইকে চড়ে। ওর মতামতে কাজ হবে।

সুদীপ গালে হাত বুলোয় না। দু'হাতে চেয়ারের দুটো কাঠের হাতল চেপে ধরে টের্‌চা চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। বোতাম খোলা জামার মধ্যে থেকে তার ছ'টা পাঁজরাও আমার দিকে স্পষ্ট, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। রোগা হওয়ার সঙ্গে 'মাচো' ইমেজের যোগ নেই। ইন্টেলেকচুয়াল 'মাচো'রা রোগাই হয়। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে অপলকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুদীপ ঘাড় সোজা করে। নড়েচড়ে বসে। চোখ নামিয়ে এক মুহূর্ত কী ভেবে নেয়। তারপর মাথা তুলে বলে "প্রেম ?" একটু ফসা করে হাসে। "ধুস্‌। প্রেম দিয়ে কী হবে ? আমি প্রেমে বিশ্বাসই করি না ! ওসব প্রেমট্রেম আজকাল আর চলে না, নবনীতাদি, ওসব আপনাদেরই টাইমের জিনিস ছিল। এখন অবসোলিট হয়ে গেছে। গপ্পো-উপন্যাসে-ফিলিমেই শুধু পাবেন। লাইফে নেই। আমরা র‍্যাশনাল জেনারেশন। আমরা অবজেক্টিভ্‌লি লাইফটাকে দেখি। লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষি। আমরা অ্যাম্বিশাস। কই ? চা তো বললেন না ? প্রেম ব্যাপারটা এখন ঠিক চলে না। কেরিয়ারটাই সবার আগে। আপনি বাঁচলে প্রেমের নাম। প্রেমের জন্য আমরা কেউ তো কেরিয়ার স্যাক্রিফাইস করবো না ? না মেয়ে, না ছেলে। কেউ কিছুই স্যাক্রিফাইস করবো না—এখন সবাই স্বার্থপর। বুঝলেন তো নবনীতাদি এখন যে যার, সে তার। ছেলেমেয়ে সবাই সেল্‌ফ্‌সীকিং হলে আর প্রেমটা হবে কেমন করে ? কে করবে ? কার সঙ্গে করবে ? প্রেমে কেউই আর বিশ্বাস করে না, এক বোকারা আর ন্যাকারা ছাড়া। ওটা আউটডেটেড কনসেপ্ট এখন। আমাদের এটা প্রয়োজনভিত্তিক সোসাইটি। নবনীতাদি, এখানে বিনা প্রয়োজনের কোনো জিনিস চলে না।" সুদীপ আমার সামনেই একটা সিগারেট ধরিয়ে কেমন একটু জেনুইন মমতার সঙ্গে হাসলো। চা এসে গেছে।

আমি চা, আর অ্যাশট্রে এগিয়ে দিলুম। মনে মনে নোট করতে গিয়ে আমি

বোকা হয়ে গেলুম—সুদীপ আসলে কী বললো ? ওকি প্রেমে বিশ্বাস করে, না করে না ?

নেক্সট যেই-না বেল বেজেছে আমিও ঠিক স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো দালানে ছিট্‌কে এসেছি এবং ভাঙা গলাকে যথাসম্ভব মিষ্টি করে বলেছি—

"কে রে ? পিকোর বন্ধু কেউ এলি নাকি রে ?" ভয়ে-শীতল কাঁচগলায় কোরাসে উত্তর হলো নিচে থেকেই—

"ইয়ে, হেঁ-এঁ ! মানে, না, না ! আসলে আমরা টুম্পার···মানে, আর কি, আমরা থাকতে আসিনি। কেবল এক মিনিট, এক্ষুনি চলে যাবো। একটা জরুরি কাজে। এই পিকোদির কাছে। শুধু এক মিনিটের জন্যে। সত্যি সত্যি।" কেউ উপরে এলো না। পিকো একদম পড়ছে না, সামনে পরীক্ষা, আমি তাই প্রায়ই রৈ-রৈ শব্দে ওর বন্ধুদের ভাগিয়ে দিই। বুঝতে পারি, এটা তারই ফলশ্রুতি। (আজকাল কেউ 'ফল' লেখে না। 'ফলশ্রুতি' লেখাই নিয়ম।) এই পার্টি তারই প্রতিক্রিয়ায় ভুগছে। অতএব আমি তাদের মধ্যে মনোবল সঞ্চার করতে চেষ্টা করি।

"ভয় কিসের ? ওপরে আয় না ! কে রে তোরা ?" "পিকোদি বাড়ি আছে।" আস্তে আস্তে সিঁড়িতে শব্দ হয়। দুটি কাঁচমুখের আবির্ভাব ঘটে সিঁড়ির মাথায়। 'হে মাধবী-দ্বিধা-কেন-আসিবে-কি-ফিরিবে কি'-র মতো করে আমি বলি—"কি ব্যাপার ? এত কিন্তু-কিন্তু কিসের ? এই কি নতুন আসছিস ? নাকি তোরা রিম্‌ঝিম্‌ ? আর প্রতিম ? আয় না ওপরে আয়, শুধু শুধু অত ভয় পাচ্ছিস কেন ? বোস্‌ এখানে। (আমি আছি গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে !) হ্যাঁ, পিকোদিকে ডেকে দিচ্ছি। আচ্ছা রিম্‌ঝিম্‌-প্রতিম, তোরা কি এখনও প্রেমে বিশ্বাস করিস ?" বলেই 'এখনও' কথাটা নিজেরই কানে খাপছাড়া লাগে।

"প্রেম ?" সমস্বরে উচ্চারিত শব্দটি হাঁফ ছাড়ার মতো শোনালো। ততক্ষণে পায়ে পায়ে কাছে এসেছে দুটো ছেলে। একটার এখনও গোঁফদাড়ি গজায়নি তেমন, আরেকটার মুখভর্তি কচিকাঁচা ঘাসপাতার মতো দাড়িগোঁফ। ক্ষুর চলেনি। বড়ো বড়ো চোখ। দুটো নেহাৎ ছেলেমানুষ ছেলে। কিশোর বলাই যথার্থ। একটা ওদের মধ্যে একটু বড়ো। সদ্য যুবা। রিম্‌ঝিম্‌টা আমার ছোটো মেয়ে টুম্পার সতীর্থ। ছোটো মেয়ে এখন কলকাতার বাইরে পড়ছে। হস্টেলে থাকে। কুড়ি হয়নি।

"প্রেম ? মাসি ?"···শুধু এইটুকুনি বলেই ভয়ে-বলি-না-নির্ভয়ে-বলি মুখ করে হঠাৎ চুপ করে গেল দুজনে। এবং পরস্পর নিদারুণ চোখাচোখি করতে লাগলো।

"ভয় কি ? বল না ?" আমি যথাসাধ্য মাভৈঃ প্রদান করি। "তোরা প্রেমে

বিশ্বাস করিস তো? অ্যাঁ প্রেম নিয়ে ভাবনাচিন্তা করিস?" দাড়িওয়ালা মুখখানি প্রতিম সজোরে নাড়ালো ডাইনে-বাঁয়ে। অর্থাৎ না। করে না। স্বল্প গোঁফের রেখা-ওঠা মুখখানি প্রবলভাবে হেলিয়ে কানটা একদিকের কাঁধের সঙ্গে ঠেকিয়েই ফেললো রিমঝিম্। অর্থাৎ করে। খুব করে। আরে? এদের যে দেখি একযাত্রায় পৃথক ফল! ঠিক হ্যায় আগে অবিশ্বাসীকেই 'হ্যান্ডল' করা হোক।

"প্রতিম? তুই বিশ্বাস করিস না প্রেমে? কেন? কী হয়েছে? তোদের না অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপ্যাট্রা টেক্সট?"

"রেপ অফ দা লকও টেক্সট। তারপর, টেক্সটের মধ্যে"- প্রতিম অকস্মাৎ সিলেবাস নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে দেখে, তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিই।

"থাক, টেক্সটের কথা থাক। তোর নিজস্ব ফিলসফিটা কী? জীবনদর্শন? প্রেমে বিশ্বাস নেই কেন রে? এই বয়েসে?"

"এই বয়েস বলেই। বড্ড টাইম কনজিউমিং। ভীষণ সময় নষ্ট হয়ে যায়।" প্রতিম আড়চোখে একবার রিমঝিমের দিকে তাকায়। রিমঝিমের চোখমুখে মোটেই সাপোর্টের চিহ্ন নেই। ভুরু কুঁচকে যুদ্ধং দেহি ভাবে চেয়ে আছে সে।

"এই স্টুডেন্ট লাইফে প্রেম করাটা ঠিক নয়। আগে পড়াশুনোটা শেষ করে নিয়ে, যখন হাতে সময় থাকবে"—প্রতিমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হঠাৎ রিম্-ঝিম্ বলল—"একদম রিটায়ার-টিটায়ার করে গিয়ে, তখন বরং প্রেমটা তুই করিস। বুঝলি প্রতিম? তখনই হাতে প্রচুর, অঢেল অনন্ত সময় থাকবে।" বেশ নিরীহ-ভাবেই এটা বলল রিমঝিম্।—"এখন তোর পড়াশুনো, তারপর তোর চাকরিবাকরি—"

"ইয়ার্কি মারিস না, রিমঝিম্। কী বুঝিস তুই প্রেমের? যা জানিস না সেই নিয়ে কথা বলবি না।" প্রতিম একটু রেগে গিয়ে সিরিয়াসলি বলে—"প্রেম তো করলেই হলো না? গার্লফ্রেন্ডকে টাইম দিতে হয়, সমানে পারসিউ করতে হয়, জানিস? প্রেমের জন্য কিন্তু প্রচন্ড সময় লাগে, নইলে প্রেম ছেতরে-মেতরে যায়। প্রেমে পড়লে পড়াশুনো, আড্ডা, থিয়েটার সবই মাটি। শুধু ওই একজন মেয়েকে নিয়েই সবটা সময় কেটে যায়। খেলা দেখা হয় না। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলেই গার্লফ্রেন্ড চটে যায়। তাকে খাওয়াতে, তাকে সিনেমা দেখাতে, অনবরত ধারকর্জ করতে হয়, ফলে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যায়।—রোজ রোজ বাড়ি ফিরতে দেরি হয়, মা-বাবাও ক্ষেপে যায়—মহা প্রবলেম। যেমন সময় নষ্ট, তেমনি পয়সা নষ্ট,—পড়াশুনোও ইনরমাসলি সাফার করে।—একদম কনসেন-ট্রেশন থাকে না, পড়ায় কিছুতেই মন বসে না—ওঃ সো ডিস্টার্বিং—নাঃ। প্রেম একদম ভালো না"—

"শুনে তো মনে হচ্ছে বেশ প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকেই কথা বলছিস।

রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স বলেই মনে হচ্ছে। তুই তো এ'বছর ড্রপ দিলি? না রে?"

"হি হি, এসব কী আন-এথিক্যাল প্রশ্ন? আউট অব সিলেবাস হয়ে যাচ্ছে যে। নো পার্সোন্যাল ইনফর্মেশন—আমি কেবল জেনারেল থিওরি দিচ্ছি!—আমার থিওরি ছাত্রকালের প্রেম খুব খারাপ জিনিস, করলেই সমূহ বিপদ—সব দিক দিয়ে লোকসান। কেবল যদি কেউ স্বরূপের মতন ভেরি স্পেশাল পার্সন হয়, উইকলি ডাইরি মেনটেন করে, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, রেস্তরাঁ ওয়ার্ক, সবকিছু কাজকর্ম, হার্ট অ্যান্ড হেড, ডেইলি রুটিনে একদম ভাগ করে ফেলে, তবেই সম্ভব। নাঃ। ও একা স্বরূপই পারে। আমাদের মতো জনসাধারণের পক্ষে প্রেম ইজ নট প্র্যাকটিকেবল্—নট আ প্র্যাকটিক্যাল প্রপোজিশন অ্যাট অল!"—

প্রতিমের মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে রিম্‌ঝিম্ মেঠো বক্তৃতার সুরে বলে—"আমি কিন্তু মোটেই মনে করি না প্রেম শক্ত কিম্বা প্রেম খারাপ। প্রেম খুব ভালো জিনিস। আমি খুব প্রেমে বিশ্বাস করি—আমি খুবই প্রেম করতে চাই! কিন্তু আমাকে কেউই যে কেন প্রেম করতে চায় না—"

"সে তোর গোঁফদাড়ি বেরুলেই ঠিক দেখবি মেয়েরা দুড়দাড় প্রেমে পড়বে। আসলে এখনও তোকে ওরা বাচ্চা ভাবে—" নিজের কচি কচি দাড়িগোঁফের গায়ে হাত বুলিয়ে, দাম্ভিক হাসা দেয় প্রতিম।—"কেন? কেন ভাববে বাচ্চা?" রিম্‌ঝিমের ক্রুদ্ধ উত্তর! —"ভাবলেই হলো? আমিও যে-ক্লাসে পড়ি, ওরাও তো সেই ক্লাসে, তবে?—তবুও আমি বাচ্চা? বললেই হলো যা হয় একটা কথা?" রিম্‌ঝিমের অভিমানে ভাঙা গলা বুজে আসে। বেশ তো মিষ্টি দেখতে রিম্‌ঝিম্‌কে, প্রেমে পড়ে না মেয়েগুলো? 'নওলকিশোরে'র সেই আইডিয়াটা আর বাংলার মাটিতেও চলছে না তাহলে? সব র‍্যাম্বো? অমিতাভ আর মিঠুন?

"হবে রে, হবে রে, তোরও হবে," মূর্তিমতী সান্ত্বনার মতো এবার পিকোদি আবির্ভূত হয়, "বিশ্বাসে কৃষ্ণ পর্যন্ত মিলে যায়, আর তোর একটা প্রেম হবে না? তাই কখনও হয়?"

"তোর সেই বেগুনি সোয়েটার পরা গুন্ডা মেয়েটার সঙ্গেই হয়ে যাবে, দেখিস, একটু ধৈর্য ধর্"—রহস্যময় হেসে প্রতিম বলে। "সবুরে মেওয়া ফলে! মেলা তড়বড় করিসনি!"—দৌড়ঝাঁপ করতে করতে তিনজনে মিলে ওপরে উঠে যায় এবার। "চলি, মাসি?"—আমার মাথা আবার গুলিয়ে যায়। এরা তবে কে কোন্ দলের?

আপনারা ভাবতে পরেন মেয়েদের দেখা নেই কেন; কেননা মেয়েদের আমি প্রশ্ন করছি না। সম্প্রতি একটি নয়, দুটি মেয়েদের পত্রিকাতে কলকাতা ও

যাদবপুরের ছাত্রীদের স্পষ্টবাদী সাক্ষাৎকারে তাদের মতামত পড়ে জেনে গিয়েছি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ৯৯% প্রেমে উৎসাহী নয়। সবাই কেরিয়ারে উৎসাহী, যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছে। প্রেমকে কেরিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখছে তারা। অথচ একটি বিকল্প কেরিয়ার। প্রেম মানেই বিবাহ, বিবাহ মানেই কর্মজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা-বঞ্চিত জীবনযাপন। বেশিরভাগ সাক্ষাৎদাত্রী চায় মুক্ত জীবন, স্বাধীন উপার্জন, কর্মজীবন। প্রেমে, বিবাহে জড়িয়ে পড়তে রাজী নয় তারা। আরেকদল বিবাহোন্মুখ। তারা বিবাহের প্রতি আগ্রহী, কিন্তু প্রেমের প্রতি নয়। সবাই চায় নিরাপত্তা। ইতিমধ্যে, যদি ইচ্ছে করে তবে প্রেম-প্রেম-খেলায় ('হ্যাভিং ফান') তেমন আপত্তি নেই কয়েকজনের। কিন্তু প্রেমে-পড়া? নৈব নৈব চ। মেয়েরা 'প্রেম' থেকে পালিয়ে গিয়ে 'কেরিয়ার' বাঁচাতে চায়, তা সে-'কেরিয়ারে' 'চাকুরি'ই হোক, আর 'বিবাহ'ই হোক। প্রেমটা মেয়েদের ক্ষেত্রে কেরিয়ারের বালাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছেলেদেরও কি তাই নয়? ছেলেদের কথা শুনেও তো তাই মনে হচ্ছে আমার। এইসব ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামনে এসে ছাত্রের সঙ্গে দেখা। খুব ব্রাইট ছেলে! একটা ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, আরেকটার জন্যে তৈরি হচ্ছে। দেখবামাত্র আমার মুখ থেকে প্রশ্ন ছুটে গেছে—

"এই যে কুনাল! এক মিনিট দাঁড়াও তো? প্রেম কী জিনিস? একটা ডেফিনিশন দিতে পারো আমাকে?" সে-ছাত্রও সোজা পাত্র না। সুদীপেরই মতো, 'কিছুই আমাকে-অবাক-করে না' আঁতেল টাইপ। ঝোলা গোঁফ। প্রশ্ন শুনে, যেন-এটাই-আশা-করছিল-এমনিভাবে বিনা বিস্ময়ে, বইখাতা বগলে পুরে প্রথমে কিছুক্ষণ, মিনিটখানেক হবে, উটমুখো হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো। ভাবছে। ভাবুক। ভেবেচিন্তে বলুক।

তারপর কুনাল তর্জনী তুলে বললো—

"ইলেকট্রিকের বাল্বের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তারটা আছে, 'ফিলামেন'টা, যেটা কেটে যায় আর কি, দেখেছেন তো দিদি? প্রেম হলো ঠিক তাই। অথবা, ধরুন এই প্রদীপের সলতেটা। তা বলে কিন্তু মাইন্ড ইউ, প্রদীপের তেলটা, কিম্বা বালবের ইলিকট্রিসিটি, ওগুলো প্রেম নয়। ওটা আবার অন্য জিনিস। বুঝেছেন তো?" বেশ অন্তরঙ্গভাবে চোখ মট্‌কালো ছাত্রটি। এবার আমার ঘাবড়াবার পালা।

"অন্য জিনিস? কী জিনিস বাবা? ঠিক বুঝিনি।"

আমার সরল প্রশ্নে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে ছাত্র আমাকে বলে, "বোঝেননি? তাহলে আরেকদিন বুঝিয়ে দোব দিদি, আজ হাতে সময় নেই, লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবে—" ছুটতে শুরু করেই থেমে পড়ে, নাটকীয়ভাবে হাতজোড় করে জ্যাকি শ্রফ মার্কা গোঁফের তলায় নকল করে মিষ্টি হেসে কুনাল বলে—"আজি

মোর দৈন্য করো ক্ষমা"—বলেই লাইব্রেরির দরজায় সেঁধিয়ে যায়। অদূরেই মনে হলো যেন একটি অপেক্ষমানা সালোয়ার-কুর্তা নড়ে উঠলো, একটি ওড়না দুলে উঠে কুনালের দিকেই এগিয়ে এলো বাল্বের ফিলামেন অথবা প্রদীপের সল্তের মতো।

দূর হোকগে ছাই সম্পাদকীয় ফরমাশ। প্রেমের আবার এ প্রজন্ম-সে প্রজন্ম কি? কেবল বাজে কথা। প্রেম তো জন্মজন্মান্তর ধরেই। যে-কে-সেই। প্রেম সব যুগেই প্রেম। প্রেম সব দেশেই প্রেম। আমিও যেমন! তিনপুরুষ আর চোদ্দপুরুষে কিছু তফাৎ নেই। যাঁহা শাহজাহান, তাঁহা এলিজাবেথ টেলর, টাইপগুলো কেবল আলাদা। কেউ ম্যারাথন, কেউ রিলে রেস। ছোটে সবাই প্রাণপণে। যে যেটুকু রাস্তা পারে। বাবা-মা ছুটেছেন তাঁদের মতন। আমরা আমাদের মতন। এরা ছুটবে এদের মতন।

বাড়িতে ফিরতেই করুণাসিন্ধু হয়ে এসে পিকো নিজেই বললো—"মা, দিবাকর এসেছে। ভাটপাড়ার বামুন। ওকে নিয়ে তোমার স্পেসিমেন স্যাম্পলিং করবে না?"

"ও, দিবাকর এসেছিস? শোন্ বাবা," আমি বসে পড়ে জুতো খুলতে-খুলতেই বলি—"বল্ দিকিনি তুই প্রেম বিষয়ে কী ভাবিস?"

"কিস্যুই ভাবি না!" হাস্যবদনে দিবাকর বললে ধুতিপরা পা নাচাতে নাচাতে। "ভাববার আছেটা কী?"

"মানে?"

মানে কক্ষনোই ভাবিনি। ভাববার কী আছে এতে?"

"প্রেমে বিশ্বাস করিস?"

"বাঃ, অবিশ্বাস করলেই হলো? এত কীর্তন, বৈষ্ণব গীতিকবিতা, মেঘদূত, গীতগোবিন্দ লেখা হয়ে গেল, রবিঠাকুর এত গান লিখলেন, অবিশ্বাস করলেই হলো? ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। ফ্যাক্ট থাকলেই ভাবতে হবে? পিপীলিকাভুকও তো ফ্যাক্ট। জগতে আছে—আমি কি তাই নিয়ে ভাবি?"

"কিন্তু প্রেম আর পিপীলিকাভুক—"

"থাকুক, তাতে আমার কি? আমার ওসব নিয়ে ভাবার টাইমও নেই, ইনক্লিনেশনও নেই।"

"তোদের তো বৈষ্ণববাড়ি।" ভয়ে ভয়ে বলি।

"তাতে কি হলো?" দিবাকর বলে। "বৈষ্ণববাড়ি বলে জীবহিংসা হয় না। নিরামিষ্যি খাই। ব্যাস্। ঐ পর্যন্তই যা। প্রেম। জীবে প্রেম নিয়ে ভাবনা বলতে পারেন।"

"তোর বন্ধুবান্ধবেরা তো খুব ভাবে। ঊষা তো এন্গেজ্ড হয়ে গেল।"

"ওঃ উষা? উষার প্রেম? তাও জানেন না বুঝি? শুনুন তবে! উষা আর রমেশের ব্যাপারটা হচ্ছে সিম্পল! টিউশনের এম্পায়ারটা ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছিল। এ পায় ছ' হাজার, তো ও নিয়ে নেয় পাঁচ হাজার। তার চেয়ে বিয়ে করে ফেললে জয়েন্ট টিউটোরিয়াল হোম খুললে বিশ পঁচিশ হাজার তুলতে পারবে। তাই প্রেম। একে আপনি প্রেম বলবেন?"

আমি নির্বাক। আমাকে নির্বাক করতে পেরে দিবাকর খুব খুশি। বেড়ালের মতন গোঁফ নাচিয়ে হাসলো।

"এসব আপনি বুঝবেন না! এরা যে-যার বিজনেস ইন্টারেস্টে পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়। আপনারা ভাবেন, প্রেম। এর বাবার টাকা দেখে, ওর বাবার নাম-যশ-প্রতিপত্তি দেখে, কারুর ফর্সা রঙ দেখে, আরেকজনের মার্কশিট দেখে—হুঃ, এই তো এদের প্রেমের সব উৎস। দূর। ওসব আবার প্রেমে পড়া নাকি? ওতে ভুলবেন না দিদি!" দিবাকর সাবধান করে দেয়, কাঁচ গোঁফ নেড়ে, হুলো বেড়ালের মতন।

"এ প্রেম সে প্রেম নয়! আপনারা যাকে প্রেম বলতেন! এ হচ্ছে অন্য মেজারমেন্টের। আমাদের যুগের আসলে মেটিরিয়ালটা আলাদা। ঐ হয় স্বার্থের হিসেব, আর নয় তো খেলা। প্রেম বলে কিছুই এখন প্র্যাকটিসড্ হয় না। যা হয় সেটা একটা প্যাসটাইম। প্রেম-প্রেম খেলা। লাইক এনি আদার প্রেম। সময় কাটানোর প্রণালী। যেমন ক্রসওয়ার্ড পাজল। শব্দসন্ধান। শিকার। মৃগয়া। ক্রিকেট। তেমনি। উত্তেজনা আছে। হারজিৎ আছে। কংকোয়েস্ট-এর মজা আছে। সবই আছে, কেবল প্রেম নেই। ও আপনাদের সময়েই ফুরিয়ে গেছে। আমাদের যুগে ছিটেফোঁটাও নেই।"

"তুমি একটা এতবড় পণ্ডিতবাড়ির ছেলে হয়ে, দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র হয়ে এমন বলছ? ছিঃ।"

"ছিঃ তো কি। যা বুঝেছি অনেস্টলি তাই তো বলবো? নাকি বানিয়ে বানিয়ে কাব্য করতে হবে?"

মন খারাপ হয়ে যায়। একের পর এক নবীন যুবক এসে প্রেমকে নস্যাৎ করে যাচ্ছে। বিশ্বের ভবিষ্যৎ তবে কী? আমার কাতরতা আর চাপতে পারি না। বলে ফেলি: "তোরা কী রে? যাকেই ধরি, সেই বলে প্রেমট্রেম সব বাজে কথা। তোদের জেনারেশনটাই—"

"আপনার যে গোড়ায় গলদ! আপনার স্যাম্পলিংয়েই ভুল হচ্ছে। র‍্যানডম তো হচ্ছে না। সবাই তো পিকোরই বন্ধু। কিছু একটা মিল না থাকলে বন্ধু হয়েছে কেন এরা? এটাই মিল। সবাই একরকম কথা তো বলবেই। আপনি বড় রাস্তার মোড়ে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে এভ্রি থার্ড পথচারীকে ধরুন। সেই স্যাম্পলিং-এর রেজাল্টটা নির্ভরযোগ্য হবে। যদি সায়েন্টিফিক মেথড ফলো

করতে চান।"

"আমি বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে এভ্রি থার্ড পথচারীকে ধরব? ধরে জিজ্ঞেস করব—আপনি প্রেমে বিশ্বাস করেন? তারপর আমাকেই ধরে মারবে না তো তারা? নইলে সলিসিটিংয়ের জন্য পুলিশ আমাকে জেলে পুরে দেবে না?"

দিবাকর একটু লজ্জিত হয়। আঙুল কামড়ে চিন্তিত মুখে জানায়ঃ "সেদিকটা অবশ্য আমার স্ট্রাইক করেনি।"

"তারপর, বরং ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা স্টেনসিল কেটে কোয়েশ্চেনেয়ার বিলিয়ে দিন—সেটাই ভালো হবে।"

"কেউ ফেরৎ দেবে না। কে কালেক্ট করবে? তুই করবি?"

"ওরে বাবা!"

"তবে? দ্যাখ্ তোদের মুখেই যত বড় বড় কথা। কেউ কোনো ভার নিতে চাস না।" বকতে-বকতেই টের পেলুম হঠাৎ আসল কথাটা বলে ফেলেছি। এটাই এদের এই প্রেম-বিমুখতার মূল কারণ! দায়হীনতার লোভ। নিদায়, নির্ভার, স্বাধীন, মুক্ত জীবন এদের কাম্য, কর্মময় হলেই ভালো, আলস্যময় হলেও ক্ষতি নেই (যতদিন ক্ষতি না থাকে)। প্রেম মানেই বন্ধন। মানেই দায়-দায়িত্ব। হৃদয়ের, জীবনের। মর্মের, কর্মের। এরা জীবনে দেয়াল তুলতে চায় না।

এটা কি আদর্শবাদ? নাকি একেই বলে স্বার্থপরতা? প্রেমের মূলে আছে অংশগ্রহণ, 'শেয়ার' করা, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, হার-জিৎ—সব ভাগ করে নেয় প্রেম। এ প্রজন্ম বোধহয় ভাগ নেওয়াতে বিশ্বাসী নয়। সবাই যার যার তার তার। কে যেন বলেছিল না? যে যার সে তার? সন্দীপ কি? না টুবলু? না প্রতিম? না দিবাকর? সবই একরকম শোনাতে শুরু করেছে আমার মনের মধ্যে এবারে। সত্যিই কি বদলে গেছে এই প্রজন্মে ভালোবাসার মূল্যবোধ?

ভাবছি, এমন সময়ে দিবাকর ফিরে এলো। নিচে নেমে এসে দিবাকর নিজেই বললো, "আপনি কি মন্দার সঙ্গে কথা বলেছেন? মন্দাকিনী রায়?"

"না তো?"

"বলে দেখবেন। অন্য একটা অ্যাংগল পাবেন। ওই তো ওপরে বসে আছে। ডাকবো?"

"ডাকবে? তা, পিকো তো ওকে ডাকেনি?"

"ডাকবে কেন? আপনি তো মেয়েদের মতামত চাননি? এর প্রবল ওপিনিয়ন আছে!"

"এই কি কবিতা লেখে? কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলো, দান্তে আর

বিয়াত্রিচে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সেই। মন্দা! মন্দা! নিচে আয়। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে! ভালো স্টুডেন্ট কিন্তু!"

পরমা সুন্দরী একটি ছবির মতন মেয়ে এলো।

"কী পড়ো?" মিষ্টি হেসে মেয়েটি বললো.—"এম. এ. ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছি।" গলাটিও মধুর।

"তুমি কি প্রেমে বিশ্বাস করো, মন্দা?"

একটুও না ঘাবড়িয়ে নাম ঠিকানা বলার মতো সহজে—"নিশ্চয়ই!" বেশ জোরের সঙ্গেই মন্দাকিনী জানায়।

"মানে?" আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল।

"মানে? আমি মনে করি প্রেমই সব। প্রেমের জন্যেই মানুষ বাঁচে। বাঁচতে হলে তো একটা মোটিভেশন লাগে? কেউ টাকা রোজগারের জন্যে বাঁচে, কেউ নামযশ করবে বলে, আমি বাঁচি প্রেমের জন্যে।"

"প্রেম মানে? জীবে প্রেম? গান্ধীজী, বুদ্ধদেব…"

"না না, প্রেম মানে এমনি প্রেম। একজন মানুষের জন্যে আরেকজন মানুষের ব্যাকুলতা। তাকে কাছে পাওয়ার জন্য, তাকে চোখে দেখার জন্য, তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য, তার স্পর্শ পাবার জন্য—এইসব। দিবাস্বপ্নে, নিশাস্বপ্নে, সব সময়ে তার কথা ভাবা। সেই প্রেম।"

"আই সী।" আমি কেমন কথা খুঁজে পাচ্ছি না। মন্দাকিনী অত্যন্ত স্পষ্টবাদিনী রোমান্টিক।

"হাতে এসে গেলেই কিন্তু গেল!" মন্দা বলে।

"অ্যাঁ, কী বললে?"

"বলছি, প্রেম যতদিন অপূর্ণতার মধ্যে, অতৃপ্তির মধ্যে, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকে ততদিনই প্রেম বেঁচে থাকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যেই প্রেমে প্রাপ্তি এল, তৃপ্তি এল, অমনি সুপ্তিও চলে আসে। তারপরে প্রেম শুকিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়। তখন জীবন খুব বোরিং।" মন্দা হাসে। এ তো একেবারে আমার মার কথাই বলছে! কোথায় জেনারেশন গ্যাপ?

"ঘুম থেকে উঠতেই ইচ্ছে করে না। যতদিন না আবার প্রেমের উদয় হচ্ছে।" মন্দা আরো জানায়।

"আবার উদয় হয়?"

"বাঃ! হবে না? প্রেম তো সূর্যের মতো। অনবরত অস্ত। আর উদয়। উদয় আর অস্ত। পার্মানেন্টলি এমন সময় তো আসবে না, যখন সূর্য নেই। সেটা রাত্রি। রাত্রি কেটে যায়। প্রেমের ভোর হয়। প্রেমের সূর্যোদয় হয়। নতুন প্রেম আসে জীবনে।"

—"তুই বুঝি অনবরত প্রেমে পড়িস মন্দা ?"

—"অনবরত। আমার তো প্রেমময় জীবন !"

হাসতে হাসতে মন্দাকিনী বলে—"শ্রীচৈতন্যদেবের টাইপের। মেরেছে কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না ? আমি সেই টাইপ। আপাতত দিবাকরদা কিছুতেই অ্যাটেনশন দিচ্ছে না সেটাই মুশকিল। বলুন তো একটু দিবাকরদাকে ? বলছি এত করে —"

"ও, এই ব্যাপার ? দিবাকর !"

"মাপ করবেন, দয়া করে মন্দাকিনীর সঙ্গে প্রেম করতে আদেশ করবেন না। প্রেম আমার লাইন নয়। মন্দাকিনী আমাদের পাল্টি ঘর চমৎকার মেয়ে, ছোড়দার সঙ্গে সম্বন্ধ করছি, হয়ে গেলে হয়ে যাবে। আমাকে কেন ? ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।"

আমিও মত বদলে ফেলি।

"তুমি বরং ওর ছোড়দাকেই—"

"ছোড়দা বিলেতফেরৎ, পাত্র ভালো, চাকরি করে, মাছ মাংস খায়, দেখতেও ভালো, মন্দার সঙ্গে ওকেই মানাবে।—তখন থেকে এটাই বোঝাচ্ছি ফের প্রেমের সূর্যোদয় হবে। এবারকার মতন এ সূর্যটাকে অস্তেই নামিয়ে দে !"

আমিও বলি, "দিবাকর সুবিধের পাত্র হবে না। ছোড়দাই বেটার মনে হচ্ছে।"

মন্দাকিনী মিষ্টি হাসলো। প্রশ্রয়ের সুরে বলল : "ওভাবে তো হয় না ? যতদিন দিবাকরদা এই···এরকম করবে, ততদিনই আমারও যে—"

"তার চে. দিবাকর তুই ওর প্রেমে পড়ে যা—তাহলেই চোঁচাঁ পালাবে মন্দাকিনী ! ওর সবই ওই রোমান্টিক অপ্রাপ্তি"—এবার 'পিকো গভীর উপদেশ দেয়। —"প্রাপ্তির একটু লক্ষণ দেখালেই মন্দা আর সেখানে নেই। ভয়ানক prude মেয়ে ! মুখেই যত !" মন্দা মিষ্টি মিষ্টি লজ্জা লজ্জা হাসে।

অস্বীকার করে না। দিবাকর বলে, "দাঁড়া, তোকে কালই নিয়ে যাচ্ছি সায়েন্স কলেজে ছোড়দার ল্যাবে"—

আরেকটা দৃষ্টিকোণই বটে। মেয়েদের পত্রিকার সাক্ষাৎকারে এটা ছিলো না। না। এটা কি প্রেমে বিশ্বাস ? না প্রেমে অবিশ্বাস ? মোদ্দা কথাটা ঠিক ধরা গেল কি ? ও কি আমাদের ছোটবেলার মত···ও কি সত্যিই রবীন্দ্রনাথের গানের মতন···রিমঝিম এক প্রবল প্রেমিক, আর এই মন্দাকিনী আর এক। অতিবড় ঘরণীরা না পায় ঘর। মন্দার প্রেমে বিশ্বাসটাকে কিন্তু 'প্রেমে-অবিশ্বাস' বলেই সন্দেহ হতে থাকে আমার। ওই, যাকে দিবাকর বলছিল 'পাসটাইম', সেরকম লাগছে না কি মন্দার এই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের ব্যাপারটা ?

তা কেন? অনেকেই আছে প্রেমে বিশ্বাসী। আগের মতোই। রূপোলি যেমন। মস্ত ধনীর একমাত্র আদরিণী সন্তান, স্বেচ্ছায় নিম্নমধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু একান্নবর্তী পরিবারের এক দোকানীর বড় ছেলেটিকে বিয়ে করে যথাযতীনে খুবই শান্তিতে ঘরকন্না করছে। কে বললে প্রেম নেই? স্যাক্রিফাইস নেই? রূপোলিকে আমি দেখিনি? ওকে প্রশ্ন করতে হয়নি প্রেম সম্পর্কে ওর ধারণা কী। নওরোজকেও দেখেছি। ওই যে থাইরয়েডের অসুস্থতার কারণে স্থূলাঙ্গিনী কিন্তু বুদ্ধিমতী গুণবতী চৈতালীকে বিয়ে করলো। পাঁচবছর বাগ্দত্ত থাকার পর, বিলেত থেকে ফিরে এসে চৈতালীকে নিয়েই ঘর বেঁধেছে নওরোজ। ওরাও তো আমারই ছাত্রছাত্রী। সুদীপ-দিবাকরের প্রজন্ম। আর যাই হোক সাক্ষাৎকারে কেউ সত্যি কথা বলে না। খবরের কাগজকেও না, বন্ধুর মাকেও না, মাস্টার-মশাইকে তো নয়ই। প্রশ্ন করে কিছু হবে না। চোখই একমাত্র সাক্ষী, চোখটাকে তীক্ষ্ণ করতে হবে। এই সুদীপকেই তো পাঁচবছর ধরে একটাই মিষ্টি মতন মেয়েকে মোবাইকে করে নিয়ে ঘুরতে দেখছি। সুদীপের গার্লফ্রেন্ড। গার্লফ্রেন্ড কাকে বলে এরা? এদের মুখের ভাষা, আর কাজের ভাষা আলাদা। দিবাকরকে ছেড়ে আমি ঘরে যাই। নোটবই খুলে প্রবন্ধ লিখতে বসি। সঞ্চিত ডেটা অ্যানালাইজ করে দেখি, আরে, মা জননীর ঘোষিত মতামতের সঙ্গে স্বরূপের কর্মকাণ্ডের বা সুদীপের, কি দিবাকরের বজ্রনির্ঘোষের তো বিশেষ পার্থক্য নেই? কেবল মার স্টেটমেন্টটা পজিটিভ, ওদেরগুলো নেগেটিভ। দুদলের বক্তব্যই মূলত 'প্রেম'-বিষয়ে এক—যথা: প্রেম অতি মূল্যবান, সূক্ষ্ম, দুরূহ, মহার্ঘ, সুকুমার, দুষ্প্রাপ্য। প্রেমকে হতে হবে নিঃস্বার্থ, নিষ্কারণ। প্রেম প্রয়োজনের চাপে বাঁচে না। প্রেম মূলহারা ফুল, ভাসে জলের 'পরে। হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে, ধরা দেবার ধন সে তো নয়—অধরা মাধুরী। মোটামুটি বিভিন্ন বিপরীত অ্যাঙ্গেল থেকে এই কথাই বলা হয়েছে। প্রেম অধরা মাধুরী।

মা বলছেন প্রেমকে বাঁচাতে হলে বিয়ে কোরো না। এরাও আরেকভাবে সেটাই বলছে। এদের বক্তব্য: এই অতিবাস্তব অতিস্বার্থ সংঘাতময় জীবনে প্রেমকে ধরা যাবে না। ধরতে যেও না। মানুষ বেঁটে হয়ে গেছে। প্রেম জিনিসটা আর আজকের পার্থিব মানুষের হৃদয়ের নাগালে নেই। যেমন বুকের মধ্যে ভগবানের নাগাল না পেলেই লোকে বলতে থাকে ভগবানে বিশ্বাস করি না। অথচ যন্ত্রণা, অপমান, পরাজয়ের মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে দৈবের নাগাল পেতে চায় অবিশ্বাসীও। এরাও তেমনি। তাহলে খুব কি একটা ফারাক, হয়েছে? বদল হয়েছে প্রেমের তত্ত্বে? বোধহয় না। তত্ত্বটা একই আছে। তফাৎ হয়েছে প্রযুক্তিতে। প্র্যাকটিসটা বদলে যাচ্ছে। আমাদের প্রজন্ম আকছার 'প্রেমে-পড়ত'। 'প্রেম-করত' কম। এরা প্রেম করে, প্রেমে 'পড়ে' না। 'প্রেম'-কে

ভয় পায়। দায়িত্বকে ভয় পায়। হালকা হয়ে বাঁচতে চায়। এমন সময়ে একটা ফোন এল।

এই ফোন, আর কলিং বেল। কলম ধরেছি-কি-ধরিনি, অমনি দুদিক থেকে এই সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আর যেদিন বোর হয়ে একা একা ঘরে বসে থাকি, সেদিন দুটোই নিস্তব্ধ! উঠে গিয়ে ফোন ধরি।

"হ্যালো, আন্টি? এনি নিউজ অব টুমপা?"

এই তো। সেধে এসে জালে ধরা দিয়েছে। আরো এক ধাপ নিচের প্রজন্ম, আমার ছোটো মেয়ের বন্ধু। রিমঝিমের সঙ্গে পড়ে। ছোটো মেয়ে কলকাতার বাইরে পড়ছে। আমি খপ করে ধরি:

"হ্যালো, গীতু? তুই প্রেম বিষয়ে কী ভাবছিস?"

"হোয়াট? আর ইউ সিরিয়াস?"

"ভীষণ। প্রেম বিষয়ে তুমি কিছু ভাবছো কি?"

"প্রেম বিষয়ে কী ভাবছি? ডিড ইউ সে দ্যাট?"

"আজ্ঞে হাঁ। প্রেমে বিশ্বাস করিস? না করিস না?"

"ও শিওর। আন্টি! হু ডাজন্ট্?"

"সাম সে দে ডোন্ট।"

"দে ওনলি সে সো। ইভ্‌ন দে ডু।" বলল গীতু সিং। এখনও কুড়ি হয়নি ওদের। "ইউ ডোন্ট বিলীভ দেম, ডু ইউ আন্টি? জগতে কেউ নেই যে সত্যি সত্যি প্রেমে বিশ্বাস করে না। নো ম্যাটার হোয়াট দে সে!"

"বলছিস তুই?"

"নিশ্চয়। পৃথিবীতে প্রত্যেকে প্রেমে বিশ্বাস করে। ডোন্ট ইউ?"

"আমি তো করিই।"

"তবে? তুমিই বরং নাও করতে পারতে। তোমার তো, এক্সকিউজ মাই সেইং দিস, কিন্তু তোমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা তো প্রেমের খুব ভালো হয়নি, উইথ্ আংকল রানিং অ্যাওয়ে উইথ অ্যানাদার লেডি? স্টিল তুমিও যদি প্রেমে বিশ্বাস করো, অন্যেরা কেন করবে না? দোজ হু সে দে ডোন্ট, লাই। খবরদার বিশ্বাস কোরোনা। ইট্‌স ফ্যাশনেবল টু সে দ্যাট। বুশলিট!"

"ল্যাংগুয়েজ, ল্যাংগুয়েজ!"

"হোয়াট, ল্যাংগুয়েজ? যত মিথ্যেবাদী, ওদের কথা কানে তুলো না। তুমিও যেমন!"

"তাহলে তুই বলছিস যারা বলে প্রেমে বিশ্বাসী নয় তারাও আসলে বিশ্বাস করে?"

"অফ কোর্স! দে আর ওনলি ওয়েটিং ফর ইট টু হ্যাপেন টু দেম! লুক, আন্টি! সবার জীবনে তো প্রেম আসে না? ইট্‌স আ রেয়ার ইভেন্ট। তাই

না? আ মেনি স্‌প্লেনডারড থিং। তুমিই বলো? ইউ আর দা পোয়েট!"

"আর তুই মনে হচ্ছে প্রেমে পড়েছিস?"

"কে বলল?"

"কে আবার বলবে? তুইই বলছিস! তোর কথাবার্তা!"

"ওয়েল? ইউ মে বি রাইট!" সলজ্জ মৃদুহাস্যের ঝংকার শোনা যায়।

"ছেলেটা ভালো তো?"

"আই থিংক সো।"

"প্রেমে বিশ্বাস করে তো?"

"হোয়াট ননসেন্স—তখন থেকে বলছি সব্বাই করে, এভ্‌রি ওয়ান, তোমাকে মুখে যে যাই বলুক, মনে মনে সক্কলেই প্রেমে বিশ্বাস করে আন্টি। কে-না-কে তোমাকে এসে গ্রেপস আর সাওয়ারের গল্প বলে দিল, আর তুমিও সেটা দিব্যি শুনে নিলে! ওসব গুল্‌ খেতে নেই! খেতে নেই! ইউ পিপ্‌ল আর অ্যাবসার্ডলি গালিব্‌ল! সত্যি তোমরা বাবা-মায়েরা না,—অ্যাতো সিম্প্‌ল!"

"আমরা সিম্প্‌ল, গালিব্‌ল, আর তোরা পাকাবুড়ি?"

"কোয়াইট। লোকের মুখের কথায় কক্ষনো বিশ্বাস করবে না। কাজটা দেখবে। ট্রাস্ট ইওর কমনসেন্স, নট ইওর ইয়ার্স, যত সব আঁতলামির কথা! কে? কে বলেছে? শুনি? নামটা বলো তো? দেখিয়ে দেবো মজা।"

গাতুর মুখখানা খুবই মিষ্টি, কিন্তু স্পষ্টবাদী। লড়াকু স্বভাব। একহাতে লড়ে নিতে পারবে। সুদীপ, প্রতিম, দিবাকর, পিকো, কাউকেই তোয়াক্কা করবে না। কাউকে রেয়াৎ করবে না। যা গুন্ডা মেয়ে গাতু! হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মাথায় খেলে গেল।

"আচ্ছা, গাতু, তার কি একটা বেগুনীরঙের সোয়েটার আছে?"

"বেগুনী? মভ্‌ আছে। একটু লাইট বেগুনীর মতোই। কেন?"

"ও কিছু না। হঠাৎ এমনি মনে হলো।"

এমন সময়ে নিচে আবার রিং হলো। পিকো খোঁচা মারলো, "ওই নাও, ফোন ছাড়ো, হয়তো আবার তোমার কোনো শিকার এসে গেছে। যাও ঝাঁপিয়ে পড়ো।"

সত্যিই একটি সুদর্শন তরুণ সরলবিশ্বাসে ওপরে উঠে এলো। একে আগে কখনও দেখিনি। লিট্‌ল ম্যাগাজিন, না পিকোর বন্ধু, ভাবছি, হঠাৎ পিকো চেঁচিয়ে ওঠে--

"শৈবালদা। শৈবালদা! মা ফোন ছাড়বার আগেই চটপট ওপরে পালিয়ে এসো, আমার মায়ের পাল্লায় পড়ে যেও না যেন! মা তোমাকে দেখলেই প্রেমের কথা বলতে শুরু করে দেবেন কিন্তু···মার দারুণ প্রেমরোগ হয়েছে!"

অপরিচিত তরুণের চোখের সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আমি জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।